একালের একাংক

[তৃতীয় খণ্ড]

সম্পাদনায়

সুনীল দত্ত

প্রথম প্রকাশ :
১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬১

প্রচ্ছদ :
প্রণব শূর

দাম : সাত টাকা

ডি, ঘোষ, কর্তৃক জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, হইতে প্রকাশিত ও শ্রীঅজিত কুমার সাউ ৬০, পটুয়াটোলা লেন, রূপলেখা প্রেস, কলিকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত ।

নাট্যকার বন্ধু

প্রবোধ বন্ধু অধিকারী

রমেন লাহিড়ী

কিরণ মৈত্র

যাদের ইচ্ছায় ও প্রচেষ্টায় এই সংকলনের শুরু হয়েছিল

আজ তাদের-ই হাতে তুলে দিয়ে ধন্য হলাম

একালের একাঙ্ক তৃতীয় খণ্ড।

সূচীপত্র

॥ বর্তমান পরিস্থিতি ও নাটকের ভূমিকা ॥

আজকের এই যুগটাকে বলা যায় অগ্নিবর্ষী যুগ! বিশ্বব্যাপী শুরু হয়ে গেছে সংগ্রামের মহড়া। একাধারে এশিয়ার পদানত দেশগুলো থেকে কৃষক সম্প্রদায় শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এগিয়ে চলেছে! এগিয়ে চলেছে তারা কোথাও বা অস্ত্র হাতে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শেষ আঘাত হানবার জন্য; কোথাও বা অস্ত্র ছাড়াই প্রতিবাদ গর্জনের মধ্য দিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে! মেহনতী জনতার এই অগ্রগতিকে ইতিহাসে বার বার বাধা দেবার চেষ্টা করেছে শ্রেণীশত্রুর দালালরা, কিন্তু এই বাধা বিপত্তিতে ভীত, সন্ত্রস্ত না হয়ে আরো প্রচণ্ড হয়ে দেশে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ছে বিশ্ববিপ্লবের স্রোতধারা! বিশ্বের বিপ্লবী শ্রমিক কৃষকরা ভয়ে পেছিয়ে না এসে অমিত বিক্রমে এগিয়ে গেছে বিরাট এক কদম। তাইতো আমরা দেখি '৪৭-৪৮ সালে তেলেঙ্গানা থেকে বরাকমলাপুর, কাকদ্বীপ পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল ৬৭-৬৮ সালে সেই আগুন আবার নতুন ভাবে জ্বলতে শুরু করেছে! সেই আগুন আজ সারা ভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে! এই আগুন নিভিয়ে ফেলার শক্তি আজ আর কারো নেই।

আর আজকের নাট্যজগৎ-এর বেশীর ভাগ শিল্পী-স্রষ্টারাও সেই বিদ্রোহের জ্বলন্ত আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে দিকে দিকে, শহরে, গ্রামে গ্রামান্তরে! এই সংকলনে তাদেরই বেশ কিছু নাটকের সমাবেশ ঘটান হয়েছে। অবশ্য সব কটা এই মেজাজের নাটক দিতে পারলে আমি খুবই খুশী হতাম, কিন্তু তা সম্ভব হল না। সম্ভব হল না এই জন্য বোধহয় সমাজ-বিপ্লবের চিত্রটা সমাজ-সচেতন নাট্যকার হয়েও অঙ্গাঙ্গিভাবে সমাজ-বিপ্লবের সঙ্গে নাট্যকার জড়িত না হওয়ার দরুণ ঐ সংগ্রামী কাহিনী তারা ধরতে পারেনি, তাই সমাজ

বাস্তবতাটাই তাদের কাছে বড হয়ে উঠেছে। আর সেই চিত্রই তারা নাটকে আঁকেন, যেহেতু সাহিত্যে এখনো তা আছে, তাই আমি বিদ্রোহী মন ছাড়াও আর যেসব মন সমাজে কাজ করছে তাও এই সংকলনে ধরে রাখার চেষ্টা করেছি।

আজ ভারতের দিকে দিকে কৃষক বিদ্রোহের জোয়ার এসেছে। দুশো বছরের পদানত, শৃঙ্খলিত কৃষক সম্প্রদায় মুক্তির জন্য বার বার লডাই করেছে, আজও করে চলেছে। সেই লডাইয়ের সামান্য কিছু আভাস এই সংকলনে রাখার চেষ্টা হল। কাকদ্বীপ নামটার সংগে জডিয়ে আছে '৪৮ সালের সংগ্রামের একটি জলন্ত কাহিনী। গণনাট্য সংঘের বিখ্যাত গান "অহল্যা মা, তোমার সন্তান জন্ম নিল না, ঘরে ঘরে সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা!" কাকদ্বীপের নৃশংস অত্যাচার আর অহল্যা মায়ের আত্মত্যাগ আমাদের চোখের সামনে এখনো আগুনের শিখার মত জ্বলছে। আর সেই শিখাকে জ্বালিয়ে রেখেছেন উৎপল দত্ত "কাকদ্বীপের এক মা"-এর ভেতর দিয়ে।

কতো আত্মত্যাগ, কতো রক্তপাত-এর মধ্য দিয়ে নিপীডিত নির্যাতিত কৃষক সম্প্রদায় শোষণহীন সমাজ গড়তে চলেছে, এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজটাকে ভেঙ্গে নতুন সমাজ গডতে চলেছে তারা। নানান ভুল, ভ্রান্তি আর আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়ে দিনে দিনে তারা জোরদার সংগঠন গড়ছে শেষ লডাই-এর জন্যে। সিরাজ চৌধুরী সেই লডাই-এর কথাই বলতে চেয়েছেন "নবতরঙ্গের" মধ্য দিয়ে।

যে দেশের বেশীর ভাগ মানুষ বেকার জীবন যাপন করে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, একটা চাকরীর অভাবে দু' মুঠো অন্ন সংস্থানের অভাবে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে, সেই দেশের ধনিকশ্রেণী মুনাফার পাহাড তৈরী করার জন্য কম্পিউটার মেসিন বসিয়ে অনেক মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে একটা মেসিনের সাহায্যে অনেক মানুষের কাজ করাতে চায়। তারা কি নির্মম, কি নৃশংস, এমন কি তাদের দেশদ্রোহী আখ্যা দিলেও বোধ হয় ভুল

হবে না। "কল্পতরু" নাটকের মধ্য দিয়েই এহেন জাতীয় সমস্যা হাজির করেছেন বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। অটোমেশনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ঘোষ করেছেন তিনি।

বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে মেহনতী জনসাধারণ যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, যে ভাবে তারা ভেঙ্গে পড়েছে সংগ্রামের পথে, দেশে দেশে শিকল ছিঁড়ে এগিছে চলেছে বিপ্লবের পথে। "কিউবা" নাটকে ভোলা দং সেই চিত্রই তুলে ধরেছেন। নাটকটি দুই ভাবে অভিনয় করা যায়, দুটো দৃশ্য ব্যবহার করা যায়—আবার একই মঞ্চে Jonal Acting করেও অভিনয় করা যায়।

সেদিন খবরের কাগজে দেখলাম দিল্লীতে কয়েকটি যুবক যুবতী পুলিশবে পাশ কাটিয়ে জোর করে কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের দাবী জানিয়েছেন, বাঁচা দাবী, বেকারত্ব দূর করার দাবী। সেই দাবী নিয়েই নিষ্ঠার সংগে সৎভাবে মানুষের মত বেঁচে থাকার সামান্যতম দাবী নিয়েই লিখেছেন সাধনব চট্টোপাধ্যায়—"আমি থামব না"।

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, যাদের হাতে থাকে রাষ্ট্রযন্ত্র আর হাতে থাকে প্রচুর পয়সা ; তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, অপরকে নানান ধরনের উপদেশে ট্যাবলেট বিলি করে, আর নিজেদের চরিত্রহানি প্রতিমুহূর্তে ঘটায়। তারা বাইরে থেকে যতোটা মহাপুরুষ সেজে থাকার চেষ্টা করে আসলে ভেতরটা কিন্তু আবর্জনায় স্তূপাকার হয়ে থাকে। ব্যক্তিস্বার্থ, ঈর্ষা ও লোভের জন্য তারা পারে না হেন কাজ নেই। নিজের সত্ত্বাটাকে রক্ষা করার জন্য অপরকে খুন পর্যন্ত করতে দ্বিধা করে না তারা। বাইরের আবর্জনা পরিষ্কার করতে হলে যেমন ঝাড়ুদারের প্রয়োজন হয়, তেমনি সমাজের ঐ নিকৃষ্টতম জীব গুলোকেও সাফ করতে হলে দরকার সমাজবিপ্লবের। এই সংকলনে তিন ঐ ধরনের শ্লেষাত্মক নাটক দিলাম যে তিনটি নাটকের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই পুঁজিপতি শ্রেণীর আত্মকলহ, অন্তর্দ্বন্দ্ব আর ধর্মের মুখোশে

আড়ালে ব্যভিচারি তাণ্ডব। প্রথম নাটক চেখভ অবলম্বনে অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের "সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে"। দ্বিতীয় নাটক জোছন দস্তিদারের "প্লট"। তৃতীয় নাটক দুলেন্দ্র ভৌমিকের "গুপ্তবিদ্যা"-য় পুরোন কাহিনীকে আধুনিক বিষয়বস্তুতে হাজির করা হয়েছে।

একটা যুগ চলে যায় আর একটা যুগ আসে কিন্তু সংগ্রাম থেকে যায় যুগ যুগ ধরে। শুধু পাল্টায় সংগ্রামের রূপনীতি। সেই নীতির ভিত্তিতেই শুরু হয় নতুন করে সংগ্রামের প্রচেষ্টা, সেই পুরানো আর নতুনের দ্বন্দ্বই চলেছে, চলছে। কিন্তু যে আগুন জ্বলেছিল কোন একদিন সেই জ্বলন্ত মশাল আজও জ্বলছে আর সেই আগুনই অমর গঙ্গোপাধ্যায় "অগ্নিহোত্রী"র মধ্য দিয়ে জ্বালিয়ে রেখেছেন।

কাল প্রবহমান, স্রোতের মত এগিয়ে চলেছে, যাবার পথে রেখে যাচ্ছে একটা কথা, বাঁচার কথা। এই বাঁচাটাই মানুষের চিরকালের ভাবনা, শোষণের মধ্য দিয়ে নয়, সুখ সমৃদ্ধিশালী জীবনের মধ্য দিয়েই মানুষ বাঁচতে চায়, নতুন কিছু পেতে চায়, সেই চিরকালের বাঁচার কথাই বসন্ত ভট্টাচার্য বহন করে এনেছেন "পরাজিত পৃথিবী"র মধ্য দিয়ে। পলতায় প্রতিরূপ সংস্থা আয়োজিত একাংক নাটক প্রতিযোগিতায় নাটকটি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার পেয়েছে।

এতো বিপ্লব, বিদ্রোহ, ব্যঙ্গ ও কান্নার মাঝে একটি নিছক হাসির নাটক দেওয়া গেল, শৈলেশ গুহ নিয়োগীর "উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।" এই নাটকটি নাট্যরসিকদের সেই আনন্দে ভরিয়ে দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

এবার শুরুর পথেই শেষ করা যাক। কাকদ্বীপের এক মা, নবতরঙ্গ আর আর যে সব মেজাজের নাটক দিয়ে এই সংকলনটা শুরু করা হয়েছে, সেই মেজাজের আর একটি নাটক রবীন্দ্র ভট্টচার্য-এর "আর এক তরঙ্গ" দিয়ে সংকলনটি শেষ করা হল।

সামন্ততন্ত্র শোষণের জাঁতাকলে ফেলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি গ্রামে গ্রামে কিভাবে ধর্মের ভাঁওতা দিয়ে নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষকে দিনের পর দিন

নিত্য নতুন কায়দায় শোষণ করে চলেছে—সেই শোষণের মুখোশ-ই খুলে ছিঁড়ে ফেলেছেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য তার এই নাটকের মধ্য দিয়ে।

এই তৃতীয় সংকলনটি প্রকাশ করার পথে আমার একটা চিন্তাই কাজ করেছে তা হচ্ছে ভাল ভাল নাটক, যে নাটক বহু প্রশংসিত; গত দু'বছর নানা জায়গায় পুরস্কার লাভ করেছে সেই সব নাটকই খুঁজে এই সংকলনে সংকলিত করা হল।

এই সংকলনের বেশীর ভাগ নাট্যকারদের হয়তো অনেকেই চেনেন না জানেন না, কিন্তু তাদের এই সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের কাছে তাদের পরিচয়কে আরো ঘনিষ্ঠ করে তুলবে বলে আমার বিশ্বাস। এই সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে সত্যপ্রিয় বড়ুয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। সবশেষে নাট্যানুরাগী বন্ধুরা যারা এই "একালের একাঙ্ক" পর পর তিনটি সংকলন প্রকাশ করতে সাহায্য করেছেন তাদের জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন—

সুশীল দত্ত

মানিকের বন্ধু পরাণ পোড়েল, জিলাল, পরেশ গায়েন, কেষ্ট সিকদার এবং গাঁয়ের মোড়ল পাঁচু মান্না এবং খুড়ো সবাই সসব্যস্ত। রাজারহাটের সেরেস্তার নায়েব, কি করা উচিত না ভাবতে পেরে এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। বিহ্বল কার্তিক সাঁতরা মাষ্টারের কাছে হা-হুতাস করছে।

পাঁচু ॥ বলি, এত হৈ-হট্টগোল কি কারো সহ্য হয় ?

পরেশ ॥ হৈ হট্টগোল কিসের ?

খুড়ো ॥ তা বাপু তোমাদের এত হাসি মস্করার দরকারটা কি ?

পরাণ ॥ ঠিক বলেছ খুড়ো। আমি তখন থেকে পরেশটাকে মানা করছি।

খুড়ো ॥ বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়। বুঝেছো।

পরাণ ॥ এক হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম সন্না।

পরেশ ॥ তুমি থাম, পেত্তেক কথায় তোমাকে আর ধুয়ো ধরতে হবে না। কি বাড়াবাড়িটা আমি করেছি ?

খুড়ো ॥ নেমতন্ন বাড়ীতে এত গান বাজনা কেন ?

পরেশ ॥ গায়েনের ব্যাটা গান গাইবে না তো কি জমিদার বাড়ীতে মাগনায় মাছ পৌঁছে দেবে।

খুড়ো ॥ মুখ সামলে কথা বল হারামজাদা।

পরেশ ॥ গোমোড় ফাঁক হলেই মেজাজ গরম।

খুড়ো ॥ আমাকে চটাস না, তাতে ফল সুবিধের হবে না।

পরেশ ॥ দেখলাম কত মহারথী, এখন এলেন কেসটে হাতা।

[illegible] ॥ সবনাশ হবে। এই গানই তোদের সর্বনাশ করবে। তোর বাপ মরেছে কড়িকাঠে ঝুলে - কিন্তু তোর জন্যে এঁদো পুকুরও জুটবে না।

...ব ॥ হরি হে দীনবন্ধু, আজ আমি উঠিহে কাতিক। হ্যাঁ হে, মানিককে তো দেখছি না।

...র্তিক ॥ শত্তুর, শত্তুর। ওর জন্যে আপনাদের কাছে আমার মাথা কাটা

যাচ্ছে। ছোট কত্তাকে কত বলে কয়ে চাকরী করে দিলাম। ছয়টা মাস টিকতে পারলো না।

নায়েব ॥ তা গেছে কোথায় ?

কার্তিক ॥ সবই তো জানেন। চাষী খেপাচ্ছে। সমিতি বানাচ্ছে। এদিকে যে ঘরের বৌটা মরতে বসেছে সে খবর কে রাখে। সাত মাসের পোয়াতী। হঠাৎ কি যে হলো !

নায়েব ॥ অত উতলা হচ্ছ কেন ?

কার্তিক ॥ পেটের-টার কিছু ক্ষতি হবে না তো !

সুন্দরী ॥ [দাওয়ার ওপর শোয়া অবস্থাতেই প্রায় অস্ফুট স্বরে] বাবা, বাবা, সেই লোকটা আবার এসেছে .

কার্তিক ॥ এই তো মা, আমি তোমার কাছেই আছি। তুমি কার কথা বলছো ?

সুন্দরী ॥ ঔ।

মাষ্টার ॥ তুমি কার কথা বলছো ?

কার্তিক ॥ ওরে বৌমা অজ্ঞান হয়ে গেল !

[কেষ্ট, জিলাল এবং আরো ২ একজন জল এবং পাখার খোঁজে বাইরে বেরিয়ে যায়]

নায়েব ॥ হরি হে দীনবন্ধু, তুমি চিন্তা করো না কার্তিক ! সবই তোমার ইচ্ছা।

কার্তিক ॥ কি যে আমার অদৃষ্টে আছে।

নায়েব ॥ তোমার বাড়ীতে আজ প্রথম এলাম। এমন খিটকেল হবে কে জানতো !

কার্তিক ॥ কি যে এখন করি !

[এমন সময় মানিক ঢোকে, তার বগলে এক বাণ্ডিল পোষ্টার এবং কাঁধে চোঙ্গা]

মাষ্টার ॥ এই যে কোথায় ছিলি এতক্ষণ !

মানিক ॥ মোল্লারচকে গিয়েছিলাম তা সব চুপচাপ কেন ? আপনি যে ৭ ক্রোশ পথ হেঁটে আসবেন ভাবতেই পারিনি ।

মাষ্টার ॥ বৌমা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে ।

কার্তিক ॥ কি রাজকার্য সমাধা হয়েছে !

মানিক ॥ কেন ? হঠাৎ, কি হয়েছিল !

কার্তিক ॥ সেটা তোর না জানলেও চলবে যত্ত সব—

নায়েব ॥ কার্তিক মাথা গরম কোরো না । শোন এদিক এসো । দরকার আছে । [নায়েব কার্তিককে এক কোণে নিয়ে যায়]

মাষ্টার ॥ (মানিককে) বাড়ী থেকে বেরো না । আমি শ্রীরামপুর যাচ্ছি । এখুনি ওষুধ নিয়ে ফিরবো । পরেশ চল, আমার সঙ্গে যাবি ।

[পরেশ এবং মাষ্টারের প্রস্থান]

নায়েব ॥ হ্যাঁ—হ্যাঁ । ভোরেই যেতে হবে ।

কার্তিক ॥ কিন্তু—

নায়েব ॥ বুঝলাম । কিন্তু করার কিছু নেই । কর্তাবাবু রাত্তিরেই যেতে বলেছিল । গেরামের চাষীরা [illegible] পাগার রুখবে । ভোরের গাড়ীতে ছোটকর্তাও তার কারখানার লোকজন নিয়ে আসছে ।

কার্তিক ॥ কেন ? এত লোকজন দিয়ে হবেটা কি ?

নায়েব ॥ অত কথা বলার এখন সময় নেই । কাল ভোরেই যেও, সব বুঝতে পারবে । আমি চললাম । তুমি [illegible] । [নায়েব চলে যায়]

সুন্দরী ॥ বাবা, বাবা !

কার্তিক ॥ এই তো মা । এই তো আমি ।

পাঁচু ॥ গতিক বড় খারাপ ।

খুড়ো ॥ হ্যাঁ হে কার্তিক, বৌমার কোন রোগ-টোগ ছিল না তো ?

কার্তিক ॥ আজ্ঞে না ।

খুড়ো ॥ এর আগে কি কোনো দিন ফিটের ব্যায়রাম হয়েছে ?

কার্তিক ॥ আজ্ঞে না !

খুড়ো ॥ দেখ্ কার্তিক, একটা কথা বলবো ?

কার্তিক ॥ বলেন।

খুড়ো ॥ বলাটা উচিৎ হবে কিনা ভাবছি।

কার্তিক ॥ এই অসময় উচিৎ-অনুচিত বিচার করা কি চলে !

খুড়ো ॥ বৌমার হাভভাব দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো ?

কার্তিক ॥ কি মনে হচ্ছে ?

খুড়ো ॥ বৌমাকে ভূতে ধরেছে ; সুতরাং ওঝা ছাড়া অন্য কোন ওষুধ নেই।

[উপস্থিত সকলে কয়েক মুহূর্ত পাথর হয়ে যায়। নীরবতা ভাঙ্গে কার্তিক]

কার্তিক ॥ তা হলে উপায় !

খুড়ো ॥ কাণ্টু ওঝাকে এখুনি খবর দাও।

কার্তিক ॥ কেষ্ট, বাবা এখুনি যা। গা হাত পা সিটিয়ে আসছে আমার

কেষ্ট ॥ কিছু ভেবো না। আমি এক ছুটে ডেকে আনছি শালাকে।

[সবাই ধীরে ধীরে চলে যায়। কার্তিক দাদিকের দাওয়ায় গিয়ে বসে]

মানিক ॥ ওঝা এসে কচু করবে।

কার্তিক ॥ এত যোগাড় যন্তর এত চেষ্টা চরিত্তির সব বৃথা। দই মিষ্টি ডাল তরকারী সব খালের জলে ভাসিয়ে দিতে হবে। সেরায় দুই হাজার টাকা চোট।

মানিক ॥ এই সময়েও তোমার টাকার কথাটাই মনে পড়লো।

কার্তিক ॥ এ কথার অর্থ ?

মানিক ॥ তখন থেকে বেহুস হয়ে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে গ্যাজলা বেরুচ্ছে, অথচ সেদিকে কারো কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। শুধু টাকা আর টাকা !

কার্তিক ॥ মুখে মুখে তর্ক করিস না। বুঝবি, বুঝবি একটু বয়স বাড়ুক টাকার মর্ম হাড়ে হাড়ে টের পাবি।

মানিক ॥ সে তো এখনি পাচ্ছি।

কার্তিক ॥ মানে ?

মানিক ॥ একটা মানুষের জীবনের থেকে টাকার দাম বেশী। সংসারের শান্তির চেয়েও টাকার দাম বেশী।

কার্তিক ॥ শান্তি, শান্তি এ বাড়ীতে আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। পোয়াতি বৌরে ভূতে ধরেছে, কুগ্রহের ফের।

মানিক ॥ হুঁ, ভূতে ধরেছে !

কার্তিক ॥ ধরেছেই তো।

মানিক ॥ কি করে বুঝলে ?

কার্তিক ॥ শুনলি না, খুড়ো নিজের মুখে বলে গেল !

মানিক ॥ খুড়ো কি পীর যে তার সব কথা মেনে নিতে হবে।

কার্তিক ॥ না মানিস তো তোর যা খুশি কর।

[পরেশ ঢোকে]

পরেশ ॥ মানিক, মানিক এই যে জ্যাঠা বৌ কেমন আছে ?

কার্তিক ॥ একই রকম।

পরেশ ॥ এখনো কি চমকে চমকে উঠছে।

কার্তিক ॥ হ্যাঁ।

পরেশ ॥ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ভাগ্যিস মাষ্টার ছিল। এই নে মানিক ওষুধটা ধর। এখুনি একদাগ খাইয়ে দে। একটা সাইকেল পেয়ে গেলাম। মাষ্টার খানিক বাদেই আসছে। তা বৌকে দাওয়ায় শুইয়ে রেখেছো কেন ?

কার্তিক ॥ ভূতে ধরলে ঘরে নিতে নেই।

পরেশ ॥ [অবাক হয়ে] ভূতে ধরেছে—মানে ?

কার্তিক ॥ ওঝা না দেখা পর্যন্ত ও বৌরে আমি ঘরে নেব না। সংসার ছারখার হয়ে যাবে।

পরেশ ॥ সত্যিই কি ওঝা ডাকতে পাঠিয়েছ নাকি?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ। কেষ্টা গেছে সংগে করে নিয়ে আসতে।

পরেশ ॥ কিন্তু ডাক্তারবাবু বলে দিয়েছেন ওঝা-ফোজা যেন ডাকা না হয়।

কার্তিক ॥ ভূতে ধরলে ডাক্তারের বাবার সাধ্যি নেই যে কিছু করে।

পরেশ ॥ মাষ্টার কিন্তু পৈ-পৈ করে ওঝা ডাকতে বারণ করেছে।

কার্তিক ॥ বলি, বাড়ীটা আমার না মাষ্টারের। মাষ্টারের কথায় এ তল্লাটের চাষীরা নাচতে পারে—কিন্তু—

মানিক ॥ খুড়ো বললো ভূতে ধরেছে—ব্যস, সেটাই বেদবাক্য হয়ে গেল। আর অত বড় একটা লেখাপড়া জানা লোক—

কার্তিক ॥ ভূত-পেত্নী ডাকিনী যোগিনীদের ব্যাপার আলাদা। লেখাপড়া শিখলেই সেটা জানা যায় না।

মানিক ॥ হ্যাঁ শুধু বসে বসে তামাক টানলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছু জানা হয়ে যায়।

পরেশ ॥ পরাণপুরের মণি মণ্ডলের বাড়ীর কথা মনে পড়ে। গেরামশুদ্ধ রটে গেল, ছোট ছেলের বৌরে ভূতে ধরেছে। ওঝা এসেও কিছু করতে পারলো না। শেষে মাষ্টার ডাক্তার বদ্যি ডাকিয়ে তাকে সারালো।

কার্তিক ॥ সারালো! সারালে আর সর্পাঘাতে মৃত্যু হতো না।

পরেশ ॥ সাপে কাটলো তো চার বছর পর। তা ছাড়া ভূতের সঙ্গে সাপের সম্পর্কটা কি?

কার্তিক ॥ আছে।

পরেশ ॥ আছে মানে?

কার্তিক ॥ অপঘাতে মৃত্যু হল ভূতে ধরার লক্ষণ। ভূতের গন্ধই সাপ টেনে এনেছে বুঝলি?

পরেশ ॥ সাপ তাহলে প্রথমেই গেলো না কেন? চার বছর বাদ কি তাহলে ভূতের গন্ধ ছড়াতে শুরু করে!

কার্তিক ॥ থাম দিকিন। ভ্যাচর, ভ্যাচর করিস না।

পরেশ ॥ (মানিককে) ওষুধ খেলে?

মানিক ॥ হ্যাঁ।

পরেশ ॥ পুরোটা?

মানিক ॥ হ্যাঁ।

পরেশ ॥ শুনলে জ্যাঠা, বৌ-এর তাহলে জ্ঞান ফিরে আসছে!

সুন্দরী ॥ ম—মাগো!

পরেশ ॥ মানিক, মাষ্টার ঠিকই বলেছিল—ভোরের দিকেই জ্ঞান ফিরে আসবে। মানিক যা বৌকে ধর। বৌ-এর জ্ঞান ফিরে আসছে।

সুন্দরী ॥ সবাই কি চলে গেছে? বাজনা বাজছে না কেন?

পরেশ ॥ তুমি ভাল হয়ে ওঠ আবার বাজনা বাজবে

সুন্দরী ॥ আমার কি হয়েছিল?

মানিক ॥ তুমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে।

সুন্দরী ॥ আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

মানিক ॥ কেন?

[কান্টু, ওঝা এবং কেষ্টর প্রবেশ]

ওঝা ॥ আমি এসেছি, আমি এসেছি।

অন্তর মন্তর যন্তর ধু

হিজিবিজি কিচিমিচি যাবে চুকে ল্যাঠা।

যা চলে যা পেত্নী মাগী

কপালে তো ঝাঁটা ॥

যা—যা, শ্যাওড়া গাছে যা।

সুন্দরী ॥ কে—কে ও!

কার্তিক ॥ ওঝা।

সুন্দরী ॥ কেন ? ও এখানে কেন ?

কার্তিক ॥ তোমাকে ভূতে ধরেছে।

সুন্দরী ॥ না, না, মিথ্যে কথা। আমায় কিচ্ছু হয়নি।

ওঝা ॥ পেয়েছি। গন্ধ পেয়েছি।

ভূত পেত্নী শাকচুন্নী বেম্মদত্তির ছাও
নাকি কেঁদে আজকের মত রেহাই পেতে চাও ?

বাড়ীর কত্তা কে ?

কার্তিক ॥ আমি।

ওঝা ॥ এক টাকা সোয়া পাঁচ আনা।

কার্তিক ॥ আজ্ঞে !

ওঝা ॥ ঠিক আছে, তুমি একটাকা তি'রিশ নয়াই দেও। হাতে না ঝোলায় দেও। এই তোমরা সব হাত জোর করে দাঁড়াও। ভূতের নাম জানতে হবে। কে ? কে রে ব্যাটা তুই।

ইচিবিজি—ঘিচিমিচি, কিচিবিচি ঝা।
নাম ধাম পরিচয় সব বলে যা।

(খানিক চুপ) পেয়েছি। কত্তা ইদিক শোন। প্রেত জাগাতে হবে। ভর ছাড়া এখানে কারো থাকা চলবে না। সোয়া পাঁচ আনা।

কার্তিক ॥ আজ্ঞে !

ওঝা ॥ ভূতের সিন্নি তিরিশ নয়া। হাতে নয় ঝোলায় দাও। এই গণ্ডী দিলাম, ডাকার আগেই ইদিক এলে বেম্মদত্তি ঘাড় মটকাবে। যাও।

[সকলে চলে যায়]

কি নাম তোর।

সুন্দরী ॥ সুন্দরী।

ওঝা ॥ কি হয়েছে তোর ?

সুন্দরী ॥ না, না, আমার কিছু হয় নি।

ওঝা ॥ হয়েছে, হয়েছে। সোয়ামী তোরে আদর করে না। আমি তোরে আদর করবো। দেখি তোর মুখ—চল ঐ কাছি কোণায় চল।

সুন্দরী ॥ ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

ওঝা ॥ ভূত তোকে আমি ছাড়াবোই।

সুন্দরী ॥ ছাড়ো, ছাড়ো। [সুন্দরী ওঝার হাত কামড়ে দেয়]

ওঝা ॥ বাঁচাও, বাঁচাও। মেরে ফেল্লো।

[খুড়োর সংগে গ্রামের কিছু লোকজন ঢুকে পরে]

খুড়ো ॥ কি ব্যাপার?

মানিক ॥ কি হয়েছে?

ওঝা ॥ যব্বর ভূত। বাঁধ শালীকে, শালী যেন পালাতে না পারে। ধুনো লঙ্কার ধোয়া খাবার সাধ হয়েছে। এই এক কলসী জল নে এসো তো। এই জলের কলসী তোকে মুখে করে নে যেতে হবে।

ছু মন্তর ছু। কাকের পাছায় ফু।

এখানে যদি না যাস তো খাবি মরা বাপের গু॥

[মাষ্টার ঢোকে]

মাষ্টার ॥ কি ব্যাপার, এ সব কি হচ্ছে।

ওঝা ॥ ভূত—ভূত—ভূতে ধরেছে।

মাষ্টার ॥ মানিক, বৌমার বাঁধন খুলে দে।

কার্তিক ॥ ভূত প্রেত নিয়ে ছেলে খেলা কোরো না মাষ্টার।

ওঝা ॥ এতে ফল খুব খারাপ হবে। আমি রেগে গেলে কিন্তু বান মেরে দেব।

মাষ্টার ॥ আর যদি বান মারতে না পারো।

ওঝা ॥ আমি কিন্তু রেগে যাচ্ছি।

মাষ্টার ॥ কি খাওয়াচ্ছিলে ওকে?

ওঝা ॥ কামরূপ কামিখ্যার মহাপ্রসাদ।

মাষ্টার ॥ কি আছে ওতে ?

ওঝা ॥ (ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে) তার আমি কি জানি !

মাষ্টার ॥ আমি জানি। আছে ধুতরোর ফল বাটা। খেলে মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

১ম চাষী ॥ কি অলক্ষুণে ব্যাপার ! ওঝার সংগে তর্ক !

খুড়ো ॥ আজ একটা খব্বর কেলেঙ্কারী হবে। আমি যাই।

[গ্রামের লোকেরা চলে যায়]

কার্তিক ॥ (মাষ্টারকে) তুমি যাবে কিনা আমি জানতে চাই।

মাষ্টার ॥ আপনার কি এখনো চোখ খুলছে না। ভূত তাড়ানোর নাম করে—

কার্তিক ॥ ও সব তোমার না দেখলেও চলবে।

মাষ্টার ॥ সব বাড়ীতে আমি অসুখ বিসুখ দেখি।

কার্তিক ॥ আমার বাড়ীতে না দেখলেও চলবে।

মানিক ॥ না, চলবে না।

কার্তিক ॥ মানকে !

মানিক ॥ অতই যদি মন্ত্রের জোর তো দেখাক বান মেরে !

ওঝা ॥ ঠিক আছে দেখাচ্ছি !

কার্তিক ॥ যা খুশি তোমরা কর। আমি নেই।

[কার্তিক হন হন করে বেরিয়ে যায়]

ওঝা ॥ ন্যাঠা বান, জ্যাঠা বান শক্তিশেল বান।
সব বানের ঠাকুরদাদা পাসুপৎ বান ॥
যা মন্তর ছুটে যা, ধনুক খান আন।
আল্লার নাম করে আমি তাতে মারি টান ॥

চোখ বোঁজ, চোখ বোঁজ সব। ধনুকের গুণ এখন আমি ছাড়ছি না। বাড়ী গিয়ে ছাড়বো। কাল সকালে তুই নির্ঘাৎ মরে থাকবি।

[ওঝা পালায়]

কেষ্ট ॥ ওঝা আলের ওপর দিয়ে ছুটছে।

পরেশ ॥ শালা! চল একটু দেখে আসি।

[কেষ্ট এবং পরেশের প্রস্থান]

মাষ্টার ॥ মানিক বাঁধন খুলে দে।

সুন্দরী ॥ আপনি আমাকে বাঁচান।

মাষ্টার ॥ ভয় কিসের। এই ওষুধটা খেয়ে নাও। খুব হৈ হট্টগোল হচ্ছিল না!

সুন্দরী ॥ হ্যাঁ।

মাষ্টার ॥ সেইজন্যই তোমার মাথা ঘুরে গেছলো, না!

সুন্দরী ॥ না।

মাষ্টার ॥ না, মানে।

সুন্দরী ॥ না, আমি বলবো না

মাষ্টার ॥ ছিঃ বোকামী করে না। না বললে বুঝবো কেমন করে। বলো, বলো মা।

সুন্দরী ॥ হঠাৎ গেরামের একটা ঘটনা মনে পরে গেল!

মাষ্টার ॥ নিশ্চিন্তিপুরের?

সুন্দরী ॥ হ্যাঁ, নিশ্চিন্তিপুরের। দাঙ্গা হচ্ছে।

মানিক ॥ দাঙ্গা?

সুন্দরী ॥ হ্যাঁ, জমিদখলের লড়াই চলছে। হঠাৎ জমিদারের লোকজনেরা গেরামে ঢুকে পড়লো। কয়েকজন চাষী পেরাণ ভয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে পড়লো।

মানিক ॥ তারপর!

সুন্দরী ॥ আমার বাবা ছিল তখন ঘরে। দরজায় খিল দিয়ে দিল। কিন্তু হঠাৎ—

মাষ্টার ॥ দরজার খিল ভেংগে গেল।

সুন্দরী ॥ ঘরে ঢুকলো একটা লোক, রোগা চেহারা, চোখদুটো ভাটার মত জ্বলছে।

মাষ্টার ॥ পেছনে তার কয়েকজন লেঠেল।

সুন্দরী ॥ বাবাকে বললো, লোকগুলোকে বের করে দাও। বাবা রাজী হলো না। তারপর—

মাষ্টার ॥ একটা আওয়াজ হলো।

সুন্দরী ॥ বন্দুকের কুঁদোর গুঁতোয় বাবার মাথা দু'ফাঁক হয়ে গেল। ঘরের মেঝে রক্তে ভেসে গেল। আমি আটকাতে গেলাম, চড় খেয়ে পড়লাম বাবার বুকের ওপর।

মাষ্টার ॥ তারপর এক এক করে টেনে বের করা হল লোকগুলোকে।

সুন্দরী ॥ শুধু চিৎকার আর হৈ-হট্টগোল।

মাষ্টার ॥ কেউ পালালো, কারো মাথা ফাটলো লাঠির ঘায়ে।

মানিক ॥ কিন্তু এত কথা তুমি জানলে কি করে?

মাষ্টার ॥ দশ বারো বছর আগের কথা। বংশী মণ্ডল সারা তল্লাটটাকে হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে। (সুন্দরীকে) তোমার তখন বয়সই বা কত! বড জোর ছ'সাত বছর।

সুন্দরী ॥ আপনি আমার বাবাকে চিনতেন?

মাষ্টার ॥ হ্যাঁ চিনতাম। গ্রামের সেই হাজার মানুষের ঢেউকে থামিয়ে দেবার জন্য জমিদারের লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়লো পাগলা কুকুরের মত। সেদিন বংশী মণ্ডলও ঠেকাতে পারলো না। কুঁদোর গুঁতোয় মাথা ফেটে দু-ফাঁক হয়ে গেল। রক্ত ঝরলো—অনেক-অনেক রক্ত।

সুন্দরী ॥ কিন্তু যারা রক্ত ঝরালো। তারা তো আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মাষ্টার ॥ হ্যাঁ, তা বেড়াচ্ছে।

সুন্দরী ॥ কিন্তু তারা কি কোনোদিনই শায়েস্তা হবে না।

মাষ্টার ॥ হবে, মা হবে। সেদিন ঘনিয়ে এসেছে।

সুন্দরী ॥ কবে, কবে হবে?

[সুন্দরী কান্নায় ভেংগে পড়ে]

মাষ্টার ॥ তুমি কি তাদেরই কাউকে আজ এখানে দেখেছিলে? আর তারই জন্য—

সুন্দরী ॥ হ্যাঁ, ঠিক একই রকম দেখতে।

মানিক ॥ কে সে?

সুন্দরী ॥ নায়েব ভট্টাচায্যি।

মানিক ॥ নায়েব, মানে—সে তোমার বাবাকে—মানে—

মাষ্টার ॥ হ্যাঁ—খুন করেছিল।

মানিক ॥ মাঝে মাঝে সব কিছু কেমন গুলিয়ে যায়। মনে হয় একই জায়গায় বুঝি ঘুরপাক খাচ্ছি। চিরদিনই তো চাষীর রক্ত ঝরছে—কিন্তু সব বৃথা। ও শালারা ঠিকই—

মাষ্টার ॥ না রে, বৃথা নয়। বৃথা হতে পারে না। সেদিনের বংশী মণ্ডলের রক্তের ঢেউ আজ নিশ্চিন্তিপুর পেরিয়ে কমলাপুরে। কমলাপুর পেরিয়ে বাবুর ভেরী, রাজারহাট, নসীপুর, চকপেল্লাদপুর, মালঞ্চ। সারা তল্লাট জুড়ে একটা তুফান জেগে উঠেছে।

মানিক ॥ সব মানলাম। কিন্তু বংশীমণ্ডলরাও তো দলে কম ছিল না! কেন তবে তারা হামলা ঠেকাতে পারেনি?

মাষ্টার ॥ ভুল করেছিল বলে।

মানিক ॥ ভুল করেছিল?

মাষ্টার ॥ নিশ্চয়।

মানিক ॥ কোথায় ভুল করেছিল ? তারা কি সারা গেরামের মানুষের মধ্যে মিশে যেতে পারেনি ?

মাষ্টার ॥ তা পেরেছিল।

মানিক ॥ জমি কেন দখল নিতে হবে তাও নিশ্চয়ই বোঝাতে পেরেছিল।

মাষ্টার ॥ হ্যাঁ, পেরেছিল।

মানিক ॥ তার শত্রুকে চিনিয়ে দিয়েছিল ?

মাষ্টার ॥ হ্যাঁ।

মানিক ॥ লড়াই-এর উপযুক্ত সংগঠন তৈরী করেছিল ?

মাষ্টার ॥ না, করেনি। আর ভুলটা সেইখানেই। তারা জমিদখলে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দখল করবার পরের কথাগুলো পরিষ্কার ভাবে ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি যে শুধুমাত্র রাগ আর ঘেন্নাই জমিদারের বন্দুকের কুঁদোকে আটকাতে পারবেনা। তারজন্য প্রয়োজন––

মানিক ॥ বুঝলাম।

মাষ্টার ॥ যতদিন যাচ্ছে ততই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে জিনিষগুলো।

মানিক ॥ তা হলে কি বলতে চাও আমরা ভুল করছি ?

মাষ্টার ॥ আমরা, আমরা মানে ?

মানিক ॥ এই যে আমরা আগামী কাল কালীসা'র চালের আড়ৎ ঘেরাও-এর ডাক দিয়েছি—এটা কি ভুল ?

মাষ্টার ॥ মোটেই না। কিন্তু চাল ঘেরাওই শেষ নয়। তাই যেন তেন প্রকারেণ চাল ঘেরাওটা করতে পারলেই চুকে গেল ল্যাঠা—এ ধরনের সংগঠন করার চিন্তাটাই হচ্ছে মারাত্মক। এবং এটাই আমরা এতকাল করে এসেছি।

মানিক ॥ কিন্তু সবাই কি তা বুঝবে।

মাষ্টার ॥ মাথায় জটা থাকলেই শুধু সেটা আগে বলা সম্ভব। কিন্তু তোর

আমার মত মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। সকলের সংগে মিশে যেতে হবে। কেন বুঝতে চাইছে না জানতে হবে। নিজেদের তৈরী করতে হবে তাদের মত করে বোঝাবার জন্যে।

মানিক ॥ তুমি যদি কাল সভায় থাকতে, তা হলে খুব ভাল হত।

মাষ্টার ॥ কেন নিজের ওপর আস্থা নেই ?

মানিক ॥ না-মানে—

মাষ্টার ॥ নিজেকে একটু আলাদা করে দেখছিস বলেই এই সংকোচ। তাছাড়া হাতে কলমে কাজ করতে গেলে ভুল চুক তো হবেই। কাজের মধ্যেই সে গুলোকে শুধরে নিতে হবে। কেবল কুঁড়েদেরই ভুলের বালাই নেই।

মানিক ॥ প্রায় সব কটা গ্রামেই খবর দেওয়া হয়েছে। কাতারে কাতারে মানুষ জমা হবে কাল নসীপুরের মাঠে। গেরামের মোড়লদেরও সভা বসবে সকালে।

মাষ্টার ॥ কোথায় ?

মানিক ॥ এখানে।

মাষ্টার ॥ সাব্বাস ! কিন্তু তোর বাপ ?

মানিক ॥ সে তো কথা পর্যন্ত বলে না। তার ওপর আজকের এই ঝামেলা।

মাষ্টার ॥ খুবই আফশোষের কথা ! কত কাল ভাল মন্দ খাই না। যাওবা একটা নেমন্তন্ন পেলাম—

মানিক ॥ এ ঘটনাটার আজ খুবই দরকার ছিল।

মাষ্টার ॥ কেন ?

মানিক ॥ মনের সংগে একটা ঝগড়া চলছিল। মা'র কথা স্মরণে আসে না বাবাই আমার সব। কথা কাটাকাটি হলেই দমে যেতাম। একটা টানা-পোড়েনের খেলা চলছিল সব সময়। কিন্তু আজ সব শেষ।

বারবার শুধু চোখের সামনে ভেসে উঠছে নায়েবের মুখ, আর ঠিক তার পেছনে একটা কদাকার বীভৎস মানুষ। জমিদার কালী সা।

মাষ্টার ॥ তারও পেছনে তার ছেলে অম্বিকাচরণ আর এক দংগল ফ্যাকট্রির গুণ্ডা আর তাদের সকলকে ঘিরে রয়েছে—

মানিক ॥ খাকী পোষাক পরা একপাল জানোয়ার।

মাষ্টার ॥ আর তারও পেছনে—

মানিক ॥ তার পেছনে কিছু আছে নাকি ?

মাষ্টার ॥ ভাল করে চেয়ে দেখ।

মানিক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার দেখতে পাচ্ছি। একটা অদ্ভুত জন্তু।

মাষ্টার ॥ ওর নাম রাষ্ট্রযন্ত্র।

মানিক ॥ তার পেছনেও যে দেখতে পাচ্ছি।

মাষ্টার ॥ সেটাই স্বাভাবিক।

মানিক ॥ একটা বিরাট হাত। জঘন্য ফ্যাকাশে সাদা একটা হাত। আঙুলে সুতো বাঁধা। আর সেই সুতোটা ফাঁস হয়ে লটকে রয়েছে ঐ অদ্ভুত দেখতে জন্তুটার গলায়।

মাষ্টার ॥ অর্থাৎ দাবার ঘুঁটির মত সব সাজানো।

মানিক ॥ সুতোয় টান পরলেই বুঝি নাচতে শুরু করবে।

[এমন সময় পরেশ ঢোকে]

পরেশ ॥ (ওঝার ভংগীতে) আমি এসেছি, আমি এসেছি।

ছুমন্তর ছু। কাকের পাছায় ফু।

এখনও যদি না যাবিতো খাবি মরা বাপের গু ॥

মানিক ॥ ওফ, পিলে চমকে গেছলো।

পরেশ ॥ তিন তিনটে মানুষ বসে আছে। মানুষ নয় যেন পাথর। ভাবলাম সত্যি ভূতে ফুতে ধরলো নাকি কারো!

মানিক ॥ ইয়ার্কি রাখ।

পরেশ ॥ ইয়ার্কি কাল সকালে বেরুবে।

মানিক ॥ তার মানে।

পরেশ ॥ ফেরার পথে ইষ্টিশানে গেছলাম। জমিদার বাবুর বাড়ীতে অন্ততঃ পঞ্চাশজন উর্দিপরা বোনাই এলো।

মানিক ॥ ছবিটা ঠিক মিলে যাচ্ছে।

পরেশ ॥ কিছু বল্লে?

মানিক ॥ কাল ভোরেই চলে আসিস। জিলালকে সংগে নিয়ে আসবি। শুধু মার যাতে খেতে না হয়—

পরেশ ॥ গভীর রাতে মাথার ব্যায়রাম চাগাড় দেওয়াটাই স্বাভাবিক। সুতরাং বৎস তুমি বিশ্রাম গ্রহণ কর। প্রাণসখা তব প্রত্যুষেই আসিবে নিশ্চিত। (সুন্দরীকে) ভূত এবং ভূতের ওঝা দু শালাই তো বিদেয় হয়েছে। কেন তবে বিষণ্ণ বদন। আজকের নেমন্তন্নের চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় হয় নি কি ঠিক মত সেবন. যাও, যাও, আরামসে ঘুম লাগাও। চল মাষ্টার। যা খেয়েছো অনেকদিন মনে থাকবে। কাল শালা মেলা কাজ। কি ব্যাপার তোমার মনে হচ্ছে গতর তোলার ইচ্ছে একেবারেই নেই।

মাষ্টার ॥ চললাম রে। ৭ কোশ পথ হাঁটতে হবে।

মানিক ॥ থেকে গেলে হতো না।

মাষ্টার ॥ সবারই তো মেলা কাজ। চলি। ভয় নেই। আমরা চিরদিনই হারবো না।

[মাষ্টার এবং পরেশ চলে যায়]

সুন্দরী ॥ আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

মানিক ॥ কেন রে।

সুন্দরী ॥ তুমি, মাষ্টার, কি যে সব বলছিলে!

মানিক ॥ পাগলি!

সুন্দরী ॥ আবার বুঝি কোন অঘটন ঘটবে।

মানিক ॥ তুই না বংশী মণ্ডলের মেয়ে। এত ভয় কিসের ?

সুন্দরী ॥ ভয় তো সেই জন্যই। তোমাদের কথাবার্তা চাল চলন সব একরকম। মনে হয় ভগবান একই ছাঁচে তোমাদের গড়েছিল। মাষ্টারের চোখ দুটো কি—যেন আগুন বেরোয়।

মানিক ॥ অনেক রাত হয়েছে। তুই শুয়ে পড।

সুন্দরী ॥ সত্যি কি কাল তোমাদের সভা বসবে।

মানিক ॥ হ্যাঁ। বাবুর ভেরী, নসীপুর, মোল্লারচক, কমলাপুর সবকটা গেরামে খবর দেওয়া হয়ে গেছে। কাল ভোরে বাকী গেরামগুলো ঘোরা হবে।

সুন্দরী ॥ কি হবে এ সব করে ?

মানিক ॥ দল বেঁধে কালী সা'র কাছে যাবো। শালা হাজার হাজার মন ধান বাইরে পাচার হবে, আর আমরা না খেয়ে থাকবো, তা হবে না।

সুন্দরী ॥ তারমানে, জোট বেঁধেছো।

মানিক ॥ হ্যাঁ। আমাদের চাল, আমাদের দিতেই হবে।

সুন্দরী ॥ আবার জমিদারের সঙ্গে বিবাদ।

মানিক ॥ জমিদার—শালা।

সুন্দরী ॥ আস্তে কথা কও।

মানিক ॥ কেন, আমি কি কারো কেনা গোলাম ? যে দিন থেকে কারখানায় কাজ করতে গেছি, সেদিন থেকে সব কিছু সাফ হয়ে গেছে। হ্যাঁ রে, অবাক হয়ে আমার পানে দেখছিস কি ?

সুন্দরী ॥ কত বদলে গেছ তুমি।

মানিক ॥ তাই নাকি ?

সুন্দরী ॥ যে দিন তুমি কারখানায় পেরথম চাকরী পেলে, সে দিন কি বলেছিলে মনে আছে ? বলেছিলে ছোটকর্তা মানুষ নয় গো, সাক্ষাৎ দেবতা।

মানিক ॥ হ্যাঁ, সেদিন তাই মনে হয়েছিল বটে।

সুন্দরী ॥ তা আজই বা দোষ পেলে কোথায়?

মানিক ॥ দোষ কি আর এমনি বেরোয়। ধীরে ধীরে পেরকাশ পায়। সাপ যখন ধান ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে দৌড়োয় তখন তো তাকে বেশ ঠাণ্ডাই মনে হয়, কিন্তু যখন ফণা তোলে তখনই তার আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে।

সুন্দরী ॥ অত ঘুরোনো কথা আমি বুঝতে পারি না বাবু।

মানিক ॥ কিন্তু ও শালাদের জাতটাই যে ঘুরোনো: ঘুরিয়ে না বললে বুঝবি কেমন করে? তা সাতমাস আগে আমি কারখানায় কাজে লেগেছিলাম, কেমন কিনা?

সুন্দরী ॥ হ্যাঁ, তা ৭।৮ মাস হবে।

মানিক ॥ এই সাতটা মাস ছোটকত্তার কথায় কলুর বলদের মত ঘানি ঘুরিয়েছি। কিন্তু তাতে আমার কি কচুপোড়াটা হয়েছিল। এক পয়সাও মাইনে বেড়েছিল কি?

সুন্দরী ॥ কথায় আছে সবুরে মেওয়া ফলে।

মানিক ॥ মেওয়া যাদের ফলবার তাদের ঠিকই ফলেছে। ইউনিয়নের নেতারা সব ফাঁস করে দিয়েছে। এ বছর কোম্পানীর কত লাভ হয়েছে জানিস্? আশি হাজার টাকা।

সুন্দরী ॥ আ—শি— হা—জার! সে তো মেলা টাকা।

মানিক ॥ মজুররা তাই একজোট হয়ে দাবী করেছে—মাইনে বাড়াতে হবে।

সুন্দরী ॥ যদি না বাড়ায়?

মানিক ॥ সেই জন্যই তো ধর্মঘট।

সুন্দরী ॥ এ কথা ছোটকত্তা জানে?

মানিক ॥ তিনি আমাকে পেয়াদা দিয়ে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

সুন্দরী ॥ কেন?

মানিক ॥ কাজে জয়েন দিতে হবে। আরে আমি কি শালা নেমকহারাম নাকি যে মালিকের পক্ষে কাজ করবো।

সুন্দরী ॥ কিন্তু ছোটকত্তা তো আর মালিক নয়।

মানিক ॥ না, মালিকের দালাল। আর তারজন্যই তো অত সুবিধে। ছাঁটায়ের লিষ্টি সে নিজে হাতে তৈরী করেছিল।

সুন্দরী ॥ কে? ছোটকত্তা!

মানিক ॥ ভেবেছিল কার্তিক সাঁতরার পুরো সংসারটাই তারা কিনে রেখেছে। কিন্তু মানিক সাঁতরা কারো কেনা বান্দা নয়। সে হাতের জোরে কাজ করে, কারো চোখ রাঙানীকে সে পরোয়া করে না।

সুন্দরী ॥ অত জোরে কথা বোলো না, আমার বুক ধরফর্ করে।

মানিক ॥ শালারা গুণ্ডা দিয়ে কারখানা চালু করবে ভেবেছিল। কিন্তু ঠ্যাঙানির ঠ্যালায় বাছাধনরা—

সুন্দরী ॥ তুমি মারামারি করেছো নাকি?

মানিক ॥ তাই ছাঁটাই করেও শান্তি হয় নি। পেছনে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুন্দরী ॥ তার মানে?

মানিক ॥ খুঁজে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। তাইতো এখানে গা ঢাকা দিয়ে আছি।

সুন্দরী ॥ পুলিশ তো এখানেও এসে পড়তে পারে?

মানিক ॥ তা পারে। তবে এখনো জানে না বোধ হয়।

সুন্দরী ॥ জানতে কতক্ষণ। শুনেছি পুলিশের গোঁ ভীমরুলের মত, খুঁজে ঠিক বের করবেই।

মানিক ॥ করুক গে। এখন আর তাতে ডরাই না।

সুন্দরী ॥ ভগবান না করুক, যদি কিছু হয়। আর তিন মাস বাদে যে—

মানিক ॥ তিন মাস বাদে যে কি?

সুন্দরী ॥ ধ্যাৎ আমার লজ্জা করে।

মানিক ॥ (অনুকরণ করে) ধ্যাৎ আমার লজ্জা করে !

সুন্দরী ॥ তুমি কিন্তু আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

মানিক ॥ কোথায় আবার যাবো ?

সুন্দরী ॥ সারা গেরামে হাহাকার, তার ওপর কারখানায় গণ্ডোগোল, কিছু ভাল লাগে না বাবু।

মানিক ॥ গণ্ডগোল হচ্ছে বলেই তো বুঝতে পারি বেঁচে আছি। পা চেটে চেটে তো কাবার হয়ে গিয়েছিলাম।

সুন্দরী ॥ রাজারহাটের দাইবুড়ি কি বলেছে জানো ?

মানিক ॥ কি বলেছে ?

সুন্দরী ॥ বলেছে—বলেছে, ও আমি বলতে পারবো না।

মানিক ॥ বলেছে তোর ছেলে হবে, তাই তো।

সুন্দরী ॥ তুমি জানলে কি করে ?

মানিক ॥ বারে, আমার ছেলে হবে আর আমি জানবো না ? রোজ রাত্তিরে স্বপ্ন দেখি।

সুন্দরী ॥ আমিও দেখি। আচ্ছা ছেলে বড হলে কি হবে ?

মানিক ॥ মজুর, পাকা মজুর। কেননা মজুর মানুষ চেনে সব চেয়ে তাডাতাডি। মেশিনের সামনে দাঁড়ালেই নজরটা তার সাফ হয়ে যায়। হ্যাঁ রে হাঁ করে মুখে পানে তাকিয়ে দেখছিস কি ?

[মানিক সুন্দরীকে বুকের মধ্যে টেনে নিতে চায়]

সুন্দরী ॥ ছিঃ। (সুন্দরী চলে যেতে চায়) লাজ লজ্জায় মাথা খেয়েছো নাকি ?

মানিক ॥ চল্লি কোথায় ?

সুন্দরী ॥ ইজ্জত বাঁচাতে। [বাঁদিকের ঘরে ঢোকে]

মানিক ॥ [হঠাৎ গান ধরে]

ও আমার ভাঙা ঘরে আসবে ছেলে
সবার চোখের মণি।

তাই সরমে গরবে মরে বধু গরবিনী

ও আমার গরবিনী ॥

সুন্দরী ॥ (কপট রাগে অমন বেহায়ার মত গান গাইতে তোমার লজ্জা করে না।

[মানিক প্রাণ খোলা হাসিতে ফেটে পড়ে। সুন্দরী দ্রুত ঘরে ঢুকে যায়। ধীরে ধীরে আলো নিভে যায়।

রাত পেরিয়ে ভোর হয়। রদ্দুর এসে পড়ে উঠোনে। দেখা যায় মানিক দাওয়ায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সুন্দরী ঘুম থেকে উঠেছে, হাতমুখ ধুয়েছে। এখন সে তুলসী মঞ্চের কাছে]

সুন্দরী ॥ (অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশ্যে , কাল অনেক বিপদ গিয়েছে। তুমি তো সবই ভালর জন্যেই কর কিন্তু হে ভগবান আর যেন কোনো গণ্ডোগোল না হয়। ভালয় ভালয় সভাটা যেন শেষ হয়ে যায়। আমি মানত করছি, মচ্ছব দেবো।

[হাঁটু ভেঙে তুলসী মঞ্চকে প্রণাম করে। মঞ্চের মাটি মুখে-মাথায় ঠেকায়। তারপর ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে যায়। দূরে পরেশের গান ভেসে আসে]

পরেশ ॥ [গান]

এ লড়াই জিততে হবে কঠিন বুকে শপথ নিলাম

এ লড়াই জিতব বলে কত না প্রাণ বিলিয়ে দিলাম।

এ লড়াই দীন মজুরের

এ লড়াই ক্ষেতের চাষীর

এ লড়াই শতাব্দীকাল বঞ্চিত সব বিশ্ববাসীর।

এ লড়াই আঁধার চিরে আলোর তোরণ পরশ করার

এ লড়াই তোমার আমার

এ লড়াই সর্বহারার।

[সুন্দরী গান শুনে দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়। মানিক ঘুম থেকে উঠে বসে]

কি দেখছো। ঢেউ বৌঠান, সাগরের ঢেউ। সুয্যি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সারা গেরামখান যেন ধানের শীষের মত দুলে উঠেছে। বুকের—রক্ত নেচে উঠছে তালে তালে।

মানিক ॥ জিলাল এলো না ?

পরেশ ॥ ও মালঞ্চ আর মোল্লারচক হয়ে আসবে। কি বৌঠান, তুমি আজ সভায় যাবে তো ?

সুন্দরী ॥ না।

পরেশ ॥ সত্যি বলছো নাকি ?

সুন্দরী ॥ তোমরা বুঝছো না, কোন দিকে তোমরা এগিয়ে যাচ্ছ।

পরেশ ॥ এ কথার অর্থ ?

সুন্দরী ॥ ওরা যে কি ভয়ানক ! চোখের জলে জমি কাদা হয়ে যাবে।

পরেশ ॥ না বৌঠান যাবে না। গায়েনরা চিরকালই কি একপালা গায় !

[গান] এবার বাধা দিলে বাধবে লড়াই, হও হুঁসিয়ার।
সাবধান অত্যাচারী আমরা তৈয়ার ॥
বুকের রক্তে নিশান করেছি লাল
বজ্রমুঠিতে তুললাম হাতিয়ার
এবার বাধা দিলে বাধবে লড়াই
হও হুঁসিয়ার ॥

বৌঠান, তুমিই বল; খুনীকে সায়েস্তা করবে কারা ? সে কি কারো একার কাজ। খুনীরা যে সব একজোট হয়েছে।

[এমন সময় চোঙা ফুঁকতে ফুঁকতে জিলাল ঢোকে]

জিলাল ॥ সুতরাং আমাদেরও একজোট হতে হবে। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ালে চলবে না।

মানিক ॥ মোড়লদের খবর দিয়েছিস্ ?

জিলাল ॥ হ্যাঁ, দিয়েছি।

পরেশ ॥ চোঙাটা নামা।

মানিক ॥ আসবে তো।

জিলাল ॥ (চোঙা মুখে দিয়ে) নির্ঘাৎ আসবে।

পরেশ ॥ চোঙাটা নামা।

জিলাল ॥ ক্ষেপেছ নাকি ? চোঙা নামাবো মানে। এ চোঙার নাম রেখেছি রাঙাজবা। ইনি আমার ঠাকুরদাদা। পেন্নাম কর।

পরেশ ॥ সব সময় ফিজলেমি ভাল লাগে না।

জিলাল ॥ ঠাকুরদাদাকে নিয়ে ফিজলেমি করে কোন শালা। শোন তাহলে এর মাহাত্ম্যটা বলি। আজ সারা তল্লাটে ১৪৪ ধারা জারী হয়েছে।

মানিক ॥ কখন হলো ?

জিলাল ॥ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে।

মানিক ॥ হুম্!

জিলাল ॥ কিন্তু সেটা আবার নাকচও হয়েছে।

মাণিক ॥ নাকচ করলো কে ?

জিলাল ॥ দাদা।

পরেশ ॥ কার দাদা ?

জিলাল ॥ ঠাকুরদাদা। চোঙা।

পরেশ ॥ জ্বালাতন !

জিলাল ॥ তাহলে সবিস্তারেই বলি। ঘুম চোখে সবে মোল্লারচকে ঢুকেছি, দেখি পুকুরের চালায় পাঁচু চৌকিদার ঢেঁডা পেটাচ্ছে, "আজ এই তল্লাটে ১৪৪ ধারা জারী করা হলো। সন্ধ্যের পর এই গেরামে এক সাথে চার জনের বেশী লোক দেখলে ফাটকে পোরা হবে।" [চোঙায় মুখ লাগিয়ে] কি, কথা বলছো না কেন ?

পরেশ ॥ চোঙা নামা।

জিলাল ॥ আর আমিও তখন চোঙাটা মুখে লাগিয়ে চেঁচাতে শুরু করলাম, "বন্ধুগণ, তোমাদের কোন ভয় নেই, আমি কৃষক সমিতির তরফ থেকে বলছি আজ এই গ্রামে ১৪৪ ধারা জারী করা হলো।"

পরেশ ॥ তার মানে?

জিলাল ॥ আজ সন্ধ্যের পর এই গেরামের চৌহদ্দীর মধ্যে কোন পুলিশের লোক বা সেরেস্তার দালাল দেখতে পেলে—

[হঠাৎ দেখা যায় কার্তিক সাঁতরা ঢুকছে। হঠাৎ কি করবে না বুঝতে পেরে অদ্ভুত স্বরে গান ধরে]

"ভয় করে তুই তুই চিনলি না তোর প্রাণের শ্যামরায়
ঝাঁপ দিলি তুই মরণ যমুনায়।"

গান, গান হচ্ছে! মানিকদা, ভূত ভাল আছে—মানে বৌ ভাল আছে!

কার্তিক। (মানকের কাছে এগিয়ে যায়) মোল্লারচকের মোছলমানরা ক্ষেপে উঠেছে, এ গেরামেও সোরগোল, কথাটা কি সত্যি নাকি?

মানিক ॥ কোন কথা?

কার্তিক ॥ গেরামের মানুষ আজ চাল আটকাবে।

মানিক ॥ সবে তো কলির সন্ধ্যে।

কার্তিক ॥ ফন্দীটা কার?

মানিক ॥ জানি না।

কার্তিক ॥ না, তুই জানিস্।

মানিক ॥ বললাম তো জানিনা।

কার্তিক ॥ তাহলে যা শুনে এলাম, সব সত্যি। আচ্ছা, তোর জন্যে কি আমার মান সম্ভ্রম সব খোয়াতে হবে?

মানিক ॥ এ কথার অর্থ?

কার্তিক ॥ রাজারহাটের বাবুদের বাড়ীতে সাত পুরুষের চাকরী। সাত

পুরুষের লেঠেল এই সাঁতরারা। কার্ত্তিক সাঁতরাকে চেনে না এমন লোক এ তল্লাটে নেই।

মানিক ॥ তাতে হয়েছেটা কি?

কার্ত্তিক ॥ তার ছেলে কিনা যাবে আজ বাবুদের আড়ৎ লুঠ করতে।

মানিক ॥ লুঠ না, পাওনা আদায় করতে। আর আমি না, যাবে সারা গেরামের লোক।

কার্ত্তিক ॥ একই হোল। কারখানায় চাকরী গেছে, এখানে এসেছিস্ লোক খ্যাপাতে।

মানিক ॥ চাকরী যায়নি, ফিকির করে ছাঁটাই করা হয়েছে।

কার্ত্তিক ॥ বড গলা করে সে কথা আর বলতে হবে না, সব শুনেছি আমি।

মানিক ॥ কি শুনেছ?

কার্ত্তিক ॥ তেজ দেখালে চাকরী থাকে না।

মানিক ॥ হ্যাঁ, পা চাটতে হয়।

কার্ত্তিক ॥ থাম হারামজাদা। যত বড মুখ নয়, তত বড় কথা। একটু একটু করে তিরিশ বিঘের জোত হয়েছে। কার দয়ায় এ জমি, কার দয়ায় এ মোটা চালের ভাত?

মানিক ॥ (ব্যঙ্গ করে) কেন, বাজারহাটের সাহা বাবুদের।

কার্ত্তিক ॥ হ্যাঁ, তারা দেবতার সমান।

মানিক ॥ না কত্তাদের নয়।

কার্ত্তিক ॥ তার মানে?

মানিক ॥ তারা তোমাকে দিয়েছে এক আনা আর গেরাম থেকে শুষে নিয়েছে পনের আনা।

কার্ত্তিক ॥ কে বলেছে এ কথা?

পরেশ ॥ বলবে আবার কে। চোখ খুললেই দেখা যায় জ্যাঠা। তোমার ঐ চকের তিন বিঘে জমি আগে কার ছিল?

কার্তিক ॥ কোন চকের?

পরেশ ॥ চকপেল্লাদপুরের।

কার্তিক ॥ রহিমুদ্দির বাপ মৈজুদ্দিন খাঁর।

পরেশ ॥ নসীপুরের পুবে?

কার্তিক ॥ ও পাঁচ বিঘে পাঁচু মান্নার।

পরেশ ॥ আর রাজারহাটের খোয়াড়ের এক বিঘে?

কার্তিক ॥ পঞ্চানন মণ্ডলের।

পরেশ ॥ এ জমি বেহাত হল কেন?

কার্তিক ॥ কত্তারা সব ক্রোক করে নিল যে।

পরেশ ॥ কেন?

কার্তিক ॥ দেনার দায়ে।

পরেশ ॥ কিসের দেনা?

কার্তিক ॥ বা, চাষের আগে দাদন নিত যে।

পরেশ ॥ তার মানে সারা বছরের ফসল বেচেও দাদনের টাকা শুধতে পারে নি। জমি দিয়ে শোধ দিতে হয়েছে।

কার্তিক ॥ তার আমি কি জানি?

পরেশ ॥ সেটাই জানতে হবে। দাদন না দেবার ভয় দেখিয়ে কম দামে ফসল কেনা হয়েছে।

মানিক ॥ তাই আগে যাদের জমি ছিল, এখন তাদের অনেকেরই জমি নেই। তারা এখন ক্ষেত মজুর।

কার্তিক ॥ থাম, বক্তিমে শুনতে চাই না। কত্তারা দানছত্তর খুলে বসে নি।

মানিক ॥ আর চাষীরাও না খেয়ে মরবার কবুল করে জন্মায় নি।

কার্তিক ॥ এ কাজে কিছুতেই তোকে যেতে দেব না।

মানিক ॥ আমি না গেলেও ওরা যাবেই।

কার্তিক ॥ এটা কিন্তু আগুন নিয়ে খেলা হচ্ছে।

মানিক ॥ গেরামের মানুষের পেটে আগুন লেগেছে। ধমকে তারে নেভানো যাবে না।

কার্তিক ॥ কিন্তু কত্তারা বাণিজ্যি করছে—ব্যবসা।

মানিক ॥ হ্যাঁ, মানুষ মারার কল ফেঁদেছে শালা রক্তচোষার জাত।

কার্তিক ॥ মুখ সামলে কথা বল মানকে। নইলে এক চড়ে তোর দাঁত দুপাটি খুলে দেব।

মানিক ॥ তুমি ভয় দেখাচ্ছ কাকে?

পরেশ ॥ মানিক!

কার্তিক ॥ আবার বেয়াদপের মত কথা! তিনারা আমাদের মনিব!

মানিক ॥ সেই জন্যেই তো গাঁয়ের লোক তার কাছে যাচ্ছে।

কার্তিক ॥ মাথা গরম করে দিসনি মানকে। আজ ৩০ বছর বাবুদের নুন খাচ্ছি। এ কাজ আমি কিছুতেই করতে দেব না।

মানিক ॥ ক্ষমতা থাকে তো ঠেকিও।

কার্তিক ॥ হ্যাঁ, ঠ্যাকাবো।

[সুন্দরী বেরিয়ে আসে]

সুন্দরী ॥ তুমি আবার ঝগড়া শুরু করেছো।

কার্তিক ॥ এখনো এই হাতের লাঠি নিমেষে দশটা মাথা নিতে পারে।

মানিক ॥ তা তো পারেই। আর সেইজন্যই পুষছে।

কার্তিক ॥ হারামজাদা পাঁঠা। বাড়ীর খেয়ে খেয়ে তেল বেড়ে গেছে?

মানিক ॥ দালালী ছাড়া সাঁতরারা করেছেটা কি? পারে লোকের মুখে অন্ন তুলে দিতে? পারে এই দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে?

কার্তিক ॥ ফের যদি শুরু করিস, এই লাঠির ঘায়েই তোর মাথা—

নির্মল ॥ জ্যাঠা!

সুন্দরী ॥ বাবা !

মানিক ॥ ফাটাও দেখি মাথা, দেখি তোমার ক্ষ্যামতা !

পরেশ ॥ মানিক !

কার্তিক ॥ তবে রে—

মানিক ॥ হেই সামালো—

[পরেশ এবং জিলাল দুজনকে নিরস্ত করে]

কার্তিক ॥ তেল বেড়েছে। আড়ৎ থেকে ফিরে তোর পাপ মুখ যেন আর না দেখি ! [কার্তিক হন হন করে বেরিয়ে যায়]

পরেশ ॥ ফট করে মাথা গরম করাটা তোর একটা স্বভাব ।

মানিক ॥ নায়েবের মুখটা যে শালা বার বার মনে পরে যায় ।

[এমন সময় বাইরে কয়েকজনের গলা শোনা যায়.]

নেপথ্যে ॥ মানিক বাড়ী আছ নাকি, মানিক ?

[খুড়ো, পাচু মান্না, পরাণ, কেষ্ট এবং কয়েকজন চাষী ঢোকে]

মানিক ॥ আসেন জ্যাঠা, আসেন ! খুড়ো এই টুলটায় বসেন ।

খুড়ো ॥ [বসতে বসতে] জয় মা কালী. আমরা সবাই এসে পরেছি তাহলে ।

পাঁচু ॥ আলোচনাটা তাহলে শুরু করা যাক ।

কেষ্ট ॥ আলোচনার কি, সস্তায় চাল দেবার কথা কবুল না করলে আড়তের দরজা আমরা কিছুতেই খুলতে দেব না ।

পাঁচু ॥ তুই থাম্, মানিককে বলতে দে ।

জিলাল ॥ মানিকদা নিশ্চয়ই বলবে, কিন্তু আমাদের কথা আমরা পেরথমেই জানিয়ে দিলাম ।

মানিক ॥ আজ আমাদের এক জরুরী সভা। নসীপুর, বাবুরভেরী, পেল্লাদপুর বাজারহাট, মালঞ্চ, মোল্লারচক—যেদিকেই তাকান শুধু হাহাকার ।

পরেশ ॥ হাটে-বাজারে চাল নেই—কারো বাড়ীতেও চাল নেই একদানা ।

শ'য়ে শ'য়ে চাষী শাকপাতা খাচ্ছে—না খেতে পেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরছে, বিষ খেয়ে মরছে।

জিলাল ॥ গদাই, পুঁটিরাম, তালেপ, রেজাক, এদের সাথে এক সাথে খেলেছি, মাঠে গেছি, মাছ ধরেছি—কিন্তু এদের কি হাল হয়েছে আজ।

কেষ্ট ॥ তালেপের বুকের মাংস শকুনে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। তাই এর একটা বিহিতের কথা আজ আমাদের ভাবতেই হবে।

[সকলেই উত্তেজিত ভাবে সায় দেয়]

খুড়ো ॥ তা তো অবশ্যই হবে, কিন্তু ভেবে কি কিছু কুল-কিনারা হবে।

পরেশ ॥ ঠিক মত ভাবলেই হবে।

খুড়ো ॥ তার মানে?

পরেশ ॥ কথা হচ্ছে, গেরামের লোক খেতে পাচ্ছে না। কিন্তু কেন? গেরামে কি সত্যি সত্যি চাল নেই?

মানিক ॥ হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে কথা। গেরামে চাল আছে। অথচ লোক খেতে পাচ্ছে না। রাজারহাটের সাহাদের গুদামে হাজার হাজার মন চাল মজুত। রোজ রাতে লরি করে চাল পাচার হচ্ছে, অথচ গেরামের লোক—

জিলাল ॥ তাই দল বেঁধে আমাদের সাহাদের কাছে যেতে হবে।

খুড়ো ॥ জয় মা কালী—এ যে ঘোরালো ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে।

কেষ্ট ॥ ঘোরালোটা কি? সাফ কথা, জান দিয়ে আমরা চাল চালান রুখবো।

জিলাল ॥ মার খেয়ে এবার আর ফিরে আসছি না।

পাঁচু ॥ থাম দিকিন!

জিলাল ॥ [উচ্ছ্বসিত হয়ে] আপনাদের সকলকে দেখে বুকে আমার বল ফিরে আসছে। এ যাত্রায় সাহারা কিছুতেই আমাদের ঠেকাতে পারবে না। জীবনে আমি—

খুড়ো ॥ আরে ব্যাটা জীবনটা তোর কমদিনের, শুনি—রাজারহাটের সাহাদের চেনা ও তোর কম নয়।

পরাণ ॥ ঠিক বলেছো খুড়ো।

জনৈক চাষী ॥ শালারা বদবুদ্ধির ঝাড়।

পরাণ ॥ আজ না হয় ওদের জমিদারী লাটে উঠেছে--কিন্তু দশবছর আগেও ওদের দাপটে বুকে কাঁপুনি লাগতো।

কেষ্ট ॥ দশ বছর পরের কথা কও।

পাঁচু ॥ বর্ষার জল নামলে নসীপুরের বিলে কত লাশ ভাসতে দেখেছি।

সকলে ॥ লাশ!

পাঁচু ॥ হ্যাঁ, লাশ, বেওয়ারিশ লাশ।

খুড়ো ॥ দাঙ্গা, গুমখুন, জবর-দখল, এই নিয়েই তো কত্তাদের জমিদারী।

পরাণ ॥ তাই তো ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে।

জিলাল ॥ কিন্তু ভয় পেলে চলবে না।

সকলে ॥ নিশ্চয়ই না।

খুড়ো ॥ আমাদের কিন্তু দেরী হয়ে যাচ্ছে মানিক, কি করতে চাও সেটা বল।

মানিক ॥ আমি একা কিছুই করতে চাইছি না খুড়ো। আপনারা সব গেরামের মোড়লরা এসেছেন। গেরামের লোকও কাতারে কাতারে জড়ো হচ্ছে নসীপুরের মাঠে। এখানে আলোচনা শেষ করে ওদের কাছে খুব সোজা করে বলবো—রাস্তা আমাদের কাছে দুটো—হয় না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরা, আর না হয় গায়ের জোরে চাল আদায় করা।

খুড়ো ॥ জয় মা কালী, তোমার কথা শুনে আমার বুক কাঁপছে মানিক!

মানিক ॥ বুক কাঁপলে চলবে না খুড়ো। বুক টান করে দাঁড়াতে হবে।

পরাণ ॥ কিন্তু দাবী যদি ওরা না মানে?

মানিক ॥ কথা হচ্ছে এই। দাবী ওরা পেরথমে কিছুতেই মেনে নেবে না।

সকলে ॥ তা হলে?

পাঁচু ॥ বলি এত কথার প্রয়োজনটা কি, এখন তো চল, যখন মানবে না তখন দেখা যাবে।

মানিক ॥ না, তা হয় না। শেষ ভেবেই আমাদের কাজে নামতে হবে।

খুড়ো ॥ দাবী না মানলে আমরা রাস্তা জুড়ে বসে থাকবো, গঞ্জেতেও চালান বন্ধ করে দেব।

মানিক ॥ তারপর!

পাঁচু ॥ তারপর আবার কি? চালান বন্ধ হয়ে গেলে দাবী না মেনে যাবে কোথায়?

মানিক ॥ না, তা হবে না। লেঠেলগুলোকে ওরা এমনি এমনি রাখে নি।

কেষ্ট ॥ আমারও মনে হয় নিঘ্যাৎ লাঠি চালাবে।

পরাণ ॥ শুধু কি তাই, পুলিশ ডাকে, ফাটকে পুরবে, ঘেরাও ভাঙবার চেষ্টা করবে।

জিলাল ॥ করুক চেষ্টা, আমাদেরও হাতের লাঠি একসাথে গর্জে উঠবে।

খুড়ো ॥ রক্ত যে খুব গরম হয়ে উঠেছে রে। মারের ঠেলায় মরে যাবি যে!

জিলাল ॥ মরে যাই যাবো—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। না খেতে পেয়ে তিলে তিলে মরার চেয়ে লাঠির এক ঘায়ে মরা ঢের ভালো।

পরেশ ॥ আমরা মাটি থেকে সোনা ফলিয়েছি, সেই সোনা গিয়ে জমা হয়েছে কালী সা'র ঘরে—সে সোনা আমাদের ফিরিয়ে দিতেই হবে।

জিলাল ॥ লাঠি একখান আমার হাতে দাও। আমি সবার আগে যাবো।

পাঁচু ॥ ব্যাটার কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে যায়।

পরাণ ॥ দাঙ্গা বাধানোটা বোধহয় উচিত হবে না।

খুড়ো ॥ কেউ এতে রাজীও হবে না।

মানিক ॥ পাঁচু মামা, মণ্ডল, খাঁ সাহেব আপনাদেরও কি তাই মত?

খুড়ো ॥ না, মানে আমি বলছিলাম কি—

জিলাল ॥ আপনারা আর বলবেনটা কি? আপনারা যে মোড়ল, পেটে আমাদের মত খিদে নেই, তাই—

খুড়ো ॥ তুই থাম হারামজাদা।

জিলাল ॥ কেন থামবো—আমিও তো—

মানিক ॥ জিলাল !

[জিলাল রেগে অন্য জায়গায় গিয়ে বসে]

বলুন কি ঠিক করলেন ?

পাঁচু ॥ আমরা নসীপুরের মাঠ বরাবর আড়তের রাস্তা জুড়ে গিয়ে দাঁড়াবো। চাল বোঝাই লরী গঞ্জে যেতে দেবো না।

মানিক ॥ তারপর।

পাঁচু ॥ তারপর কত্তাবাবুর সঙ্গে কথা বলবো। বলবো আপনি মনিব, রক্ষা কত্তা। দয়া আপনাকে করতেই হবে।

মানিক ॥ দয়া যদি না করে !

পরেশ ॥ [চোখ বুঁজে নির্বিকার ভাবে] তখন কেত্তন গাইতে হবে—

মেরেছো কলসীর কানা

তাই বলে কি প্রেম দেব না ?

মানিক ॥ আঃ পরেশ ! ভাল না লাগে তো চুপ করে থাক। বলুন তারপর কি করবেন ?

খুড়ো ॥ তখন মা কালী সহায়।

পরেশ ॥ মা কালী তখন কাঁচকলা দেখাবে।

মানিক ॥ ঠিক আছে আপনাদের কথা মতই কাজ হবে। নসীপুরের সভা শেষ করে আমরা সকলে মিলে—

[কথা শেষ হয় না। ছুটতে ছুটতে রেজাক ঢোকে। রেজাকের চিৎকারে সুন্দরীও দাওয়ায় এসে দাঁড়ায়]

রেজাক ॥ মানিকদা, মানিকদা,—

মানিক ॥ কি ব্যাপার ? হাপাচ্ছিস কেন ?

রেজাক ॥ জমিদারের লেঠেল আর পুলিশ নসীপুরের সভায় ম্যারাপ ভেঙে

তছনছ করে দিচ্ছে। খানিক বাদেই নাকি তারা গাঁয়ের মধ্যেও ঢুকবে।

মানিক ॥ কেন ?

রেজাক ॥ চাল লুটের আসামীদের ধরতে। তুমি শিগগিরই পালাও। কার্তিক চাচা বলে পাঠালো।

মানিক ॥ কে পাঠালো ?

রেজাক ॥ কার্তিক চাচা, তোমার বাপজান। পুলিশগুলো গাঁয়ের চাষীদের মোষ পেটানোর মত পেটাচ্ছে। চারিদিকে একটা হুল্লোড। আমিও ছুটছি, হঠাৎ খপ্ করে তোমার বাপজান আমার হাতখান ধরে ফেললো। বললো কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। কিষাণ সমিতির সব কটা মাথাকে ফাটকে পুরবে। তারজন্যে দরকার হলে গেরামের প্রত্যেক ঘর তন্ন তন্ন করে চষবে। আর বললো—

মানিক ॥ কি বললো ?

রেজাক ॥ বললো, তার ঠ্যাকানোর খ্যামতা নাই। ফন্দী হচ্ছে গোপনে। ছোটকত্তা, দারোগাবাবু আর কোলকাতার দুই তিনজন লোক।

খুড়ো ॥ জয় মা কালী। আমি একবার ঘুরে আসি মানিক, তোমার খুড়ী বাড়ীতে একা আছে, চারিদিকে যা গণ্ডোগোল। [খুড়ো চলে যায়]

মানিক ॥ পাঁচু মামা, খাঁ সাহেব—এখনো কি হাত গুটিয়ে বসে থেকে শুধু মার খাবেন ? একটা কিছু বলুন, একটা কিছু করুন।

পাঁচু ॥ চিরটা কাল এমনি করেই শালারা আমাদের সব কিছু পণ্ড করে দিয়েছে।

মানিক ॥ তাই পাল্টা একটা কিছু করা আমাদের দরকার।

পরেশ ॥ মার তো খেতেই হবে, জেলে তো যেতেই হবে। কিন্তু—

পাঁচু ॥ সবই তো বুঝলাম। কিন্তু সে জোর কোথায় ? সে জোট কোথায় ?

মানিক ॥ জোট তো আকাশ থেকে পড়বে না। বুদ্ধি নিতে হবে, কাজের মধ্যে দিয়ে সে জোট বাঁধতে হবে।

জিলাল ॥ বানাও জোট। এ অত্যাচার আর সহ্য হয় না।

কেষ্ট ॥ ঠিক বলেছ, আর বসে থাকার সময় নেই।

মানিক ॥ বলুন, হামলা রুখতে আপনারা রাজী?

সকলে ॥ রাজী। [খানিকক্ষণ সবাই চুপ]

মানিক ॥ একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। গেরামে পুলিশ ঢুকবে—তার মানে এখানেও আসবে নিশ্চয়! সুন্দরী তোকে একটা কাজ করতে হবে।

সুন্দরী ॥ আমাকে।

মানিক ॥ হ্যাঁ, তোকে। সবাই ইদিক এসো।

[গোপনে আলোচনা চলে ৪।৫ সেকেণ্ড]

সুন্দরী ॥ না, না, সে আমি পারবো না

মানিক ॥ পারতেই হবে। তোর বাবার মুখটা শুধু মনে করে দেখ। শোধ নিতে হবে না? জিলাল, তুই একবার গেরামের ভেতরটা ঘুরে আয়। আমি যাচ্ছি নসীপুরের মাঠে। যত তাড়াতাড়ি পারি খবর দিয়ে নিয়ে আসবো এইখানে। [পাঁচু মান্নার কাছে] আমরা না আসা পর্যন্ত, তোমার কথা মতই সব কাজ হবে এখানে। রেজ্জাক, কেষ্ট, যা তোরা তৈরী হয়ে আয়। খুব শিগগির।

[মানিক, জিলাল, কেষ্ট, রেজ্জাক এবং চাষীরা বেরিয়ে যায়। মঞ্চে থাকে সুন্দরী, পাঁচু, পরেশ, এবং পরাণ]

পরেশ ॥ পরাণদা, ঘাবড়ে যাচ্ছ নাকি?

পরাণ ॥ না। অনেক ভেবে চিন্তে সে পালা চুকিয়ে ফেললাম।

পরেশ ॥ হঠাৎ?

পরাণ ॥ হঠাৎ-ই তো দিব্যজ্ঞান হয়। নসীপুরের মেরাপ ভাঙার কথাটা

এখনো মাথায় মধ্যে ঘুরছে। মানুষগুলোকে নাকি মোষ পেটা করছিল। কিন্তু ভেবে দেখ যদি ওরা না ঘাবড়াতো—যদি—

[নেপথ্যে নায়েবের কণ্ঠস্বর শোনা যায়]

নায়েব ॥ এই—এই—এই বাড়ী।

[নায়েব এবং জনৈক পুলিশ অফিসার ঢোকে]

কি ব্যাপার, সব উধাউ দেখছি। নো পাত্তা। আরে মানকের বৌ না ?

সুন্দরী ॥ [মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়ে] আজ্ঞে।

[গড় হয়ে প্রণাম করে।]

নায়েব ॥ তোকে না কাল ভূতে ধরেছিল ?

সুন্দরী ॥ আজ্ঞে।

নায়েব ॥ ভূত ছেড়েছে ?

সুন্দরী ॥ আজ্ঞে।

নায়েব ॥ মানিক কোথায় ?

সুন্দরী ॥ জানি না।

নায়েব ॥ জানিস্ না মানে ? গেরামে গেরামে ডাকাতের দল বানাচ্ছে, সভা করছে। কিন্তু বাছাধন ঘুঘু দেখেছে তার ফাঁদ দেখেনি। এইবার মজা বুঝবে।

অফিসার ॥ [পরেশকে] তোমরা এখানে কেন ?

পরেশ ॥ [ঠিক অফিসারের অনুকরণে] তোমরা এখানে কেন ?

অফিসার ॥ এটা রসিকতার জায়গা নয়।

পরেশ ॥ এটা রসিকতার জায়গা নয়।

অফিসার ॥ চুপ কর হারামজাদা।

পরেশ ॥ চুপ কর হারামজাদা।

[অফিসার পরেশকে সপাটে থাপ্পড় মারে]

অফিসার ॥ [পাঁচুকে] আপনারা এ বাড়িতে কি করছিলেন ?

পাঁচু॥ আরে বসুন, বসুন, অত উত্তেজিত হচ্ছেন কেন। বসুন নায়েব মশাই। পরাণ, কত্তাদের জন্যে তামাক সাজ।

অফিসার॥ মশকরা করবার সময় আমার নেই।

পাঁচু॥ তা জানি। আপনি উটকো লোক। গেরামে নতুন এসেছেন। তাও এসেছেন কার্তিক সাঁতরার বাড়ী। পান তামাক না খাইয়ে কি ছাড়বো মনে করেছেন। ওসব চ্যাংড়া ছোঁড়াদের কথায় কান দেবেন না। যা বাবা পরাণ চট করে যা।

অফিসার॥ না ও যাবে না।

পাঁচু॥ ঠিক আছে তুই যাস্ না। সাহেব ভরকে যাচ্ছে।

অফিসার॥ এখানে কি করছিলেন তার জবাব দিন।

পাঁচু॥ গল্প শুনছিলাম।

অফিসার॥ কিসের গল্প?

পাঁচু॥ ভূতের। শাকচুন্নির গল্প। ব্রেক্ষদত্তির গল্প।

অফিসার॥ সিধে আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি।

পাঁচু॥ জানি আপনার পেত্তয় হবে না। না হওয়ারই কথা। কিন্তু নায়েব মশাই তো মিছে বলবার লোক নয়। কাল রাত্তিরে যে মানকের বৌ-কে ভূতে ধরেছিল, সে তো নায়েব মশাই-এর স্বচক্ষে দেখা।

অফিসার॥ ওসব খট্টাংগ পুরাণ শোনার জন্য আমি এখানে আসিনি।

পাঁচু॥ তবে, পদধুলি দেবার কারণ?

অফিসার॥ ডাকাতির আসামী খুঁজছি।

পাঁচু॥ কিন্তু এটা তো কার্তিক সাঁতরার বাড়ী। আপনি বরং রাজার হাটের সেরেস্তায় খোঁজ করুন, শুনেছি কারখানার কিছু গুণ্ডা ওখানে আস্তানা গেড়েছে।

অফিসার॥ চুপ কর ইডিয়েট!

নায়েব॥ ভাল কথায় কাজ হবে বলে মনে হয় না।

অফিসার ।। দাঁড়ান, অন্য রাস্তা দেখছি। [সুন্দরীর কাছে যায়] চাল লুঠ করবার জন্য চাষীরা সব জোট বেঁধেছে। ভুল করে বহু ভাল মানুষও এর মধ্যে জড়িয়ে পরছে। কিন্তু ভগবান যেমন অন্যায় বরদাস্ত করেন না—সরকারও না। এর ফল খুব ভয়ানক। তাই সময় থাকতেই সাবধান হওয়া উচিৎ।

সুন্দরী ।। তা তো বটেই।

অফিসার ।। বিশেষ করে গেরস্ত মানুষের। ছেনতাই-বাটপারী ভিখিরী, দিন মজুরের কাজ। কিন্তু যাদের দুবেলা-দুমুঠো জুটছে তারা কেন হুজ্জতি করতে যাবে ?

সুন্দরী ।। সে কথা তো ঠিকই।

অফিসার ।। কিন্তু তবু যদি যায়, আইন সবার জন্যেই সমান। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বেই। এর কোন নড়চড় নেই। আমরা খবর পেয়েছি এ গেরামের কিছু ভাল লোক ঐ লুটেরাদের খপ্পরে গিয়ে পরেছে। কথাটা কি ঠিক ?

সুন্দরী ।। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অফিসার ।। এক মিনিট।

সুন্দরী ।। আজ্ঞে।

অফিসার ।। দাঁড়াও। নোট বইটা বের করি। একটু ধরে বলো। বাদ পরে গেলে, আবার উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে গিয়ে চাপবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মানিকও কি তাদের দলে গিয়ে ভিড়েছে।

সুন্দরী ।। আজ্ঞে হ্যাঁ।

অফিসার ।। তুমি মানা করতে পার না ?

সুন্দরী ।। মানা করতে গেলে মিনসে তেড়ে আসে। শুধু কি তাই, বলে তোকেও ঐ দলে নাম লেখাতে হবে।

অফিসার ।। আজ এখানে মিটিং হয়েছে ?

সুন্দরী ॥ হ্যাঁ।

অফিসার ॥ আর কে কে আছে দলে ?

সুন্দরী ॥ নাম জানি না।

অফিসার ॥ এদের কেউ ?

পরাণ ॥ আমরা সবাই আছি সেই দলে।

পরেশ ॥ সারা গেরামের লোক। কি খুশি তো ?

নায়েব ॥ [অফিসারকে] ব্রজ, ভাবগতিক খুব খারাপ। মানিককে এখন পাওয়া যাবে না। কাজ সেরে তাড়াতাড়ি চল।

অফিসার ॥ [পরেশের কাছে গিয়ে] ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট !

পরেশ ॥ বাংলায় বল।

অফিসার ॥ তোমাকে এ্যারেষ্ট করা হলো !

পরেশ ॥ কারণ ?

অফিসার ॥ ডাকাতির আসামী !

পরেশ ॥ হুলিয়া দেখি।

অফিসার ॥ সেটা থানায় গিয়ে দেখাব।

পরেশ ॥ সেটা থানায় গিয়ে তোমার বাবাদের দেখিও। আমি যাবো না।

অফিসার ॥ জোট, জোট বাঁধা হয়েছে।

পরেশ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

অফিসার ॥ হাতে ওটা কি ? [পরেশের ডান হাতে কৃষাণ সমিতির ব্যাজ দেখিয়ে]

নায়েব ॥ পতাকা, কিষাণ সমিতির লাল পতাকা। সও সাজা হয়েছে।

পরেশ ॥ খবরদার ছুঁয়ো না। ইজ্জত চলে যাবে।

অফিসার ॥ তবে রে—

পরাণ, পাঁচু ॥ খবরদার !

অফিসার ॥ [চকিতে রিভলবার বার করে] সাবধান, বীরত্ব ফলাবার চেষ্টা করো না কেউ।

[সুন্দরী দাওয়ার ওপর থেকে ছুটে এসে অফিসারের পায়ে পড়ে]

সুন্দরী ॥ বাবা, আমি তোমার পায়ে পড়ি বাবা, এ অঘটন তুমি ঘটিও না বাবা। বাবা, বাবা গো!

[কথার ফাঁকে এক ঝটকায় রিভলভারটা পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে পাঁচু মামার হাতে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে কেষ্ট, রেজাক এবং কয়েকজন ঢোকে। তারা আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল এই মুহূর্তটির জন্য]

সকলে ॥ সাব্বাস বৌঠান।

পাঁচু ॥ কি সাহেব, কার্তিক সাঁতরার বাড়ী এসেছেন, পান তামাক খাবেন না?

অফিসার ॥ পুলিশের অস্ত্রে হাত, ফল কিন্তু খুব খারাপ হবে।

পরেশ ॥ ছিঃ দুষ্টুমি করে না। সুবোধ বালকের মত ব্যবহার করতে শেখ।

নায়েব ॥ এটা কিন্তু অরাজকতা হচ্ছে।

পরাণ ॥ সেটা কি শুয়োরের বাচ্ছা তোর কাছ থেকে শিখবো!

কেষ্ট ॥ সারাটা জীবন তোরা আমাদের ভুগিয়েছিস্।

রেজাক ॥ দাদন না দেওয়ার ভয় দেখিয়ে কম দামে ফসল কিনেছিস।

পরাণ ॥ খাজনা না দেওয়ার জন্য সেরেস্তায় নিয়ে বেত মেরেছিস।

সকলে ॥ মারো, শালাকে!

নায়েব ॥ না। আমি না! আমি তো হুকুমের চাকর! করিয়েছে তো সব কালী সা।

পরেশ ॥ সেটা আমরা জানি। নাটের গুরুদের চিনতে আমাদের বাকী নেই। কিন্তু এতকাল ধরে দালালী করেছো, তার বকশিশ নেবে না!

নায়েব ॥ তোমরা যা বলবে করবো। শুধু পেরাণে মেরো না।

পাঁচু ॥ পেরাণের এত ভয়।

নায়েব ॥ পাঁচু, তুই আমার বাপ!

পরেশ ॥ এত সহজেই বাপ চিনতে ভুল হচ্ছে। ভাই সব, আমরা কালীসার হনুমান ধরেছি। আজ হনুমানের কদলী ভক্ষণ হবে। এই কান ধর। ধর্ কান। [নায়েব কান ধরে] বোস্—ওঠ—বোস্। বল আমি পাপী আমাকে ক্ষমা করো। আমার বাপের ঠিক নেই, আমাকে ক্ষমা কর!

নায়েব ॥ ভাই পরেশ, বাপ পাঁচু, সত্যি পাপী, মহাপাপী। এই কান মুলছি, নাক খত্ দিচ্ছি। ভগবানের দোহাই, পেরাণে যদি বাঁচি তো নায়েবগিরি করা আমি ছেড়ে দেব।

পাঁচু ॥ দে, নাক খত দে।

[নায়েব নাক খত দেয়]

যা বল্লি তা মনে থাকবে?

নায়েব ॥ চিরকালের মত মনে থাকবে।

পরেশ ॥ (অফিসারকে) কৈ হুলিয়া দেখি?

অফিসার ॥ কিসের হুলিয়া?

পরেশ ॥ ধাত ছাড়তে শুরু করেছে দেখছি। যে হুলিয়া দিয়ে ডাকাতে আসামীদের ধরে নিয়ে যেতে এসেছিলি।

অফিসার ॥ হুলিয়া তো নেই।

পরেশ ॥ তবে এখানে এসেছিস কেন?

অফিসার ॥ ভুল হয়ে গেছে।

পরাণ ॥ বানচোৎ ন্যাকামী হচ্ছে!

অফিসার ॥ (সকলের কাছে জোর হাতে) সত্যি আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। আমি শহরের ছেলে। আমার মা-বাপও গরীব। দিন আনে

দিন খায়। পেটের দায়ে পুলিশে চাকরী নিয়েছি। গ্রামে এসে কি যে একটা কাণ্ড করে ফেললাম।

পরেশ ॥ আমাদের ব্যাপারে কে নাক গলাতে বলেছিল তোমাকে ?

অফিসার ॥ কথাটা ঠিক। লোভ, প্রমোশানের লোভ। আমি ব্রাহ্মণ পৈতে ছুঁয়ে বলছি, দরকার নেই প্রমোশানের। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। এ ঝঞ্ঝাটে আর কোনোদিন আসবো না।

কেষ্ট ॥ বা, বা—বলিহারি ভাই ঘুরে ফিরে।

অফিসার ॥ আপনারা আমাকে লাথি মারুন, থুথু দিন, কান মলে দিন, নাক কেটে দিন—কি বলে যা খুশি করুন। কিন্তু গরীব মা-বাপ, নতুন বৌ; ছেলে হবে। চাকরী গেলে সব মরবে।

সুন্দরী ॥ ছেলে হবে !

অফিসার ॥ হ্যাঁ, মা তুমি আমাকে বাঁচাও। শুধু আমার অস্ত্রটা দিয়ে দাও। অস্ত্র হারালে চাকরী থাকে না। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান তোমা: পা ছুঁয়ে বলছি, আজ এখুনি আমি এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাবো।

পাঁচু ॥ কথা দিচ্ছ।

অফিসার ॥ হ্যাঁ। যদি এক বাপের ব্যাটা হই—

সুন্দরী ॥ না, না, অস্ত্র ফেরৎ দিওনা। ও আসুক।

পাঁচু ॥ কেন ?

সুন্দরী ॥ তা জানিনা। শুধু বলে গেছে, আমরা না আসা পর্যন্ত—

পাঁচু ॥ তোদের কি মত ? আসলে ও-ওতো গরীব। পেটের ধান্দায় পুলিশে চাকরী নিয়েছে। সে যখন ভুল বুঝতে পেরেছে—

পরেশ ॥ মাষ্টার বলে ঐ উর্দ্দির জাত আলাদা। যেই পরুক, তার জাত পাল্টে যায়।

অফিসার ॥ কিন্তু আমার পাল্টাবে না কথা দিচ্ছি।

পাঁচু ॥ ঠিক আছে এই নাও।

[অফিসার রিভলবার নেয়। দারুণ নীরবতা। হঠাৎ সেই নীরবতা ভাঙে অফিসারের হুঙ্কারে]

অফিসার ॥ হ্যাণ্ডস্ আপ্, হাত তোল সবাই। লাঠি শরকি সব ফেলে দে।

পাঁচু ॥ বেইমান!

অফিসার ॥ কেউ বেইমান নয়। ফিকির। বুদ্ধির প্যাঁচে তোরা হেরে গেছিস্।

নায়েব ॥ [সুন্দরীকে] এই শালী হচ্ছে নাটের গুরু। গাজনের সঙ সাজা হয়েছিল!

সুন্দরী ॥ [হঠাৎ একটি কাটারি তুলে নেয়] আর এক পা এগুচি তো এই দা দিয়ে তোর মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।

নায়েব ॥ দা রাখ্। দা রাখ্ বলছি।

সুন্দরী ॥ না, আর রাখবে না মনে পড়ে নিশ্চিন্তপুরের কথা! চাষীদের লড়াই।

নায়েব ॥ এসব তুই কি বলছিস্?

সুন্দরী ॥ ঠিকই বলছি চিনতে পারছিস না? আমি সেই সুন্দরী—বংশী মণ্ডলের বেটি। তুই আমার বাপকে মেরেছিস। আবার এ গেরামও শ্মশান করবি ভেবেছিস।

পরেশ ॥ বৌঠান!

অফিসার ॥ দা নাবা, নইলে গুলি কিন্তু মাথা ফুটো করে বেরিয়ে যাবে।

সুন্দরী ॥ থাক্, তবু মুণ্ডু আমার চাই।

[সুন্দরী কাটারী তোলে। অফিসার পরপর দুটো গুলি করে। সুন্দরী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে]

সকলে ॥ বৌঠান!

অফিসার ॥ খবরদার!

[এমন সময় দেখা যায় মানিক, জিলাল ও বহু চাষীরা মঞ্চে ঢুকছে]

পরেশ ॥ বাকি আছে চারটে গুলি। চারটে গুলিতে এতগুলো বুক ফুটো করে পালানো অসম্ভব। রিভলবারটা মাটিতে ফেলে দিন।

[অফিসার পুতুলের মত রিভলবারটা মাটিতে রাখে]

পাঁচু ॥ [মানিকের কাছে আসে] আমি, আমি দোষী। আমার বিচার হোক। তোর কথা আমি মানি নাই।

[সব চুপ। মানিক ধীরে ধীরে সুন্দরীর কাছে যায়। বুকের রক্ত হাত দিয়ে স্পর্শ করে। স্থির দৃষ্টিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরে সেই চিরপরিচিত সুরটি ভেসে ওঠে,—

"ও আমার ভাঙা ঘরে আসবে ছেলে সবার চোখের মণি।
তাই সরমে, গরবে মরে বধু গরবিনী, ও আমার গরবিনী ॥"

সুর উদাস হাওয়ায় মেশে। মানিকের সম্বিত ফেরে]

মানিক ॥ লড়াই-এ নেমে, একটা ভুল মানে একটা জীবন। শত্রুর চোখের জলে কলিজা ভিজিয়েছো কি খেসারৎ দিতে হবে। অনেক অনেক খেসারৎ।

পরাণ ॥ কিন্তু এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

জিলাল ॥ আমরা কি চিরকাল ভুলের খেসারৎ-ই দিয়ে যাবো ?

কেষ্ট ॥ আমরা ভুল শুধরে নেবার ব্যবস্থা চাই।

মানিক ॥ আকাশের পানে তাকিয়ে প্রতিকার চাইলেই প্রতিকার পাওয়া যাবে না। প্রতিকার আদায় করতে হবে হাতে কলমে। সামান্য চাল ঘেরাও থেকে ধাপে ধাপে আমরা এগিয়ে এলাম। না—এখানেও থামবো না। [হঠাৎ মঞ্চের দিকে পেছন করে নায়েব এবং অফিসারের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ওঠে]

গণ আদালত বসাবো আমরা। বিচার হবে। বিচার হবে যুগ-যুগান্তের

অত্যাচার—অনাচার আর হত্যার। দেশের আনাচ;কানাচ থেকে টেনে নিয়ে আসবো আসামীদের। কেউ রেহাই পাবে না।

আজকের বিচার শুরু হবে এখুনি। এখানেই।

[ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।

---

* "এ লড়াই জিততে হবে ...." গানটি বন্ধুবর কমল সরকার রচনা করেছেন।

কল্পতরু

বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্র

এ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার

পুলিশ অফিসার

বেয়ারা

বড় সাহেব

মন্ত্রী

নেতা

॥ এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে কোন এক অফিস ॥

[পুলিশ অফিসার ও অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার]

পুঃ অফিসার ॥ (মদ খেয়ে শিশিটা বন্ধ করতে করতে হঁ্যা, কি যেন নামটা বললেন ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ আজ্ঞে, ইলেকট্রনিক কম্পিউটার।

পুঃ অফিসার। বাঃ। বেশ গাল ভরা নাম তো।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ আর কাজ ! শুনলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবেন, আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়বেন, চাই কি জড়িয়ে ধরে আনন্দে অধরোষ্ঠে একটা চুম্বন করতেও পারেন।

পুঃ অফিসার ॥ চুম্বন ! সে কি ! মানুষ নাকি ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ না স্যার মানুষ নয়। মেসিন তো বটেই কিন্তু মানুষের মত ব্যবহার। একটা মেশিন, কিন্তু কাজে কর্মে মানুষের থেকে অনেক দক্ষ। এ মানুষের মত কথা বলতে পারে, মানুষের মত কথা মনে রাখতে পারে —মানে, মানে……

পুঃ অফিসার ॥ তার মানে ? সবই মানুষের মত ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কিন্তু মানুষ নয়। মানুষের থেকে অনেক ভালো, অনেক পরিশ্রমী, অনেক বিশ্বস্ত—মানে কি বললে যে ঠিক—

পুঃ অফিসার ॥ এই টুকুতেই আমার নেশা কেটে যাচ্ছে মশাই। দাঁড়ান আর একটু খাই। [মদ খায়]

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ না মানে, যে যুগে মানুষ কেবল পেট সর্বস্ব হয়ে উঠেছে—পরশ্রীকাতরতা যে যুগে মনুষ্যত্বের সবটুকু গ্রাস করতে এসেছে—একটা জিনিস আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন—আমাদের দেশের মানুষ আস্তে আস্তে পঙ্কিলতার কোন গভীরে নেমে যাচ্ছে? হিংসা, পরের ভাল দেখলেই গা জ্বলে ওঠা—ওঃ, এসব দেখলেই চোখের সামনে গান্ধীর ছবিটা ভেসে ওঠে। করুণ। কি করুণ সে মূর্তি—

পুঃ অফিসার ॥ (মদের বোতল এগিয়ে দিয়ে) একটু খাবেন নাকি?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ দিন। (মদ খেয়ে) কেবল মনে হয় মহাত্মা কাদের জন্য জীবন দিয়ে গেলেন? একটা মানুষ বুঝেছে তাকে? (আবার মদ খায়) যে সব জিনিষ তিনি বলতেন, বিশ্বাস করতেন—একজন মানুষ কি সেই সবের এক ফোঁটাও করে আজ?

পুঃ অফি: ॥ (হাত বাড়িয়ে মদের বোতল নিতে যায়—ম্যানেজার হাত সরিয়ে দেয়) তা যা বলেছেন। তবে এই সব খেয়ে ওই ভদ্রলোকের নামটাম মুখে আনবেন না।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (চমকে) কেন?

পুঃ অফিসার ॥ মহাত্মা এগুলো পছন্দ করতেন না শুনেছি। [আবার হাত বাড়ায়]

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (হাত সরিয়ে দিয়ে) না, মানে, ইয়ে—আচ্ছা এটাতো মহাত্মার স্মৃতি বার্ষিকী সভা নয়—

পুঃ অফিসার ॥ না, তা নয়।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (চিৎকার করে) তবে বারে বারে হাত বাড়াচ্ছেন কেন?

—এখানে খেতে বারণ কি? (আবার খায়) আপনিও খান (মদ দিয়ে দেয়) আজ কি দিন জানেন?—আনন্দ—আনন্দ করবো না একটু? আজ আমাদের অফিসের—শুধু অফিসেরই বা বলি কেন?—আমাদের দেশের এক ইয়ে এক …কি বলি?………এক গুরুতর দিন।

পুঃ অফিসার ॥ গুরুতর দিন! কি বলছেন?—

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ বাঃ আজকে ইলেকট্রনিক কমপিউটারের উদ্বোধন দিন না?

পুঃ অফিসার ॥ তার সঙ্গে গুরুতরের সম্পর্কটা কি? এ্যাঁ? ভাষা জানেন না বলেন কেন?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ রাগ করবেন না স্যার সত্যিই এটা গুরুতর মানে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন। আমাদের এক পত্রিকা এই কমপিউটার সম্বন্ধে কি লিখেছে জানেন? শুনবেন?

পুঃ অফিসার ॥ দাঁড়ান। আর একটু খেয়ে নিই। [মদ খায়]

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ নিন, নিন। একটু আধটু না খেলে আবার মাথা ঠাণ্ডা রাখাও শক্ত হবে।

পুঃ অফিসার ॥ বলুন।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ পত্রিকা লিখছে "এই মেসিন ১৫ সংখ্যা বিশিষ্ট অঙ্কের ৩০ লক্ষ যোগ ও বিয়োগ এবং ২০ লক্ষ গুণ ও ভাগ নির্ভুল ভাবে করতে পারে প্রতি সেকেণ্ডে।"

পুঃ অফিসার ॥ এ্যাঁ বলেন কি?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ হেঃ হেঃ—আরও আছে দাঁড়ান দেখাচ্ছি। চিকাগো রেডিও প্লান্টে কম্পিউটার মেশিনের সাহায্যে মাত্র ২ জন লোকে ১০০০টি রেডিওর বিভিন্ন অংশ সংযোজনের কাজ সম্পাদন করে। এই কাজে আগে ২০০ কর্মচারীর প্রয়োজন হতো—নিউ ইয়র্ক লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী ২০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের জীবন বীমা পলিসির প্রিমিয়ম ডিভিডেণ্ড

প্রভৃতির হিসেব নিকেশ করে মাত্র একটি কমপিউটার মেশিন নিয়ে। এই মেশিন প্রতিটি পলিসির প্রিমিয়ম নোটিশ পর্যন্ত ডাকে ছেড়ে দেয়।

পু: অফিসার ॥ এই মরেছে।

এ্যা: ম্যা: ॥ এতেই আঁতকে উঠছেন ? আরও আছে।

পু: অফিসার ॥ আরও ?

এ্যা: ম্যা: ॥ হ্যাঁ। একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ কি বলেছে জানেন ? একটি মাত্র কমপিউটার একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে ৩৫০০০ মাইল রেল রাস্তার যাবতীয় সিগ্‌ন্যাল এবং সুইচ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

পু: অফিসার ॥ (একটু নীরবতা; হঠাৎ) এ্যাই মশাই। গুল টুল মারছেন না তো ?

এ্যা: ম্যা: ॥ গুল, হা: হা: হা:! এ একেবারে অথেন্টিক। এই যে অটোমেশন এণ্ড ইনডাষ্ট্রিয়াল রিলেশন পত্রিকায় এডওয়ার্ড বি সীলনের প্রবন্ধ: ৫৯ পাতায় (একটা বই তুলে দেখায়। পুলিশ অফিসার হাঁ করে তাকিয়েথাকে) আর আমরাযে মেশিন আনছি অর্থাৎ I.B.M, 7094 Computer তার ক্ষমতা আরও ব্যাপক, আরও ভয়ানক—১২ লক্ষ কর্মচারী ৭ ঘণ্টায় যে কাজ করে, আমাদের মেশিন সেই কাজ ১ ঘণ্টায় করতে পারে—

পু: অফিসার ॥ কামড়ায় টামড়ায় না তো ?

এ্যা: ম্যা: ॥ মানে ?

পু: অফিসার ॥ খায় কি ?

এ্যা: ম্যা: ॥ মেশিন আবার খাবে কি ?

পু: অফিসার ॥ মেশিন ঠিক ভাল করে দেখেছেন তো ? মানে ছোটবেলায় এই রকম সব অদ্ভুত কাজ করতে পারা মন্ত্রপূত দৈত্য দৈত্যের কথা পড়েছিলুম কিনা ?

এ্যা: ম্যা: ॥ ও আপনি আলাদিনের সেই দৈত্যের কথা বলছেন ? কিন্তু

সে তো আলাদিনের কোন ক্ষতি করেনি? বরং তাকে এক বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করেছিলো।

পুঃ অফিসার ॥ দিন পাল্টে গেছে মশাই। আলাদিন ভাগ্যবান ছিল, সে সময়ে এই ইউনিয়ন টিউনিয়ন ছিল না। থাকলে শালাদের ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ হুঙ্কারে দৈত্য কৈত্য তো নিকেশ হতোই—আলাদিনকেও নিশ্চিন্তে রাজভোগ খেতে হ'ত না।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ তা যা বলেছেন। শালারা একটা না একটা ঝামেলা লাগিয়ে বসে আছে। ৩৬৫ দিনে একদিনও নিশ্চিন্ত হবার উপায় আছে? কি যে করে তুলেছে দেশটাকে—

পুঃ অফিসার ॥ তবে? এই অবস্থায় আবার দৈত্য কৈত্য—মানে ঐ মেশিন টেশিন এনে—মানে একে গোদের যন্ত্রণায় অস্থির তার ওপর বিষফোঁড়া এনে তুললেন?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ একেবারেই না। আপনি ভুল করছেন। কমপিউটার কাজ করার দক্ষতায় একটা দানব ঠিকই! কিন্তু অতিমানবসুলভ এর কোন ঝামেলাই নেই নিশ্চিন্তে, একান্ত নিরুপদ্রবে, একটা নির্দিষ্ট স্থানে বসে থাকে। যেমন আছে ঐ ঘরটায়।

পুঃ অফিসার ॥ উনি তো নিশ্চিন্তে ঐ ঘরে বসে রইলেন—তারপর? আমরা? আমরা কি আমাদের ঘরে থাকতে পারবো?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কেন?

পুঃ অফিসার ॥ সারা দেশ জুড়ে যখন তাথৈ তাথৈ নৃত্য শুরু হবে, তখন ঠেলাটা সামলাবে কে! ঐ মেশিন না এই মানুষ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কিন্তু কি হবে সেই ভেবে তো আমরা বসে থাকতে পারি না। বিশেষ করে ভারতবর্ষ একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেখানে এই রকম অগণতান্ত্রিক ব্যবহার—

পুঃ অফিসার ॥ থামুন, থামুন। ঐ সব বক্তৃতা দিয়ে পেটের মদ মাথায় তুলবেন না।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (ঘাবড়িয়ে গিয়ে) না, মানে আমি বলছিলুম যে বিজ্ঞানের সুবিপুল অগ্রগতি সারা পৃথিবী জুড়ে হচ্ছে, তার কল্যাণ পরশ থেকে বঞ্চিত থাকবে আমাদের দেশ!—আপনি যদি আমাদের মন্ত্রীসভার বক্তব্যগুলো একটু মনোনিবেশ সহকারে অনুধাবন করেন তাহলে দেখবেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে, বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমাদের দেশের দারিদ্র্যকে দূর করতে হলে চাই সর্বস্তরে বিজ্ঞানের প্রয়োগ।

পুঃ অফিসার ॥ (এতক্ষণ তাকিয়েছিল। একটু পরে) এ সব কাকে বলছেন?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ মানে?

পুঃ অফিসার ॥ আমাকে বলছেন?--আমাকে যদি বলেন—তাহলে আমি বলবো আপনি আরোও একটু মদ খান। (মদ এগিয়ে দেয়) মাথার জট পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ না না আপনাকে কেন? একথা আজ সারা দেশের লোককেই চিৎকার করে বলতে হবে।

পুঃ অফিসার ॥ তাডা খেয়েছেন কোথাও?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ তাড়া—মানে?

পুঃ অফিসার ॥ ঐ ইউনিয়নওয়ালাদের তাড়া একবার খেলে এই সমস্ত বদহজমের অসময়োচিত উদ্গারগুলো বন্ধ হয়ে যেতো।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ মানে?

পুঃ অফিসার ॥ ঐ শালাদের আপনি চেনেন? ও শালারা দুটো জিনিস বেশ ভাল বোঝে, নিজেদের ভাল আর পুলিশের লাঠি। আজকাল আবার শালা লাঠিতেও চলছে না।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (চমকে ওঠে) এই মরেছে। তাহলে রাইফেল, টাইফেল—

পুঃ অফিসার ॥ সে সব আপনাকে ভাবতে হবে না ।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ মাথা খারাপ ? আপনি বললেও ভাববো না।

পুঃ অফিসার ॥ কেন ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ বেশি ভাবলে আবার আমার নেশা করতে ইচ্ছে করে। ওটাতো বেশী করা উচিত নয়।

পুঃ অফিসার ॥ হ্যাঁ, গান্ধীর শিষ্যদের ওসব চালানো ঠিক নয়

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ না না, তা নয়।--হ্যাঁ ওটাতো বটেই—তবে আজকে সব মন্ত্রী-টন্ত্রী আসছেন কিনা ? তাই মানে আমাকে কিছু বলতে টলতে হবে তো। আচ্ছা বক্তৃতার মধ্যে আমি যদি ওদের সম্মেলনকে খিস্তি করি—মানে উল্লেখ করি—মানে সাহিত্যিক খিস্তি করে উল্লেখ করি—

পুঃ অফিসার ॥ সম্মেলন ! সেটা আবার কি ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ বারে। জানেন না ? দিল্লীতে গত বছর ডিসেম্বরে হলো যে।

পুঃ অফিসার ॥ কিসের সম্মেলন ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ ঐ যে, একটা কিছু গোলমাল না পাকালে তো শালাদের পেটের ভাত হজম হয় না। আমিও বক্তৃতায় যা দিয়েছি না—

পুঃ অফিসার ॥ রাখুন মশাই, আপনার বক্তৃতা। সম্মেলনটা কিসের তাই বলুন।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এই "অটোমেশন"-এর বিরুদ্ধে—মানে এই ইলেকট্রনিক কমপিউটারের বিরুদ্ধে। দেশের কোথাও যেন এই মেশিন না বসে। সেই জন্যেই—মানে—ব্যাপারটা কিছুই নয়—ওরা—

পুঃ অফিসার ॥ ওরা—ওরা মানে কি ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ ওরা মনে ওরা মানে আমরা নই।

পুঃ অফিসার ॥ তার মানেটা কি হলো ?—ওরা মানে আমরা নই ! সহ্য হয় না তো নেশা করেন কেন ? ওরা মানে কারা ? তাদের একটা নাম, একটা ঠিকানা—কিছু আছে ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ ওঃ তাই বলুন। সে সব আমার কাছেই আছে—এই যে মোট ৩৬টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলো।

পুঃ অফিসার ॥ ছ-ত্রি-শ-টি—

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ হ্যাঃ। (হেসে) নামগুলো বলবো ?

পুঃ অফিসার ॥ (হঠাৎ রেগে) দেখুন মশাই সব ব্যাপারে অমন গাড়লের মত হাসবেন না।— কি সর্বনেশে ব্যাপার। ছত্রিশটি কেন্দ্রীয় সংস্থা মানে ? বাকী কে রইলো ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কেন আমরা।

পুঃ অফিসার ॥ আবার বলে আমরা, কোথাকার উজবুক মশাই ? ৩৬টি কেন্দ্রীয় সংস্থার সব শালারা যেখানে মিলেছে সেখানে আপনারা শালারা রইলেন কি গেলেন কি এসে গেল ? (মদ খায়) লড়াইটা কি রকম হবে মাথায় ঢুকছে ?—কমপিউটারের কম্পনে হৃদকম্প শুরু হবে, এই বলে রাখলুম।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (ঘাবড়ে গিয়ে) সেই রকম হুঙ্কারই দিয়েছে মনে হচ্ছে।

পুঃ অফিসার ॥ মানে ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ ওরা সকলেই অটোমেশনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে এক বিশাল আন্দোলন গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে।

পুঃ অফিসার ॥ দেশ জুড়ে নয়, বলুন পৃথিবী জুড়ে।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (একগাল হেসে) কি যে বলেন স্যার ? পৃথিবী অত ছোটো জায়গা নয় যে ওরা মনে করলো আর পৃথিবীটা জুড়ে হৈ চৈ বেধে গেল। তা ছাড়া সে শক্তি কোথায় ?

পুঃ অফিসার। নির্বোধ খরগোশের মত চোখ বুঁজে বিপদ এড়াবার চেষ্টা করবেন না।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ না—মানে—

পুঃ অফিসার ॥ ওই শালা ইউনিয়নগুলো পারে না এমন কাজ নেই।

অবিশ্বাস্য ভয়ঙ্কর শালাদের কাজকর্ম। ঐ লিডারগুলো এক একটা আস্তো কমপিউটার মেশিন।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কি যে বলেন স্যার!

পুঃ অফিসার ॥ বলি যা তা দেখতেই পারেন। এই এক সেকেণ্ডে ৩০ লক্ষ যোগ বিয়োগের মত ওরাও ৩০ লক্ষ পুলিশের প্রাণান্ত করে মারবে—পুলিশগুলোকেও যে কেন আনতে দিচ্ছেন না—

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ বাব্বাঃ! পুলিশ আনলে কি আর রক্ষে থাকতো? এই যে আমি হাসছি, কেন?

পুঃ অফিসার ॥ নেশা করেছেন বলে।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ হাসছি কারণ ওরা যখন জানতে পারবে, তখন বাংলা দেশে ইলেকট্রনিক কম্পিউটার চালু হয়ে গেছে।

পুঃ অফিসার ॥ দেখুন এই সব সিরিয়াস ব্যাপারে ছেলেমানুষের মত কথা বলবেন না।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ সত্যি বিশ্বাস করুন। আজকের ব্যাপারটা একেবারে গোপন রাখা হয়েছে। কাক পক্ষীও জানতে পারেনি। কবে যে আমরা মেশিনটা আনলুম এবং কবে যে সেটা গোডাউনে ঢুকলো, ওঃ হোঃ হোঃ—

পুঃ অফিসার ॥ আবার হাসে?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ হাসি পাচ্ছে যে। যে ধাক্কাখানা দেওয়া হবে আজ—কি বলেছিলো জানেন ওই শালা ইউনিয়নের লীডারটা? বলেছিলো, বুকের রক্ত ঢেলে দেবে, কিন্তু কমপিউটারকে ঢুকতে দেবে না। আচ্ছা ঐ শালাকে ধরে নিয়ে যান না—তবে আজকে না। কাল কিম্বা পরশু শালাকে ধরে পিছমোড়া করে বেঁধে এইসা ধোলাই দেবেন না—

পুঃ অফিসার ॥ তারপর মরে গেলে কে দেখবে?

এ্যাঃ ম্যাঃ ।। মরে গেলে আবার দেখার কি আছে। পুঁতে ফেলবেন মাটির তলায়। কে জানতে পারছে ?

পুঃ অফিসার ॥ কে জানতে পেরেছিলো, নিমাই সরকারকে আমরা ইয়ে করেছি ? ওই শালা শত্রুরা—ওরা গন্ধ পায়। হাওয়ায় ভেসে যায় খবর।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ সত্যি সে ব্যাপারটায় অবাক হয়ে গেসলাম।

পুঃ অফিসার ।। আবার অবাক হবেন। আমি বলে দিচ্ছি কাক পক্ষী টের না পেতে পারে—কিন্তু ঐ ইউনিয়ানওয়ালাদের বোকা বানাবেন ? চোখে ধূলো দেবেন ? ওদের সম্বন্ধে এই জ্ঞান নিয়ে লড়তে যাচ্ছেন ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কিন্তু ওরা জানতে পারলে রাস্তার চেহারা কি আজ এরকম থাকতো বলুন !

পুঃ অফিসার ।। (একটু ভেবে) আচ্ছা ওরা ভাণ করছে না তো ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ মানে ?

পুঃ অফিসার ॥ আপনারাও যেমন কিছু হয়নি কিছু হয়নি ভাব দেখাচ্ছেন ওরাও তেমনি কিছু জানিনা কিছু জানিনা ভাণ করছে।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ তাতে ওদের লাভ ?

পুঃ অফিসার ।। কি জানি মশাই। হয়তো তলে তলে এমন একটা কিছু করছে যেটা কল্পনাও করতে পারছেন না। ঠিক সময়ে সেটি আত্মপ্রকাশ করবে আর আমরা চোখে সরষে ফুল দেখবো।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এ অসম্ভব। (বেয়ারার প্রবেশ)

বেয়ারা ॥ স্যার বড় সাহেবের ঘরে আপনার ফোন।

[অফিসার বেরিয়ে যায়]

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ হ্যাঁরে বড় সাহেব কাল বাড়ী যায় নি ?

বেয়ারা ।। না, স্যার সারারাত কাজ করেছেন। আপনি চলে যাবার পরও আরও দু জন এসেছিলেন। কথাবার্তা বলতে বলতেই তো সকাল হয়ে গেল।—স্যার একটা কথা জিগগেস্ করবো ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কি কথা ?

বেয়ারা ॥ কোন গোলমাল হবে নাকি ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ গোলমাল ? কেন ? কোথায় ?

বেয়ারা ॥ না বলছিলুম, কি রকম চুপচাপ থমথমে ভাব। এত বছর চাকরী করছি—

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এ সব ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাবার দরকারটা কি ?— তোমার যা কাজ সেইটুকু করে যাবে চুপচাপ করে।

বেয়ারা ॥ চুপচাপ করেই তো করি স্যার।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ করোই যদি তবে আজকের চুপচাপ তোমার কাছে নতুন লাগছে কেন ?—এ্যাঁ, এটা অফিস তো ? না মাছের বাজার ?

বেয়ারা ॥ আপনি রেগে যাচ্ছেন স্যার, আমি অন্য কথা ভেবেছিলুম।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ অন্য কথা ? অন্য কথা আবার কি ?

বেয়ারা ॥ ঐ যে মেশিনটা।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (চমকে উঠে) মেশিন! মেশিন কোথায় ? হেঃ হেঃ হেঃ তুমি কি স্বপ্ন দেখছো না কি ?

বেয়ারা ॥ স্বপ্ন কেন হবে স্যার, ঐ যে গোডাউনের পশ্চিম দিকের ঘরটায়—আজ সকালে দেখলুম ওখানে কি একটা রয়েছে বিরাট ঢাকাঢুকি দেওয়া। আর রাস্তায় দেখলাম বিরাট একটা লরী—

এ্যাঃ ম্যাঃ। আমার মাথাটা ঘুরে উঠলো কেন ? এ কি! বুকের ভিতরটাও যেন কি রকম গুড গুড গুড গুড় করে উঠলো। কি রকম যেন ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

বেয়ারা ॥ কি হলো স্যার।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (অনেকক্ষণ বেয়ারার দিকে তাকিয়ে থেকে) তুমি শালা ওখানে গিয়েছিলে কেন ? এদ্দিন ধরে ওখানে কারো যাওয়া বারণ। একটা মাছি গলার উপায় রাখা হয়নি। পুলিশ বসিয়ে রাখা হয়েছে।

বেয়ারা ॥ আজ্ঞে স্যার ওর বদলি আসেনি কাল থেকে। বেচারী তিরিশ ঘণ্টা একভাবে বসে। দূর থেকে আমায় দেখতে পেয়ে একটু জল চাইলো—

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ আর তুমিও অমনি জল নিয়ে ছুটলে ?

বেয়ারা ॥ তা স্যার একজন জল চাইলে দোবো না ? জল দিলুম। আলাপ করলুম। লোকটা কিন্তু খুব ভাল স্যার, পুলিশ বলে মনেই হয় না।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ শালা বোধ হয় সত্যিই পুলিশ নয়। পুলিশের ছদ্মবেশে ইউনিয়নিষ্ট্ নয় তো ?

বেয়ারা ॥ কি বলছেন ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ ঠিকই বলছি। পুলিশ হ'লে কি এত কাছা খোলা হ'তো !

বেয়ারা ॥ ও বিশেষ করে অন্য কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছে। তা হ'লে নাকি গোলমাল হ'তে পারে।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এও বলেছে ! শালা আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

বেয়ারা। এঁ্যা ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ ভাই ! তুমি এই গোপনীয় কথাটা কাউকে না বলতে আর কাকে কাকে বলেছো ?

বেয়ারা ॥ কাউকে নয় স্যার আজই তো জানতে পারলুম।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (হঠাৎ অত্যন্ত পুলকিত হয়ে) সত্যি বলছো ? যাক বাবা বাঁচলাম। (হঠাৎ বেয়ারার হাত ধরে) শালা। আর ছাড়ছিনা। তোমায় পুলিশে দেওয়া হবে।

বেয়ারা ॥ কেন স্যার !

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কেন ? কেন কি ? To prevent you from acting in a manner prejudicial to defence.

বেয়ারা ॥ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ তোমার বোঝার দরকারটা কি ?—আচ্ছা ফাজিল লোক

তো! অমন বড় বড নেতারা কেউ বুঝতে চাইলনা। সুড় সুড় করে চলে গেল! আর তুমি কোন হরিদাস এলে যে তোমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

বেয়ারা ॥ না—স্যার—

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ চোপ শালা। আমার চোখে ধূলো দেবে? খুব জোর ধরে ফেলেছি। শালা সরষের মধ্যেই ভূত!

বেয়ারা ॥ কি বলছেন স্যার?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ আবার কথা বলে? চোপ শালা চোপ। শালা ইউনিয়ন-এর চর। আর এই পুলিশ অফিসারটাও আসে না কেন? অত মদ খেলে কি আর শরীর তুলতে ইচ্ছা করে? যেখানে যাবে—দেখাচ্ছি শালা তোমাকে—

বেয়ারা ॥ আমি কি দোষ করলুম।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কোথায় যাচ্ছিলে?

বেয়ারা ॥ বাইরে।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ খবর টবরগুলো সাঙাতদের বলে আসতে? শালা কি সব্বোনেশে লোক রে বাবা।

বেয়ারা ॥ আজ্ঞে আমি বড সাহেবের সিগারেট আনতে যাচ্ছি।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও সব চালাকী—এ্যাঃ—কি বললে? বড সাহেবের সিগারেট? এই, সত্যি বলছিস তো!

বেয়ারা ॥ হ্যাঁ স্যার, এই দেখুন পয়সা।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এ তো মহা সমস্যায় পডা গেল। বড সাহেব শালা এক নম্বরের গোঁয়ার। এখন একে আটকালেও বিপদ—অথচ ছেডে দিলে, ওরে বাবা সব্বোনাশ হয়ে যাবে। হারে রে রে ক'রে পংগপাল ধেয়ে আসবে। করি কি? মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিছু চিন্তা করতে পারছি না। (হঠাৎ বেয়ারাকে) আচ্ছা একটু মদ দিতে পার?

বেয়ারা ॥ মদ ? আমি ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ (এতক্ষণে সম্বিত ফিরে এসেছে) তুমি শালা একটা জলজ্যান্ত প্রব্লেম। এখন করি কি ? (একটু ভেবে) এ্যাই পেয়েছি—

বেয়ারা ॥ কি স্যার ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ প্রব্লেম সলভ্‌ড্‌ এই অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে দেওয়া তো চলবে না! চোখে চোখে রাখতে হবেই। ঠিক আছো চলো, আমিও যাবো তোমার সংগে। (দুজনে বেরিয়ে যায়)

[বড় সাহেব ও পুলিশ অফিসারের প্রবেশ]

বড় সাহেব ॥ সব ব্যবস্থাই তো মোটামুটি করা গেছে— এখন ভালয় ভালয় শেষ রক্ষাটা হ'লে হয়।

পুঃ অফিসার ॥ শুরু যখন হ'য়েছে শেষ তখন হবেই, তবে ভালয় ভালয় কি—

বড় সাহেব ॥ আচ্ছা আপনার কি মনে হয় বলুন তো ?

পুঃ অফিসার ॥ ঠিক বলতে পারব না। মানে এ ব্যাপারে খুব জোরের সঙ্গে কিছু মনে হওয়া মুস্কিল।

বড় সাহেব ॥ হাঙ্গামা হবে বলে বোধ হচ্ছে ?

পুঃ অফিসার ॥ হতে পারে।

বড় সাহেব ॥ কিন্তু আজকের ব্যাপারটা তো গোপন রাখা হয়েছে।

পুঃ অফিসার ॥ আবার বলে গোপন রাখা হয়েছে। এতো মহা জ্বালায় পড়া গেল। আরে মশাই নিজেদের সম্বন্ধে কোনও ধারণা আপনাদের আছে ? সাতশো ছেঁদা নিয়ে রাজত্ব চালাচ্ছেন, গোপন বলে আপনাদের কিছু আছে ? আপনাদের ২০ বছরের রাজত্বের কেচ্ছার মহাভারত তৈরী করে দেশ তো তোলপাড় করছে। কি গোপনটা করেছেন ?

বড় সাহেব ॥ কিন্তু আমরা তো চেষ্টার ত্রুটি করছি না।

পুঃ অফিসার ॥ কি করছেন জানি না মশাই। তবে আপনাদের এক একটা গেঁড়া কলে আমাদের নাভিশ্বাস উঠছে।

বড সাহেব ॥ ওসব আমাকে বলছেন কেন ? মন্ত্রি পরিষদকে বলুন ।

পুঃ ॥ মন্ত্রি পরিষদ ! বলুন বিভীষিকা পরিষদ ! স্বাধীনতার পর থেকে একটা কাজ বলুন নির্বিঘ্নে হয়েছে ? যাতে হাত দিয়েছে তাতেই বিভীষিকা দেখিয়ে ছাডছে। সত্যি কথা বলতে কি সরকারের কোনও কাজ শুনলেই বুক কাঁপতে শুরু করে।

সাহেব ॥ কেন ?

পুঃ অফিসার ॥ সিচুয়েশনটাই আজকাল এই রকম হয়ে উঠেছে। পুলিশের কাজ যখন শুরু করেছিলাম তখন পুলিশ দেখলেই লোকে পালাতো। আর আজ কি অবস্থা জানেন ? মানুষ দেখলেই পুলিশ পালাচ্ছে।

সাঃ ॥ কিন্তু আপনারা যদি এত দুর্বল হয়ে পডেন তো আমরা দাঁডাই কোথায় ?

পুঃ ॥ দাঁড়াতে আর হবে না। (মদ খায়)

[মন্ত্রী ও এ্যাসিস্‌টেণ্ট ম্যানেজারের প্রবেশ]

মন্ত্রী ॥ এসে গেছি, আমি এসে গেছি। —কই হে লগ্নের আর কত বাকি ?

বড সাহেব ॥ সময় হয়ে গেছে স্যার আর একটু বাকী।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এই আর ৭ মিঃ ১৩॥ সেঃ।

পুঃ অফিসার ॥ দেখুন ঐ পাঁজি টাজি ঝাডবেন না। উনি যখন এসে গেছেন তখন কাজটা তাডাতাডি সেরে ফেলুন, আমরা নিশ্চিন্তে বাডী যাই।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ সে কি হয় ? শুভ জিনিস শুভ সময়েই করতে হয়।

বড সাহেব ॥ এদিকে সব রেডি ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ রেডি স্যার। লোক চক্ষুর অন্তরালে একান্ত সংগোপনে বসে আছেন বিদেশিনী কমপিউটার—অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এই মুহূর্তটির। ওখানে তেনাকে গাড়ীতে তোলা, এখানে নিয়ে আসা এবং স্যারের ফিতে কাটা। অমনি আত্মপ্রকাশ করবে আমাদের জয়লক্ষ্মী।

মেন্ত্রী ॥ বড় ভাল বলছো। বড ভাল বলছো। সত্যি এবার একটু নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

পুঃ অফিসার ॥ আমার তো মনে হচ্ছে নতুন ক'রে দুশ্চিন্তা এলো।

মন্ত্রী ॥ আসতেই পারে না। আমি বলছি আসার কোন সম্ভাবনাই নেই, এই ইলেকট্রিক কমপিউটার—

বড় সাহেব ॥ ওটা স্যার ইলেকট্রনিক কমপিউটার।

মন্ত্রী ॥ আরে ঐ হলো সারাজীবন দেশের স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজদের সঙ্গে লডতে গিয়ে ওদের ভাষাটা একটু শিখে নেবার সময়ই পেলাম না। আচ্ছা,—ওর একটা বাংলা নাম দেওয়া যায় না—

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ আমি বলবো স্যার? বৈদ্যুতিক কল্পতরু।

মন্ত্রী ॥ (পুলকিত হয়ে) কল্পতরু। বেশ বলেছো, বৈদ্যুতিক কল্পতরু? আহা বড ভাল বলেছো। ইউনিয়ন দলনী বৈদ্যুতিক কল্পতরু।

পুঃ অফিসার ॥ ইউনিয়ন দলনী?

মন্ত্রী ॥ (চোখ বুঁজে হাত জোর করে) মা। তোমার অধম সন্তানদের জনতার হাত থেকে—

বড সাহেব ॥ স্যার ওটা বামপন্থী জনতা হলে ভাল হয় না

মন্ত্রী ॥ ঠিক বলেছো, বামপন্থী জনতার হাত থেকে রক্ষা করো। (হাত জোড করে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে।

পুঃ অফিসার ॥ এই মরেছে। সব কটা পাগল হয়ে গেল নাকি! (ধমকে) এ্যাই মশাই, মা-মা কি?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এই যে বৈদ্যুতিক কল্পতরু।

পুঃ অফিসার ॥ উনি মা হলেন কেন?

মন্ত্রী ॥ মা-ই তো। বিপর্যস্ত, নাস্তানাবুদ, অবোধ সন্তানদের রক্ষা করতে আকাশ থেকে নেমে এসেছেন।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ না স্যার, মাটি খুঁড়ে উঠেছেন।

পুঃ অফিসার ॥ আচ্ছা, এই সব ভ্যাস্তারার কোন মানে হয়? যা করার করে ফেলুন না।

বড় সাহেব ॥ উনি একটু ভয় পেয়ে গেছেন।

মন্ত্রী ॥ ভয়? কিসের ভয়?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ খাদ্য আন্দোলনের চোট স্যার।

মন্ত্রী ॥ (হেসে) আরে না না। এটাতো আর খাদ্য আন্দোলন নয়। সামান্য গোলমাল হলেও হতে পারে। কিন্তু—

বড় সাহেব ॥ এ কথা আমি ওকে বলেছি স্যার, উনি কিছুতেই বিশ্বাস করছেন না। এটা যে কেবলমাত্র আমাদের অফিস সংক্রান্ত ব্যাপার এটাই ওর মাথায় ঢুকছে না; জনসাধারণের সংযোগ কোথায় এর সঙ্গে?

পুঃ অফিসার ॥ এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা হলো এই যে, ইউনিয়নগুলো সম্পর্কে এত ছোট করে চিন্তা করা উচিত নয়।

মন্ত্রী ॥ মানে?

পুঃ অফিসার ॥ এখন আপনার মনে হচ্ছে যে ইউনিয়ন আর জনসাধারণ এক নয়। কিন্তু লড়াই একবার শুরু হলেই ও দু শালাই কেমন এক হয়ে যায়। দেখেছি। তা—

বড় সাহেব ॥ এক হবে কেন? ওদের ইণ্টারেষ্ট কি—

পুঃ অফিসার ॥ কি করে বলবো? বোধ হয় পুলিশ দেখলেই ওরকম হয়।

মন্ত্রী ॥ এটা ঠিক এবং অত্যন্ত দুঃখের কথা যে স্বাধীন ভারতে পুলিশ জনসাধারণের আস্থা হারিয়ে তাদের শত্রু হয়ে উঠেছে।

পুঃ অফিসার ॥ তা হলে আপনি কি বলছেন পুলিশ জনসাধারণের আস্থা ফিরে পেতে চেষ্টা করবে।

মন্ত্রী ॥ সেইটাই তো করা উচিৎ।

পুঃ অফিসার ॥ এই লাঠি তাহলে আপনাদের মাথায় পড়বে।

সকলে ॥ এঁ্যা! মানে!

বড় সাহেব ॥ কাকে কি বলছেন? আপনার মাথার ঠিক আছে তো?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ না স্যার একেবারে ঠিক নেই—মানে, সকাল থেকেই—মানে—একটু মানে, বুঝলেন না? গোলমাল তো হবেই।

পুঃ অফিসার ॥ আরে কি মুস্কিল—জনতার বন্ধু হতে গেলে তারা যা চায় তাই করতে হবে তো?

মন্ত্রী ॥ তুমি কি বলছো জনতা এই চায়? —তারা এ চাইতে পারে?—

অফসার ॥ ঠিক তাই।

বড় সাহেব ॥ কখনও নয়।

মন্ত্রী ॥ এ হতে পারে না—কি করে হবে? আমায় বুঝিয়ে দাও। আজ ৩০ বছর রাজনীতি করছি কি না? তাহলে? জনতার সঙ্গে কারবার কি আমার কাজ?

পুঃ অফিসার ॥ সে কারবারে মন্দা পড়েছে—

মন্ত্রী ॥ অসম্ভব! জনগণ আমাদের ভুলতেই পারে না কিছু লোক আমাদের না চাইতে পারে—আমরাও তাদের চাই না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ, আমাদের অসীম ত্যাগে যাদের জীবন ধন্য...

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এই মরেছে! আর বক্তৃতা দেবেন না, স্যার!

মন্ত্রী ॥ কেন?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ বক্তৃতা শুনলেই উনি চটে যান, মানে আবার কথা কাটাকাটি—এই আর কি?

বড় সাহেব ॥ সত্যিই তো। সকাল থেকে আজ আপনি বড্ড চটে আছেন।

পুঃ অফিসার। কি করবো ঐ বক্তৃতাগুলো শুনলেই গা-টা কি রকম রী রী করে।

বড় সাহেব ॥ জনসাধারণ আমাদের চায় না—এ ধারণাটা আপনার—মানে—বলছিলুম—

পুঃ অফিসার ॥ ঢোক গিলবেন না মশাই। যা সত্যি তা সকলেই জানে। পারেন জনসাধারণকে আজকের অনুষ্ঠানে ডেকে আনতে ?

মন্ত্রী ॥ নিশ্চয়ই পারি। ডাকা উচিৎ। আমি মনে করি জনতার ভীড়ে ভরে উঠুক এ নিঃসঙ্গতা। দেশের এই শুভ দিন জনগণের হর্ষোৎফুল্ল অভিনন্দনে ধন্য হয়ে উঠুক।

বড় সাহেব ॥ (হঠাৎ চমকে উঠে স্যার, স্যার ও কাজই করবেন না। জানতে পারলে জনগণ হর্ষোৎফুল্ল হবে ঠিকই। কিন্তু তাদের হরিষে আমাদের বিষাদ—চরমতম বিষাদ স্যার।

মন্ত্রী ॥ কিন্তু জনগণ নেই আমি আছি—এ কথাটা ভাবতে পারো ? জনতা ছাড়া আমি যে থাকতেই পারি না। এ যে আমার অভ্যাস

বড় সাহেব ॥ ও অভ্যাসটা এবার কাটানো ভাল।

মন্ত্রী ॥ কেন ?

পুঃ অফিসার ॥ বদ অভ্যাস। জনতার আদর সহ্য হবে কি ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ ওরে বাবা, স্রেফ পিটিয়ে মেরে ফেলবে স্যার।

পুঃ অফিসার ॥ আপনারাও মরবেন, আমাদেরও প্রাণান্ত।

বড় সাহেব ॥ আমাদের স্যার খুব সাবধানে থাকা উচিত।

পুঃ অফিসার ॥ . কি সাবধানটা হবেন ? লড়াই একবার শুরু হলে কোথায় গিয়ে পৌছবে ভাবতে পারেন ?

মন্ত্রী ॥ আমরা ভাববো না। ভাববে তোমরা। ব্যবস্থা করবে তোমরা।

পুঃ অফিসার ॥ ব্যবস্থা তো করে রেখেছি।

মন্ত্রী ॥ কি করেছো ?

পুঃ অফিসার ॥ উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম পুলিশের সমুদ্র বানিয়ে ফেলতে পারি স্যার এখনি।

মন্ত্রী ॥ ফেলতে পারি কি ? ফেলছো না কেন ?

পুঃ অফিসার ॥ সে সব এনাদের বলুন। ও সব রাজনীতির প্যাচ আমার মাথায়

ঢোকে না। ভালও লাগে না। আমি সোজা লোক সোজা কথাই ভাল-বাসি—(বড় সাহেবকে) আবার আপনাকে বলে রাখছি, ওই সব প্যাঁচ ফঁ্যাচ ঝাড়তে যাচ্ছেন নিজেরাই প্যাঁচে পড়ে যাবেন। (মন্ত্রীকে) তবে আমি সব রেডি রেখেছি স্যার, এই যে ৪৭০ জন আর্মড পুলিশ। ২০ জন পাঞ্জাবী, ১০৩ জন বিহারী, ৬১ জন উড়িয়া। বাকি বাংলা থেকে—এ ছাড়া আছে টিয়ার গ্যাস স্কোয়াড। তা ছাড়া আছে লাঠিধারী পুলিশ, লাঠি ছাড়া পুলিশ, সাদা পোষাকের পুলিশ—

মন্ত্রী ॥ যাক। প্রাণটা শান্তি হল। এই জন্য তোমাদের আমি এত ভালবাসি। যখন যতটা দরকার ঠিক ততটা রেডি থাকো।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ ঠিক দরকার মাফিক তো হয় নি স্যার—আনার কথা ছিল বিশল্যকরণী, উনি এনে বসেছেন গন্ধমাদন।

বড় সাহেব ॥ তা যা বলেছো। এতো ভয়ের সত্যিই কিছু নেই।

পুঃ অফিসার ॥ ভরসাও তো কিছু পাচ্ছি না।

মন্ত্রী ॥ মানে এতো পুলিশেও কিছু হবে না বলছো?

পুঃ অফিসার ॥ কিস্যু হবে না। এখানে এঁটে উঠতে না পারলে শালারা ছড়িয়ে পড়বে রাস্তার মোড়ে, গ্রামের মাঠে, অলিতে গলিতে—বক্তৃতার তোড়ে সব ভাসিয়ে দেবে—অবস্থাটা কল্পনা করতে পারেন? এসপ্ল্যানেডের আন্দোলন কোথায় গিয়ে পৌছবে আন্দাজ করতে পারেন?

মন্ত্রী ॥ কোথায়?

পুঃ অফিসার ॥ কেষ্টনগরে।

সকলে ॥ (ভীষণভাবে চমকে) এঁ্যা!

মন্ত্রী ॥ এই মরেছে! আর দেরি কেন? কাজটাজগুলো তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলে চলো না যাই।

পুঃ অফিসার ॥ আমি তো সেই কথাই বলছি। বলা যায় না যদি জেনেটেনে ফেলে! আবার যেতে হবে তো ওদেরই ওখান দিয়ে।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ দু পাশে লাখো লাখো মারমুখী জনতা—ওরে বাবা ভাবলেই কাঁদতে ইচ্ছা করে।

বড় সাহেব ॥ কিন্তু জানতে পারছে কি করে ?

মন্ত্রী ॥ তুমি থামো।

বড় সাহেব ॥ না স্যার, আমি আপনাকে হলপ করে বলতে পারি—জানতে পারেনি।

মন্ত্রী ॥ (প্রায় কেঁদে ফেলে) জানতে পারলে কি হবে সেটা ভেবে দেখেছো ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ আদি অকৃত্রিম দেশী ইঁট।

পুঃ অফিসার ॥ আর সঙ্গে সঙ্গে আগুন—শালারা মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড করে তোলে। তখন কাউকে মারা ধরা চুলোয় যাক, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রাণ নিয়ে ছুটতে হবে।

মন্ত্রী ॥ তাহলে আর দেরী নয়। আমি যাই। [হঠাৎ চলে যেতে উদ্যত]

বড় সাহেব ॥ কিন্তু আজকের অনুষ্ঠান ?

মন্ত্রী ॥ রাখো তোমার অনুষ্ঠান। প্রাণ বাঁচলে অনুষ্ঠান অনেক হবে। কিন্তু—

পুঃ অফিসার ॥ ফিতেটা কেটে দেওয়া তো। একেবারে চুকিয়েই যাননা।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ তা কেমন করে হবে ? এখনও ১২॥ সেঃ বাকি।

বড় সাহেব ॥ তুমি থাম। এই সময়টুকু স্যার যদি দয়া করে, মানে শেষ পর্য্যন্ত তীরে এসে তরী ডোবাবেন ?

মন্ত্রী ॥ তীর পর্য্যন্ত যখন এনেছো তখন ডুবলেও ক্ষতি নেই। মাঝগঙ্গা তো নয়। ও তোলা যাবে সহজে—আর ঐ ফিতেটা তো তুমিও কেটে নিতে পারো।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ হাঁ সেটা পারা যায় ॥ কাঁচিও রেডিই আছে। আপনার হাত দিয়ে না হয় এর হাত দিয়ে, চাই কি অনুমতি দিলে- আমার হাত দিয়ে।

পুঃ অফিসার ॥ ততক্ষণে অন্তর্ঘাত না এসে পড়ে।

মন্ত্রী ॥ সত্যিই তো। বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে। আরে ফিতেটা তো ছেঁড়া। ওটা তুমিই ছিঁড়ে নিও—কাল কাগজে আমার নামটা বড করে ছেপে দিলেই চলবে। কেউ তো আর দেখতে আসছে না। আর হাঁ ওই সঙ্গে কাগজে বেশ চিত্তাকর্ষক—মানে—এই কমপিউটারের ছবি টবি দিয়ে—মানে কি রকম দেখতে, তাদের অলৌকিক ক্ষমতা—মানুষের সমাজে এক আশীর্বাদ, মানে এই সব স্বপ্নটপ্ন ফেঁদে একটা খবর ছাপাতে হবে। হেড লাইন দিতে বলবে। আচ্ছা এই কাগজগুলো এখনও চুপ করেই আছে তো?

বড সাহেব ॥ হুই আর আছে। কতকগুলো কাগজ তো অলরেডি এই কমপিউটারের বিরুদ্ধে সম্পাদকীয়তে লিখে দিয়েছে।

পুঃ অফিসার ॥ এই মরেছে। ও শালারা লিখতে গেল কেন?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ বাবা। না লিখে পারে? ব্যবসা চালাতে হবে না? তার ওপর ভ্যানে আগুন লাগলে দেখবে কে?

মন্ত্রী ॥ ওদের আজই ডেকে পাঠাও। সকলকে নির্দেশ দাও—কমপিউটারের জন্যে যে বহু মানুষের চাকরী যেতে পারে এই ধারণা পাল্টাতেই হবে।

পুঃ অফিসার ॥ আচ্ছা, চাকরী কি সত্যিই যাবে না কি?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ না হলে এত ঝঞ্ঝাট করে ওসব আসছে কেন?

বড় সাহেব ॥ না না। এসব পাব্লিকলি আলোচনা করবেন না। মনে রাখবেন দেওয়ালেরও কান আছে।

পুঃ অফিসার ॥ চাকরী গেলে আগুন তো লাগবেই। মামার বাড়ীর আব্দার নয় তো? মুখের ভাত কেড়ে নেবেন আর তারা আপনাদের বক্তৃতা শুনে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করবে তা হবে না। পেটের ভাত কেড়ে নিলে তাদের প্রাণের মায়াও থাকবেনা এই বলে দিচ্ছি।

মন্ত্রী ॥ কিন্তু সে কথা তো আমরা চেপে গেছি। মন্ত্রী পরিষদ তো বিশেষ জোর দিয়ে বলেছে কারো চাকরী যাবে না।

পুঃ অফিসার ॥ কিন্তু আপনাদের মতলবটা কি ?

বড় সাহেব ॥ আমরা চাকরী খাবো। যে শালারা ইউনিয়ন করবে, গোলমাল পাকাবে আমাদের বিরুদ্ধে জোট বাঁধার চেষ্টা করবে তাদের চাকরী খেতেই কমপুটর আনা হচ্ছে।

মন্ত্রী ॥ সত্যিই তো। কতকগুলো ট্রেড ইউনিয়নিষ্টের মর্জিমত তো চলতে পারে না? যদি সত্যিই আমরা এ বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারি তাহলে আমরাই যে কেবল বিপন্মুক্ত হবো তাই নয়, তোমরাও হবে। ৩৬৫ দিন এই ট্রেড ইউনিয়নের ঝামেলা থাকবে না। কত কাজ কমে যাবে বলতো ?

এ্যাঃ ম্যাঃ।। মানে বুঝলেন? এক কম্পিউটর-এ ইউনিয়নিষ্টকেও খাবে— পুলিশদেরও খাবে।

পুঃ অফিসার ॥ মানে ?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কাজ কমে গেলে পুলিশেরও ছাঁটাই।

পুঃ অফিসার ॥ এ্যাই মশাই। এ সব সত্যি ?

মন্ত্রী ॥ মাথা খারাপ। তোমরাই আমাদের রাজত্বের স্তম্ভ। তোমাদের ছাড়া এক দিনও আমরা বাঁচতে পারি ? তোমাদের সমস্ত শক্তিকে তখন নিয়োজিত করা হবে দেশের বামপন্থীদের নিধন করতে। কত সুবিধে হবে বলতো ?

পুঃ অফিসার ।। কি জানি কি গ্যাঁড়াকল করছেন, তবে ইউনিয়নিষ্টরা জব্দ হলেই ভালো।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ শালাদের বিদেশীর দালাল বললেও জনসাধারণ বিশ্বাস করে না।

বড় সাহেব ॥ এইবার কম্পিউটর চালিয়ে ধ্বংস করবো শালাদের।

মন্ত্রী ॥ জয়, ইউনিয়ন দলনী বৈদ্যুতিক কল্পতরু—

সকলে ॥ জয়।

[এমন সময় বাইরে স্লোগান শোনা যাবে। সকলে চমকে ওঠে। প্রবেশ করে বেয়ারা]

বেয়ারা ॥ স্যার সব্বোনাশ হয়ে গেছে। হাজার হাজার লোক হৈ হৈ করে ছুটেছে সমুদ্রের মত!

পুঃ অফিসার ॥ তখন থেকে বলছি ভ্যাস্তারা মারবেন না। নিন এবার ঠেলা সামলান।

মন্ত্রী ॥ ভাই, তোমার ওপর এখন সব নির্ভর করছে। তুমিই পারো বাঁচাতে—

পুঃ অফিসার ॥ এই যে এদের বলুন! কেউ জানবে না বলে যে পুলিশ আসতে দিলেন না—এখন কি হবে? যান ওদের সামলান।

মন্ত্রী ॥ কি বিপদেই পড়লুম। তুমি যা হোক করে বাঁচাও ভাই।

পুঃ অফিসার ॥ দাঁড়ান আগে নিজে বাঁচি, তারপর আপনারা।

(বেরিয়ে যায়)

বড় সাহেব ॥ খবর পেলো কোত্থেকে?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এই শালা স্যার! শালাকে ঠিকই ধরেছিলুম—কিন্তু ফসকে গেছে স্যার, কি করবো? (হঠাৎ বড় সাহেবকে ধমকে) আপনারও সিগারেট খাওয়ার একটা সময় অসময় নেই! (শান্ত হয়ে) কিছু মনে করবেন না স্যার, আমার মাথার ঠিক নেই। আর আপনি—আপনিও এমন সময় এলেন যে ওকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলুম। এখন আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে—

(কেঁদে ফেলে)

বড় সাহেব ॥ (অগ্নিমূর্তি হয়ে) এই—তুই কোথায় গিয়েছিলি?

বেয়ারা ॥ সিগারেট আনতে—আপনারই স্যার—এই যে—

মন্ত্রী ॥ আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরই কবর খুঁড়ে এসেছো—(বড় সাহেবকে) এই সব ইউনিয়নিষ্টগুলোকে গায়ের সঙ্গে এঁটে রেখেছেন কেন?

বড় সাহেব ॥ কি করে বুঝবো স্যার।

মন্ত্রী ॥ এখুনি তাড়ান। জেলে পুরুন। ফাঁসি দিন—

[বাইরে প্রচণ্ড স্লোগান]

এই মরেছে। চলুন না—দাঁড়িয়ে আছেন কেন? একটা নিরাপদ জায়গায় গা ঢাকা দিতে হবে তো?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ আসুন স্যার।

[তিনজনেই চলে যাচ্ছে। পুলিশ অফিসার ঢুকবে]

পুঃ অফিসার। ওদিকে যাবেন না। হাজার দশেক লোক—বাড়ীটাকে ঘিরে ফেলেছে।

বড় সাহেব ॥ তাহলে কি হবে?

পুঃ অফিসার ॥ তার আমি কি জানি? পুলিশ আসতে দেননি এখন নিজে সামলান। (মন্ত্রীকে) আর আপনি চুপ করে আছেন কেন? জনতার জন্য দুঃখে মরে যাচ্ছিলেন—যান জনতা এসেছে—বক্তৃতা দিয়ে আসুন।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ সেটাও হতে পারে স্যার—এখন ঠিক ১১৷৷০ সেকেণ্ড সম্পূর্ণ।

মন্ত্রী ॥ আসুন। ভাই আমি এই আগুনের মধ্যে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারছি না।

পুঃ অফিসার ॥ দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান—

মন্ত্রী ॥ কোথায় যাই?

বড় সাহেব ॥ এই তোর ঘরে নিয়ে যা।—আমি আসছি। (বেরিয়ে যায়)

বেয়ারা ॥ আমার ঘরে—মানে মন্ত্রী—সাহেব—আমার ঘরে—

মন্ত্রী ॥ কোন মানে নেই ভাই। তোমায় যা বলেছি ক্ষমা করে দাও। কিছু মনে করো না। আমাকে বাঁচাও।

[বাইরে স্লোগান]

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছো? তুমি কি চাও? আমরা

আজ এইখানে তোমার চোখের সামনে ল্যাজে গোবরে হই! এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি—এইটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ নেই তোমার? কখনও কি তোমার কোন উপকার করিনি? আমি তোমার পায়ে পড়ি ভাই!

পুঃ অফিসার ॥ এই, ছিঁচকাদুনের মত চেঁচাবেন না তো? এই নিয়ে যা এদের এখান থেকে (প্রায় টেনে বার করে দেয়)।

[সাহেব ও নেতা কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে]

বড় সাহেব ॥ না, না, একথা আপনি কি বলছেন? সব কিছুর ই শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করা সম্ভব।

নেতা ॥ সেই জন্যেই কি হাজার হাজার কর্মচারীকে পেছন থেকে ছুরি মারার মতলব করেছিলেন?

বড় সাহেব ॥ ছুরি মারা? কি বলছেন?

নেতা ॥ ঠিকই বলছি। নির্লজ্জের মত আমাদের চোখ এড়িয়ে ঐ অভিশাপ আমাদের ঘাড়ে চাপাবার ষড়যন্ত্র করেছিলেন, আপনাদের এই নীচ জঘন্য মনোবৃত্তি হাজার হাজার মানুষের মনে ঘৃণার আগুনকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

পুঃ অফিসার ॥ এই মশাই, চুপ করুন। চেঁচাবেন না।

নেতা ॥ চোখ রাঙাচ্ছেন কেন?

পুঃ অফিসার ॥ আমি পুলিশ। চোখ রাঙানোই আমার কাজ।

নেতা ॥ সেটা রাঙাবেন বাড়ীতে আপনার স্ত্রীর কাছে।

পুঃ অফিসার ॥ দেখলেন? আপনাকে আগে বলিনি?

বড় সাহেব ॥ যাক্‌গে। দেখুন আমি আপনাকে আবার অনুরোধ করবো, আপনারা চলে যান। আপনারা যা মনে করছেন সেটা ভিত্তিহীন।

নেতা ॥ প্রথম কথা হচ্ছে, আপনাদের বিশ্বাস করা অপরাধ। বারে বারে আপনারা সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করে এসেছেন, অথচ মুখে তাদের বন্ধু সেজেছেন। আর দ্বিতীয়ত—

পুঃ অফিসার ॥ দেখুন ঐসব বক্তৃতা বক্তৃতা ঝাড়বেন মনুমেণ্টের তলায়, সোজাসুজি বলুন কি আপনাদের বক্তব্য।

নেতা ॥ ঐ ইলেকট্রনিক কম্পিউটার দেশের হাজার হাজার মানুষের কাছে যা নির্মম অভিশাপ হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে, তাকে বন্ধ করতে হবে।

পুঃ অফিসার ॥ আপনাদের কথায় ?

নেতা ॥ ঠিক তাই।

বড় সাহেব ॥ এ কথা বলা ঠিক নয়।

পুঃ অফিসার ॥ তা'ছাড়া দেশে আইন শৃঙ্খলা কিছু নেই না কি ?

নেতা ॥ আইন! কিসের আইন? আইন তো মানুষ মেরে কতকগুলো বড়লোকের স্বার্থ রক্ষা করা—

পুঃ অফিসার ॥ হ্যাঁ। এবং আপনাদের ঠেঙানো।

নেতা ॥ সেদিন পাল্টে গেছে। আপনাদের ঠেঙানীকে দশগুণ করে ফিরিয়ে দিতে আজ সব প্রস্তুত।

বড় সাহেব ॥ কিন্তু কম্পিউটার-এর বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। এটাকে আমি অনভিজ্ঞতার সংকীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই বলতে পারিনা। আপনি হয়তো 'লুডাইট্' আন্দোলন সম্বন্ধে জানেন না ?

নেতা ॥ জানি।

বড়সাহেব ॥ সে আন্দোলন কি মানুষের অবিবেচনা প্রসূত ছিল না? আজকের মত সেদিনও তারা যন্ত্রবিপ্লবকে দায়ী করেছিল নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য। ভেঙে তছনছ করেছিলো—

নেতা ॥ সেদিনের ও আজকের আন্দোলনে অনেক তফাৎ আছে।

পুঃ অফিসার ॥ আছেই তো। আজকে ওই সব ভাঙাচোরার মত্লব করলেই রামধোলাই দেওয়া হবে।

নেতা ॥ থামুন। খাদ্য আন্দোলনের শিক্ষা ভুলে গেছেন? উল্টে মারার সাহসটা তারা অর্জন করেছে।

পুঃ অফিসার ॥ আরে?—একে কিছু বলে লাভ নেই।

বড় সাহেব ॥ আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিনা কম্পিউটার-এর বিরুদ্ধে আপনাদের ক্রোধের কারণ কি?

নেতা ॥ অত্যন্ত পরিষ্কার। এই মেশিন আমাদের পেটে মারবে। চাকরী যাবে। আপনাদের রাজত্বে এই দুঃসহ অত্যাচারের মাঝেও হাজার হাজার খেটে খাওয়া মানুষ যে কোনরকমে টিকে আছে—সেটাও আর চলবে না। তাই মরার আগে তারা একবার লড়ে দেখতে চায়—আপনাদের এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করা যায় কিনা।

বড় সাহেব ॥ কম্পিউটার মেশিনের সঙ্গে মরার সম্পর্কটা কি?

নেতা ॥ বহু মানুষের চাকরী যাবে।

পুঃ অফিসার ॥ সেটা যাবে (সাহেবের খোঁচায় মনে পড়ে যায়) এঁ্যা—ওঃ হো! এটা চেপে যাওয়ার কথা ছিল না?

নেতা ॥ আপনারা চেপে গেলেও আমাদের ঠকাতে পারেন নি। আপনাদেরই প্রভু আমেরিকান বিশেষজ্ঞ, শিল্পে ও ব্যবসায় অটোমেশন প্রসঙ্গে বলেছেন—এই কম্পিউটার মেশিন মানুষের চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী ও সংক্ষেপে কাজ করে—তারা কখনও ক্লান্ত হয় না। সারাক্ষণ কাজ করে। ভুল করে না, লম্বা লম্বা কথা বলে না। তারা কোনোদিন ধর্মঘট করবে না, বছর শেষে পরিবর্তিত বেতন দাবী করবে না। একথা গোপন করবার কিছুই নেই যে, অটোমেশনের-এর সব চাইতে বড় গুণ—এ শ্রমিক সংখ্যা কমিয়ে আনে।

বড় সাহেব ॥ কিন্তু আমাদের কথা স্বতন্ত্র, কেননা আমরা তো বলেই দিয়েছি যে কারুরই চাকরী যাবে না। এ হচ্ছে বিনা অশ্রুপাতে অটোমেশন। এইটুকু বিশ্বাস আপনারা নিশ্চয়ই করতে পারেন।

নেতা॥ বিশ্বাস! আপনাদের? বস্ত্র শিল্পের শ্রমিকদের আপনারা এই বলেই ভাঁওতা দিয়েছিলেন। অটোমেশনের কথা ছেড়েই দিলাম ঐ শিল্পে রেশনেলাইজেশন চালু হওয়ার পর সেখানে কি দেখা গিয়েছিলো?— অশ্রুপাত বন্ধ থেকেছিলো? বহু মানুষকে চাকুরী হারাতে হয়েছিলো। বস্ত্র শিল্পে বহুগুণ উৎপাদন বাড়া সত্ত্বেও দৈনন্দিন কর্মি নিয়োগের সংখ্যা কমেছে ১৮ হাজার। সুতরাং অটোমেশনের ফলে যে কি ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, তা সহজেই কল্পনা করা যায়।

বড সাহেব॥ এ সব কে বলেছে আপনাকে?

নেতা॥ ভারত সরকারের শ্রম দপ্তর।

পুঃ অফিসার॥ এই ভাবে খেড়িয়ে রাখলে কি করে চলে?

বড সাহেব॥ না না, মানে—যদিও ওটা বোধহয় ঘটেছে—কিন্তু মেশিন এর জন্য দায়ী হবে কেন?—অন্য কোন কারণ ছিল নিশ্চয়ই। আর বস্ত্র শিল্পে—

নেতা॥ শুধু বস্ত্রশিল্পে কেন? পাট শিল্পের অভিজ্ঞতা আরও মর্মান্তিক। সেখানে উৎপাদন দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বাড়া সত্ত্বেও শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে এক লক্ষ। যদিও যে কমপিউটারের ফলে বিপুল ছাঁটাই হয়েছে সেগুলো খুবই ছোট ধরনের। আর এখন যেটি আসছে তার ক্ষমতা অনেক অনেকগুণ বেশি। (নীরবতা)

পুঃ অফিসার॥ নবকার্তিকের মত দাঁডিয়ে আছেন কেন? উত্তর দিন। (আবার চুপ চাপ) দেখুন মশাই। এই অসহনীয় অবস্থা বেশিক্ষণ ষ্টেণ্ড করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি চলে যাব বলে দিচ্ছি।

বড় সাহেব॥ এঁ্যা? ইয়ে মানে চাকরী যাওয়ার সঙ্গে অটোমেশনকে এরা জুড়ে দিচ্ছে। অন্য সময়ে কি কারো চাকুরী যায় নি?

পুঃ অফিসার॥ এই তো। নিশ্চয়ই, এই রাজত্বে সব সময়েই এটা—

বড সাহেব॥ আসলে ইলেকট্রনিক কমপিউটার আনার সঙ্গে কর্মচারীর সংখ্যা

কমানোর কোনো প্রশ্নই উঠে না। অফিসের কাজের দক্ষতা বাড়ানোই আমাদের উদ্দেশ্য।

নেতা ॥ তা তো বটেই, এই ভাঁওতা দিয়েই তো আপনারা বাটা, টাটা, জয়া, ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই, ডানলপ ইত্যাদি শিল্পে চালু করার হীন চক্রান্ত করেছেন কিন্তু আজ আপনাদের ভাঁওতা সবার কাছে ফাঁস হয়ে গেছে তাই আজকের সংগ্রামে আমরা আর একা নই। সুতরাং এই জঘন্য মিথ্যা দিয়ে আপনাদের হীন ষড়যন্ত্রকে ঢাকা দেওয়া আর সম্ভব নয়।

বড় সাহেব ॥ ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র কেন?

পুঃ অফিসার ॥ দেখুন সব ব্যাপার অমন পেঁচিয়ে দেখবেন না আমি বলে দিলুম। ভদ্রলোককে বিশ্বাস করতে পারেন না?

নেতা ॥ ভদ্রলোক হলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করতুম। কিন্তু ওনারা যে ভদ্রলোক সেটাই তো প্রমাণ হওয়া দরকার—

পুঃ অফিসার ॥ নিন মশাই। প্রমাণ ট্রমাণ দিয়ে দিন তো চট্‌ করে।

বড় সাহেব ॥ তার মানে? ভদ্রলোক—এর আবার প্রমাণ কি?

পুঃ অফিসার ॥ সত্যিই তো, এর আবার প্রমাণ কি?

নেতা ॥ অন্ততঃ কথার ঠিক থাকবে তো?

পুঃ অফিসার ॥ সেটা এদের কোন কালে নেই।

বড় সাহেব ॥ এ্যাই। কি যা তা বলছেন? আমাদের কথার ঠিক নেই?

পুঃ অফিসার ॥ তবে? ভদ্রলোক নয় মানে?—এই তো বলে দিলেন কথার ঠিক আছে।

নেতা ॥ কথার ঠিক আছে?—আপনারা সব সময়েই মুখে বড় বড় কথা বলে থাকেন—আর কাজ কর্মে বড় লোকদের মোসাহেবী করেন!

পুঃ অফিসার ॥ এ হতেই পারে না।

নেতা ॥ কি কথা বলেছিলেন পেট্রোলিয়াম শিল্পের কর্মচারীদের? মনে আছে?

বড় সাহেব ॥ না তো।

নেতা ॥ ভুলে গেছেন ?

পুঃ অফিসার ॥ সব কথা অত ভুলে গেলে কি করে চলে ?

নেতা ॥ কিন্তু মানুষ ভোলে না। বস্ত্র ও পাট শিল্পের মত বার্মাশেল, ক্যালটেক্স, এসো প্রভৃতি কোম্পানীতে কম্পিউটার আমদানি হয়েছে কয়েক বছর আগে। তাদের মাথায় সন্দেহ জেগেছিলো যে বেকারীর অভিশাপ তাদের ঘাড়েও নেমে আসবে। কিন্তু আপনাদের বক্তৃতার স্রোত বয়ে গেল। "কারো চাকরী যাবে না" চীৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলেছিলেন।

পুঃ অফিসার ॥ ওখানে চাকরী খেয়েছেন না কি ?

বড় সাহেব ॥ নিশ্চয়ই নয়। ওকে চাকরী খাওয়া বলে না। প্রতিটি কর্মচারী—যাদের চাকরী গেছে, তাদের প্রচুর প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে।

পুঃ অফিসার ॥ তবে ? টাকার কথাটা চেপে যাচ্ছেন কেন ?

নেতা ॥ টাকা ? কবে দিয়েছেন ? যে কর্মচারী ৩০।৩৫ বছর চাকরী করে নিয়মিত বেতন ছাড়াও বৃদ্ধ বয়সে অবসর কালীন টাকা ২৫।৩০ হাজার পেতেন, তাকে অল্প কিছু টাকা দিয়ে চাকরী থেকে মাঝপথেই বিদায় নিতে বাধ্য করা হল।

বড় সাহেব ॥ বাধ্য কেন ? এতে তো কোন জোর ছিল না ?

নেতা ॥ হ্যাঁ। বাইরে বাইরে তাই বলা হয়েছিল, সমস্ত ব্যাপারটাই ইচ্ছাধীন। কিন্তু আসলে সবটাই জোর করে অবসর দেওয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্র।

পুঃ অফিসার ॥ তারা কি কোন গোলমাল করেছিলো ?

বড় সাহেব ॥ একেবারেই না। অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত ঘটেছিল। হ্যাঁ। আর এই থেকেই প্রমাণ হয় যে সাধারণ মানুষ চিরকালই শান্তিপ্রিয়।

নেতা ॥ নিশ্চয়ই না। এই কথা বলে আপনাদের রাজত্বে ধীরে ধীরে

মানুষকে নির্বীর্য করে তোলার চেষ্টা চলছে। মানুষ যাতে নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে—সংগ্রাম থেকে দূরে চলে যায়—সেই জন্মে আপনারা যে চক্রান্ত চালিয়েছেন আমাদের ইউনিয়নগুলো তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। মানুষ চিরদিনই সংগ্রামী। অন্যায়কে সে কখনও মাথা পেতে নেয় নি। সেই ঐতিহ্যে মানুষকে ফিরিয়ে আনার মহান দায়িত্ব আমাদের। আপনাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে চিরদিনের জন্ম বন্ধ করে দিতে আজ দিকে দিকে মানুষের ঘুম ভেঙেছে।

[আবার নীরবতা। মন্ত্রী ও এ্যাসিষ্টেন্ট হঠাৎ প্রবেশ করে]

মন্ত্রী ॥ এত গোলমাল কিসের ?

পুঃ অফিসার ॥ যাক বাঁচা গেল।—আসুন তো এগিয়ে।

মন্ত্রী ॥ কি হল কি ?

পুঃ অফিসার ॥ হবে আবার কি ? তখন থেকে এক তরফা গালাগাল খেয়ে যাচ্ছে—একটা ঠিক মত উত্তর দিতে পারে না। এই সব ধ্যাড়াকো মাল দিয়ে কোন কাজ চলে ?

বড সাহেব ॥ এ্যাই গালাগাল দেবে না বলে দিচ্ছি।

পুঃ অফিসার ॥ থামুন। আর বীরত্ব দেখাবেন না! ল্যাজে গোবরে হয়ে গিয়েও লজ্জা নেই। এ কি নির্লজ্জ রে বাবা। যান ওদিকে সরে দাঁড়ান, আপনি এদিকে আসুন তো। এই লোকটি বলছে কমপিউটার বসানো চলবে না।

মন্ত্রী ॥ কেন চলবে না ?

নেতা ॥ আপনাদের মর্জিমত আর চলবে না।

বড় সাহেব ॥ তবে কি আপনাদের মর্জিমত চলবে ?

নেতা ॥ একশোবার। (খুব ধমকে—সকলে একটু চমকায়)

মন্ত্রী ॥ লোকটি একটু উগ্র মনে হচ্ছে। ভারতের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধ এই স্বভাব এর হলো কোত্থেকে ?

বড় সাহেব ॥ এ শালা ইউনিয়নের লোক।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এই মরেছে! তাহলে আর কথা বাড়াবেন না, স্যার।

মন্ত্রী ॥ গোড়াতেই আপনাকে বলবো এই বিজাতীয় স্বভাব পরিত্যাগ করুন। আপনি ভারতীয়—সহনশীলতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা—এই সমস্ত সদ্‌গুণ সকল ভারতবাসীর থাকতেই হবে।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এ কথা একশোবার। সব ব্যাপারে একটা কি রকম লজ্জা লজ্জা আমাদের বৈশিষ্ট্য।

নেতা ॥ আপনাদের নিশ্চয়ই। কিন্তু ভারতবাসীর নয়। সংগ্রামী ভারতবাসীর বৈশিষ্ট্য আলাদা। যাই হোক আসল কথায় আসা যাক।

পুঃ অফিসার ॥ সেই ভাল।

নেতা ॥ কম্পিউটার মেশিন এনে কেন হাজার হাজার দরিদ্র মানুষের সর্বনাশ করছেন?

মন্ত্রী ॥ সর্বনাশ। কোথায়? কেন?

নেতা ॥ যেখানে যেখানে এই কম্পিউটার এসেছে, সেখানেই চরম দুঃখের খড়্গ নেমে এসেছে সাধারণ মানুষের মাথায়। আবার এই অভিশাপ এল, আই, সি তেওএটেনে আনছেন কেন?

মন্ত্রী ॥ একে অভিশাপ বলছেন কেন?

বড় সাহেব ॥ ওদের ধারণা এতে নাকি অনেকের চাকরী যাবে।

মন্ত্রী ॥ ভুল, ভুল একেবারে ভুল।

বড় সাহেব ॥ আমি সে কথা...

পুঃ অফিসার ॥ আপনি থামুন।

মন্ত্রী ॥ চাকরী যাবার কোন প্রশ্ন উঠতেই পারে না। মন্ত্রী পরিষদ থেকে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

নেতা ॥ সেই কথায় বিশ্বাস করার জন্য পেট্রোলিয়াম শিল্পে ৫০৪১ জনকে চাকরী হারাতে হয়েছে।

পুঃ অফিসার ॥ লাইফ ইনসোরেন্স-এর কথা হচ্ছে সেই কথাই বলুন।

মন্ত্রী ॥ হ্যাঁ এখানে তো ছাঁটাই হয়নি।

নেতা ॥ নির্বোধের মত কথা বলবেন না। মেশিনটাই বসলো না ছাঁটাই হবে কোত্থেকে? তবে আমরা জানি ছাঁটাই হবে! ছাঁটাই অবধারিত।

মন্ত্রী ॥ এই সব মিথ্যে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছেন?

পুঃ অফিসার ॥ ফায়দায় এই সব মিথ্যে মিথ্যে কথা বলে চললে ঘাড় ধরে জেলে পুরে দেবো।

বড় সাহেব ॥ এই সমস্ত মিথ্যে কথা বলে দেশের মানুষকে খেপিয়ে তুলবেন?

নেতা ॥ মিথ্যে?

সকলে ॥ একশোবার।

নেতা ॥ আপনারা যে খবরটা জেনেও দেশের মানুষকে জানাতে সাহস পাচ্ছেন না সেটা আমরা জানি।

পুঃ অফিসার ॥ কি সেটা?

নেতা ॥ এখন ইনসোরেন্স-এ ৫০,০০০ লোক কাজ করে। এই কমপিউটর মেশিন চালু হলে সেই কাজ করার জন্য মাত্র ৫০০০ লোক হলেই চলবে।

মন্ত্রী ॥ কে বলেছে? দারুণ মিথ্যে!

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ এখনও একে এ্যারেষ্ট না করার কোন মানে হয়?

পুঃ অফিসার ॥ সব ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করলে আপনাকে এ্যারেষ্ট করা হবে।

নেতা ॥ আপনারা শুনলে আশ্চর্য হবেন খোদ আমেরিকা থেকেই এ সংবাদ পাওয়া গেছে। ভারতের মত দরিদ্র দেশের প্রশ্নই ওঠে না। আমেরিকা-তেই আজ এই কমপিউটর মেশিন-এর ফলে এক দারুণ ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ সালে আমেরিকান কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্ট কেনেডির ভাষণ শুনলেই বুঝতে পারবেন। কেনেডি বলেছেন, বর্তমান দশকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো অটোমেশনের ফলে উদ্ভূত

শ্রমিক কর্মচারীদের কর্মসংস্থান করা। এটা বাস্তব সত্য যে মেশিনের ব্যবহারের ফলে যে বহু সংখ্যক কর্মচারী বেকার হয়েছেন এবং ভবিষ্যতে চাকুরী প্রার্থীর সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়ছে তাতে করে আগামী দশ বছরের প্রতি সপ্তাহে ২৫০ ০০ লোকের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই রকম ভয়াবহ অবস্থার চাপে পড়েই প্রেসিডেণ্ট জনসন ১৪ জনের এক জাতীয় কমিশন গঠন করে সমস্ত অবস্থা সত্বর বিবেচনা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব বুঝতে পারছেন আপনাদের আশ্বাসের ভেতরের যে চক্রান্ত সে আজ আর কারো অজানা নেই। শুধু তাই নয় প্রতি বছর গড়ে ২০০০ জন নূতন কর্মী এই ইনসোরেন্স-এ চাকরী পান —এই মেশিন প্রতিষ্ঠার ফলে সে আশাও শেষ।

মন্ত্রী ॥ সে আমরা কি করবো ?

বড়সাহেব ॥ কেবল চেঁচালেই তো চলবে না। জানেন ? এমন অনেক হিসেব নিকেশ আছে যা মানুষের পক্ষে করা একেবারেই অসম্ভব। সেগুলোর জন্য কমপিউটর-এর প্রয়োজন আছে কি নেই ?

নেতা ॥ নিশ্চয়ই নেই। এতদিন মানুষের দ্বারাই সম্ভব হচ্ছিল। হঠাৎ এমন কি হিসেব এলো যা মানুষের দ্বারা সম্ভব নয়।

বড় সাহেব ॥ সে কৈফিয়ৎ কি আপনাদের দিতে হবে ?

নেতা ॥ নিশ্চয়ই দিতে হবে।

পুঃ অফিসার ॥ আবার চেঁচায়। চেঁচাতে বারণ করলুম না ?

বড় সাহেব ॥ তাছাড়া আমাদের লক্ষ লক্ষ বীমাকারীদের প্রতি দায়িত্ব হচ্ছে প্রাথমিক।

নেতা ॥ সে দায়িত্ববোধ আপনাদের চেয়ে আমাদের অনেক বেশী আছে, কিন্তু সেই দায়িত্ব পালন করতে কর্মচারীদের ছাঁটাই করবেন এ তারা চাইতেই পারে না।

মন্ত্রী ॥ কে বলেছে চাইতে পারে না।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ কেরাণীগুলো শালা হাড়ে হাড়ে হারামী। কাজ করবেনা কেবল মাইনে বাড়াও, মাইনে বাড়াও।

নেতা ॥ সেই জন্যই কি আসছে কম্পিউটর মেশিন?

পুঃ অফিসার ॥ যদি বলি তাই?

নেতা ॥ তাহলে আমি বলে যাচ্ছি আমরা একে প্রতিরোধ করবো। আমাদের একজনের বুকের রক্ত থাকতেও মেশিন আমাদের দেশের কোথাও প্রতিষ্ঠিত করতে দেবোনা।

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ সে কখন এসে গেছে—

নেতা ॥ আমরা জানি সে কথা। আপনারা ভেবেছিলেন আমাদের চোখে ধুলো দেবেন? কিন্তু জেনে ফেলেছি আমরা। আর আপনাদের এই নীচ জঘন্য ষড়যন্ত্রের জবাবে তারাও আপনাদের চোখে ধুলো দিয়ে এতক্ষণে ঘিরে ফেলেছে ঐ মেশিন।

সকলে ॥ এঁ্যা?

মন্ত্রী ॥ কি করছো দাঁড়িয়ে? হটাও—লাঠি চালাও, গুলি চালাও! যা করে হোক একটা কিছু করো। [পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যায়]

সাহেব ॥ এত বড সর্বনাশ কি করে হলো?

এ্যাঃ ম্যাঃ ॥ আমার কান্না পাচ্ছে।

মন্ত্রী ॥ দেখাচ্ছি তোমাদের। জেল থেকে দয়া করে ছেড়ে দিয়েছি, আবার পুরবো। গুলি চালাবো—

নেতা ॥ জেল থেকে মুক্তি পেয়েছি আপনাদের দয়ায় নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের উত্তাল আন্দোলনে। যে আন্দোলনের ৫০টি প্রাণের তাজা রক্তে ভিজে গিয়েছিল বাংলার মাটি আর আপনারা ভয়ে ইঁদুরের মত পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন সেই আন্দোলনই আমাদের মুক্ত করেছে।

মন্ত্রী ॥ আবার জেলে পুরবো।

নেতা ॥ তবু আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আপনাদের ভাঁওতা আজ ধরা পড়ে গেছে। (বাইরে গুলির আওয়াজ)

(নেতা ছুটে বেরিয়ে যায়। মঞ্চের ওপর নীরবতা; একটু পরেই ছুটে নেতার প্রবেশ)

নেতা ॥ গুলি চালিয়েছেন আপনারা।

মন্ত্রী ॥ বেশ করবো চালাবো।

বড় সাহেব ॥ তোমাদের ধ্বংস করবো।

নেতা ॥ পারবেন না। দেখুন গিয়ে যেখানে রক্ত ঝরছে সেখানেই মানুষ আরও দুর্বার সাহসে এগিয়ে আসছে। আপনাদের পুলিশই পালিয়েছে ওখান থেকে—হাজারো মানুষ তাদের রক্তের মূল্যে তাদের প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করছে। মেশিনকে তারা গোডাউন থেকে বের করতে দেয়নি, আর দেবেও না।

সকলে ॥ এ্যাঁ? তা হলে আমরা—

নেতা ॥ এই ভাবেই জনতার সামনে আসতে হবে আপনাদের সকলকে শেষ বিচারের দিনে সেদিন আপনাদের সমস্ত বেইমানির হিসেব করবে লাখো জনতা। আন্দোলনের ধাক্কায় ধাক্কায় আপনাদের পায়ের তলার মাটিকে সরিয়ে দিচ্ছে তারা। তারপর সেদিন আসবে যেদিন শেষ কবর খুঁড়ে জীবন্ত সমাধি দেবে আপনাদের—কোটী ভারতবাসীর জীবন্ত জঘন্য অভিশাপ।

আমি থামব না

সাধনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

গুরুপদ	শিক্ষিত বেকার
শিবপদ	ঐ পিতা
হরিপদ	ঐ ভ্রাতা
অমূল্য	রাজমিস্ত্রি
কানাই	হরিপদর বন্ধু
ব্রজেন	পাশের ঘরের ভাড়াটে
প্রশান্ত	জনৈক যুবক
অজিত	গুরুপদর বন্ধু
শুভেন্দু	ঐ

সময়—সন্ধ্যা

[বস্তি বাড়ীর একটি ঘর। ঘরের মাঝখানে দেওয়াল ঘেঁষে একটি চৌকি পাতা। চৌকির শিয়রে বিছানাটা গোটান রয়েছে। দেওয়ালে একটা পুরানো ক্যালেণ্ডার। ক্যালেণ্ডারের ছবিটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। চৌকির শিয়রের দিকে একটি টেবিল। টেবিলের ওপাশে একটি চেয়ার। টেবিলের উপর কিছু বইপত্র ও দোয়াত কলম। দেওয়ালে একটি দড়ি টাঙ্গান তাতে কিছু পুরান জামা কাপড় ঝুলছে।

গুরুপদর বাবা বৃদ্ধ শিবপদবাবু দাড়তে ঝোলান একটি জামার পকেট হাতড়াচ্ছেন। এমন সময় ঘরের ডানদিকে বাইরে যাতায়াতের যে দরজা সেই দরজা দিয়ে শিবপদবাবুর ছোট ছেলে হরিপদ হাতে একটা ঠোঙা নিয়ে প্রবেশ করল। শিবপদবাবুর কাজ দেখে একটু থমকে দাঁড়াল, তারপর বাঁ দিকের দরজা দিয়ে রান্নার খুপরিতে যেতে যেতে প্রশ্ন করল—]

হরিপদ ॥ ওকি করছ বাবা ?

শিবপদ ॥ দেখছি।

হরিপদ ॥ ছেঁড়া জামার আর দেখবে কী ?

শিবপদ ॥ পকেট।

[পকেটে কিছু না পেয়ে শিবপদবাবু বিরক্ত হলেন]

হরিপদ ॥ পকেট হাতড়ে কিছু পাবে না।

[হরিপদ বাঁদিকের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল। শিবপদবাবু পকেট খোঁজা ছেড়ে বিরক্তি সহ চড়াগলায় হরিপদকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন]

শিবপদ ॥ হ্যাঁ, সব গড়ের মাঠ। তোরাতো সব এক একটা লক্ষ্মীর বর-পুত্তুর। খাওয়া-পরাটা বাদ দিয়ে সব সুখেই আছিস, আমাকেও রেখেছিস বহাল-তবিয়তে।

[হরিপদ হাত মুছতে মুছতে বাঁদিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল।]

হরিপদ ॥ বাজারের হালচাল বুঝছনা ? করবটা কি ?

শিবপদ ॥ কিছুই করতে হবেনা, তিনটে নয়া পয়সা দে।

হরিপদ ॥ সমস্ত ঘর ঝ্যাঁটালেও একটা ফুটো পয়সা পাবেনা, তার আবার তিনটে নয়া পয়সা—

শিবপদ ॥ তিনটে নয়া পয়সা নেই ?

হরিপদ ॥ কিচ্ছু নেই।

[শিবপদবাবু রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন]

রান্নাঘরে কি করতে যাচ্ছো ?

শিবপদ ॥ তাতে তোর দরকার কি ?

হরিপদ ॥ দরকার আছে। তোমার সেই ওল্ড্ স্টক্ ফিনিস্ড্।

শিবপদ ॥ তার মানে !

হ্রিপদ ॥ পরশু থেকে আজ পর্য্যন্ত খেলে কি? সেই পয়সা দিয়েই তো তেল নুন ঝাল এই সব কিনতে হ'ল।

শি পদ ॥ আচ্ছা, আঁতিপাতি কোথাও কি কিছু তোরা রাখবি না?

হ পদ ॥ দরকার ছিল, নজরে পড়ল, দুদিন চলল।

শি পদ ॥ পরের দিনগুলো কি করে চলবে?

হ পদ ॥ দাদা জানে।

শি পদ ॥ না, আমি জানি।

হ পদ ॥ জানো তো বলো?

শিবপদ ॥ না খেয়ে চলবে। আবার কি?

[শিবপদবাবু রাগে গর গর করতে করতে বাইরের দরজার দিকে পা বাড়ালেন কিন্তু হরিপদর প্রশ্নে থমকে দাঁড়ালেন]

হরিপদ ॥ তা এই সন্ধ্যেবেলায় কি খেতে কোথায় যাচ্ছো?

শিবপদ ॥ খাবি খেতে, যমের বাড়ী।

[রেগেমেগে বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করলেন। হরিপদ টেবিলের বইপত্র গোছাতে গোছাতে বলতে লাগল]

হরিপদ ॥ খুব ভালো জায়গা। ওখানে গেলে আর ফেরা যায় না। কিন্তু তোমাকে তো আবার ফিরতে হবে। ফিরলেও জ্বালা, না ফিরলেও জ্বালা। হাঁড়িতে ভাত নেই, শ্মশান খরচের পয়সা নেই।

[বাইরের দরজা দিয়ে আধাবয়সি রাজমিস্ত্রি অমূল্য প্রবেশ করল]

য ॥ ছোটবাবু।

পদ ॥ কী ব্যাপার? তোমার আবার কি হল অমূল্যদা?

ল্য ॥ বড়বাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

রপদ ॥ দাদা তো এখনও ফেরেনি।

অমূল্য ॥ হ্যাঁ, কর্ত্তাবাবুকে জিজ্ঞেস করলাম, রেগে উঠে বললেন, মরে গেছে।

হরিপদ ॥ যায়নি, যাবে। যা অবস্থা চলেছে, তাতে আর বেশীদিন চলে বেড়াতে হবে না। একেবারে থেমে যেতে হবে।

অমূল্য ॥ যা বলেছ ছোটবাবু। সব কিছু যেন অচল হয়ে যাচ্ছে।

হরিপদ ॥ সব কিছু নয় অমূল্যদা, আমরাই কেবল অচল হয়ে যাচ্ছি। সব চলেছে খুব জোরতালেই। বেড়েই চলেছে দিনের পর দিন।

অমূল্য ॥ হ্যাঁ, তা বেড়ে চলেছে বটে।

হরিপদ ॥ কিন্তু ঝড়ে তো ভাঙ্গছেনা?

অমূল্য ॥ কী ঝড়ে ভাঙ্গবে ছোটবাবু?

হরিপদ ॥ ঐ যারা বেড়ে চলেছে, যারা বড়লোক। "অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙ্গে যাবে, অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।" আমাদের তো ছাগলেই মুড়িয়ে খেয়েছে অমূল্যদা, কিন্তু ওরা ভাঙ্গছে কি?

অমূল্য ॥ এর জবাব ভগবান দিতে পারে ছোটবাবু।

হরিপদ ॥ এই রে—!

অমূল্য ॥ কী হ'ল ছোটবাবু?

হরিপদ ॥ ভগবানকে ডাকলে?

অমূল্য ॥ ডাকবো না? তিনি ছাড়া আর কি কোন পথ আছে?

হরিপদ ॥ তাহ'লে আর দাদার কাছে এসো না।

অমূল্য ॥ কেন, কেন?

হরিপদ ॥ তুমি এসেছ কী করতে? কোন একটা কাজ বাগাতে। ঠিক কিনা? মানে সেই কাজটা যদি দাদা করে দেয়, তাহলে তোমার বড় ভাল হয়?

অমূল্য ॥ হ্যাঁ ছোটবাবু। ছেলেটা পরীক্ষা দেবে, ফী-এর টাকা আমি জোগাড় করতে পারিনি। জানতো কর্ণিক চালিয়ে যা পাই তাতে নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়।

হরিপদ ॥ তাই শিবের কাছে ভিক্ষে?

শ্য ॥ কী করি বল ?

পদ ॥ ধুতরোর বিচি ছাড়া কী কিছু জুটবে ?

ল্য ॥ কী বললে ?

পদ ॥ বলছি কিছু পাও আর চাই না পাও ঐ ভগবানের নামটা দাদার কাছে করোনা।

ল্য ॥ করলে কী হবে ?

পদ ॥ তাড়িয়ে দেবে।

[বাইরের দিক থেকে কানাই-এর ডাক শোনা গেল।]

কানাই [নেপথ্যে] ॥ হরি·· হরি···

হরিপদ ॥ আয় আয়, ঘরে আয়, দাদা নেই।

অমূল্য ॥ আমি তাহলে এখন যাই ছোটবাবু। কিছুক্ষণ পরেই না হয় আসব।

হরিপদ ॥ হ্যাঁ, একটু ঘুরেই এসো।

অমূল্য ॥ তা হ'লে তুমি যা বললে—

হরিপদ ॥ সেই মত চললে হয়তো কিছু হবে।

অমূল্য ॥ বেশ তাই হবে।

[অমূল্য বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল। প্রায় সাথে সাথে সেই দরজা দিয়ে কানাই প্রবেশ করল। বয়স ষোল সতের বছর। হরিপদর সমবয়সি এবং বন্ধু]

কানাই ॥ সত্যি বলছিস গুরুদা নেই ?

হরিপদ ॥ রান্নাঘরে দাদাকে কোনদিন থাকতে দেখেছিস্ ?

কানাই ॥ যাক্ বাঁচা গেল।

[চেয়ারটার উপর গ্যাঁট হয়ে বসল]

হরিপদ ॥ না, বাঁচনি, সটাসট যা বলবার বলে চটাপট্ কেটে পড়।

কানাই ॥ ···কেন, হেন ব্যবহার ?

কী করেছি অপরাধ

তোমার দুয়ারে ?

হরিপদ ॥ দাদা !

[কানাই তড়াক্ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভয় ভয় ভাবে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে প্রশ্ন করল]

কানাই ॥ কোথায় ! এই যে বললি সে নেই ?

হরিপদ ॥ সেটা সত্যি। তবে তার যাওয়া আসারও ঠিক নেই।

কানাই ॥ মানে ?

হরিপদ ॥ শেষ সম্বল সন্ধ্যের টিউশনিটাও বন্ধ হয়ে গেছে। আজকাল যখন তখন বের হয়, যখন-তখন ঢোকে।

কানাই ॥ বলিস কীরে ! মিত্তির বাড়ীর অত মোটা মাইনের টিউশনিটা—

হরিপদ ॥ ছেড়ে দিয়েছে।

কানাই ॥ কেন দিল ?

হরিপদ ॥ মাইনে বাড়াবার কথা বলেছিল, কাজে কাজেই—

কানাই ॥ ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল ?

হরিপদ ॥ হ্যাঁ।

কানাই ॥ আমি তাহলে তাড়াতাড়ি সরে পড়ি। দেখা হলেই বলবে—

হরিপদ ॥ অকাল কুষ্মাণ্ড কেবল দরজায় দরজায়—

কানাই ॥ চাকরীর তাঁবেদারি করবি—

হরিপদ ॥ তবু—

কানাই ॥ খবরের কাগজ বেচবিনা।

হরিপদ ॥ এবার ঠিক করেছি, খবরের কাগজই বেচব।

কানাই ॥ আমি বিড়ি বাঁধব।

হরিপদ ॥ শেখবার পিরিয়ডে খাওয়াবে কে ?

কানাই ॥ সেইতো ভাবনা।

হরিপদ॥ চল, কাল থেকে খবরের কাগজ বিক্রি করবার কারবারে লেগে যাই।

কানাই॥ এই লাস্ট চান্স্। কালকের দিনটা শুধু দেখব। ম্যানেজার বলেছে—

হরিপদ॥ স্ট্রাইকটা আরম্ভ হলেই আমাদের নিয়ে নেবে।

কানাই॥ আরে না, সকালে চল, কাল থেকেই হয়তো কাজে লেগে যেতে পারি।

হরিপদ॥ নীরোদবাবুর বিরোধ ভাবটা কাটালি কী করে কানাই?

কানাই॥ একটা সর্তে রাজী হয়ে।

হরিপদ॥ কী সর্তে?

কানাই॥ মাসে টেন পারসেন্ট কমিশন—ছ'মাস।

হরিপদ॥ শালা খেটে মরব আমরা আর নেপোয় মারবে দৈ? ও কারবারে আমি নেই কানাই।

কানাই॥ নীতিবাগীশ! তুমি থামো। একে পাচ্ছিনা, কী পাচ্ছিনা, তার হিসেব করছি।

হরিপদ॥ তাই বলে—

কানাই॥ কোন্ শালা খেতে দিচ্ছেরে? ওসব ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের ভার নিজের কাঁধে নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করিসনা। যদি কাজটা হয়, তুই গুরুদাকে একটু সাহায্য করতে পারবি। আমিও বুড়ো বাপ পেটে দু'মুঠো দিতে পারব।...কীরে চুপ করে রইলি যে? আরে আমরা তো সব এক একটা বিদ্যের জাহাজ M. A., P. R. S., Ph. D (London), নন্-ম্যাট্রিক চনচন্। কিন্তু গুরুদা? সে তো একটা দিকপাল বিদ্যেধর। জানিস, কাল সকালে সে শিয়ালদর ফুটপাতে খবরের কাগজ বেচছিল?

[হরিপদ চমকে উঠল]

হরিপদ॥ কানাই।

কানাই ॥ হ্যাঁ, আমি নিজের চোখে দেখেছি। যাক্, কাল সকালে গেটের কাছে হাজির থাকিস।

হরিপদ ॥ কার্ডটা সঙ্গে নেব কী?

কানাই ॥ কমিশনের চাকরিতে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের কোন বন্ধুত্ব নেই, বুঝলি? [হঠাৎ বাইরের দরজার দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখল] ঐ গুরুদা আসছে, আমি কাটলাম। সময় মত যাস্।

[কানাই তাড়াতাড়ি একরকম পালিয়ে গেল ; গুরুপদ প্রবেশ করল। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের যুবক সে। বেকারত্বের ছাপ সারা শরীরে বর্তমান। তার জামায় রক্তের দাগ]

গুরুপদ ॥ জানিস হরি, আজ একটা বিরাট ঘটনা ঘটে গেল।

হরিপদ ॥ এ কীরে দাদা? তোর সারা জামায় রক্তের দাগ কেন?

[গুরুপদ ধীরে ধীরে চেয়ারটায় বসে শরীরটা এলিয়ে দিল]

গুরুপদ ॥ সেই কথাই তো বলছি। একটা বিরাট এ্যাক্সিডেণ্ট।

হরিপদ ॥ এ্যাক্সিডেণ্ট!

গুরুপদ ॥ না না আমার না, একটা শিশুর! এই ঘণ্টাখানেক আগে বুঝলি? ফুটপাত দিয়ে আসছি, দেখি একটা লোক প্যারামবুলেটারে করে একটা শিশুকে নিয়ে রাস্তা ক্রস করছে। ওদিকে ভীষণ স্পীডে একটা জীপগাড়ী মোড় ঘুরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেই প্যারামবুলেটারের উপর—।

হরিপদ ॥ ইস্!

গুরুপদ ॥ উঁহু হু, না না না, আমি তার একটু আগেই দেখতে পেয়ে বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। হঠাৎ নিজের মধ্যে কী যে হয়ে গেল, বুঝলি হরি, কী যে হয়ে গেল, ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। দেখলাম আমি, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি, সেই চাকর, সেই প্যারামবুলেটার সব নিয়ে ছিটকে পড়েছি ওদিকের ফুটপাতে।

হরিপদ ॥ সর্বনাশ!

শুরুপদ ॥ হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড। মুহূর্তের মধ্যে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা। লোকে লোকারণ্য। হাত পা ঝেড়ে উঠে দেখি লোকটা উঠে বসে হকচকিয়ে রয়েছে, শিশুটা রয়েছে চিৎ হয়ে। মাথা দিয়ে রক্ত ঝরছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে বুকে তুলে নিলাম। নেড়ে চেড়ে দেখি···

হরিপদ ॥ মরে গেছে।

শুরুপদ ॥ নারে না। ও আলাদা জাত অত সহজে মরে না।

হরিপদ ॥ মরেনি! যাক্ বাবা। তারপর কী করলি?

শুরুপদ ॥ সামনের একটা ডিস্‌পেনসারী থেকে ফার্ষ্ট এডের কাজটি সেরে বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে আসতে হ'ল।

হরিপদ ॥ বাড়ীতে গিয়ে দিয়ে এলি?

শুরুপদ ॥ হ্যাঁ, লোকটা মানে চাকরটা কিছুতেই ছাড়ল না। চাকরী যাবার ভয়।

হরিপদ ॥ কিন্তু এত বড় দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়া তোর উচিত হয়নি দাদা।

শুরুপদ ॥ তাহলে যে বাচ্চাটা মরে যেত

হরিপদ ॥ তাই বলে এতবড় রিস্ক্ নিবি?

শুরুপদ ॥ আরে, ওদের বাঁচাবার জন্যেই তো আমাদের জন্ম। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানিস? যে বাড়ীটায় গিয়ে উঠলাম, দেখি সেটা শুভোর বাড়ী।

হরিপদ ॥ শুভো?

শুরুপদ ॥ শুভেন্দু। আমাদের কলেজ লাইফের বন্ধু।

হরিপদ ॥ ও তোমার সেই বড়লোক বন্ধু?

শুরুপদ ॥ হ্যাঁ, বড়লোক বন্ধু শুভেন্দু। বাচ্চাটা তার। বৌটা কেঁদে কেটে একাকার। সান্ত্বনার লম্বা চওড়া একটা বক্তৃতা দিয়ে কেটে পড়লাম। কিন্তু জামাটা যে কাচতে হবে হরি। রক্তের দাগগুলো তুলে না ফেললে তো কাল বাইরে বেরুতে পারব না।

হরিপদ ॥ খুলে দাও। আমি ধুয়ে দিচ্ছি।

গুরুপদ ॥ সাবান আছে?

হরিপদ ॥ দেখি, আছে বোধহয় একটু আধটু।

[গুরুপদ গা থেকে জামা খুলে দিল হরিপদ জামা নিয়ে ভিতরে যাবার জন্য পা বাড়াল।]

গুরুপদ ॥ দাঁড়া দাঁড়া।

[হরিপদর হাত থেকে জামাটা নিয়ে পকেট থেকে পয়সা বের করে ট্যাঁকে গুঁজল। তারপর জামাটা ফিরিয়ে দিল]

হ্যাঁরে সরষের তেল আছে?

হরিপদ ॥ কেন?

গুরুপদ ॥ বুকটা ব্যথা করছে। যে ভাবে পড়েছিলাম, একটু মালিশ করলে ভাল হ'ত।

হরিপদ ॥ রান্না করে মালিশ করবার মত থাকবে না।

গুরুপদ ॥ ঠিক আছে যা। ও ব্যথা পুষে রাখলেই চলবে।

হরিপদ ॥ ক'টা পয়সা দে না।

গুরুপদ ॥ কেন?

হরিপদ ॥ দুটো আলু আনতাম, আলু পোস্তর চচ্চড়ি আর ডাল।

গুরুপদ ॥ আর কিছু দিয়ে ম্যানেজ করতে পারিস না?

হরিপদ ॥ শুকনো ঝিঙে আছে দুটো।

গুরুপদ ॥ ফার্স্ট ক্লাস। ঐ দিয়ে চালিয়ে দে।

হরিপদ ॥ ঝিঙে দিয়ে?

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ, ঝিঙে পোস্তর চচ্চড়ি, আর ডাল। বাবা আবার না ক্ষেপে যায়।

হরিপদ ॥ ক্ষেপে গেছে।

গুরুপদ ॥ কারণ?

হরিপদ ॥ তাকের কোণে, লঙ্কার কৌটোর তলায় লুকিয়ে রেখেছিল যে পয়সাগুলো—

গুরুপদ ॥ সে গুলো তুমি ম্যানেজ করেছ ?

হরিপদ ॥ হঁ্যা, চালাতে হবে তো ?

গুরুপদ ॥ ঠিক আছে। আমি খেতে বসে বাবাকে ম্যানেজ করবখন। আজকের রাতটা টেনেটুনে চালিয়ে দে।

[হরিপদ বাঁদিকের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল। নেপথ্যে নারীকণ্ঠের কাশির শব্দ শোনা গেল। গুরুপদও কাশতে লাগল]

জ্যালা জ্বালাতনে পড়া গেল। ব্রজেনবাবু, ও ব্রজেনবাবু—

ব্রজেন [নেপথ্যে] ॥ কী বলছেন গুরুপদবাবু— ?

গুরুপদ ॥ আরে শুনে যান মশাই। শীগ্‌গীর শুনে যান। এতদিন পরে এদের জন্যেই ঘর ছাড়তে হবে দেখছি।

[বাইরের দরজা দিয়ে ব্রজেনবাবু প্রবেশ করল। সমস্ত শরীর দারিদ্র্যের ছাপ প্রকটভাবে প্রকাশ। বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে]

ব্রজেন ॥ কী হল ?

গুরুপদ ॥ কী ভেবেছেন বলুন তো ? কতদিন বলেছি ভাল ডাক্তার দেখান, চিকিৎসা করান, না হয় টনসীলটা অপারেশান করান। আমাকে জ্বালিয়ে মারছেন কেন ? সামান্য সময়ের জন্যে বাড়ীতে থাকি তাতেও বাধ সাধবেন ?

ব্রজেন ॥ গুরুপদবাবু—

গুরুপদ ॥ বলেছিতো মশাই এ আমার এক রকম রোগ এসে দাঁড়িয়েছে। কাশি শুনলেই কাশি পায়।

ব্রজেন ॥ ভাল ডাক্তারই দেখিয়েছি গুরুপদবাবু—ডাঃ শর্মা।

গুরুপদ ॥ দেখিয়েছেন ? তাহ'লে এ সুবুদ্ধিটা হয়েছে এতদিনে ? কী বললেন তিনি ?

ব্রজেন ॥ আমার স্ত্রীর ক্ষয়রোগ হয়েছে গুরুপদবাবু।

গুরুপদ ॥ এঁ্যা!

ব্রজেন ॥ হ্যাঁ, খুব কঠিন ভাবেই ধরেছে। আজই X-Ray রিপোর্ট পেলাম। এতদিন ষষ্ঠীবাবু ভুল চিকিৎসা করেছেন।

গুরুপদ ॥ ষষ্ঠীবাবু ভুল চিকিৎসা করেছেন? না না, খাঁটি চিকিৎসা করেছেন তিনি। হাতুড়ে বললে কী হবে, অভিজ্ঞতা আছে তাঁর।

ব্রজেন ॥ একি বলছেন আপনি?

গুরুপদ ॥ ঠিকই বলছি ব্রজেনবাবু, ঠিকই বলছি। রোগ তিনি ঠিকই ধরেছিলেন। চিকিৎসাও করেছেন একেবারে ঠিক ঠিক।

ব্রজেন ॥ ঠিক চিকিৎসা করেছেন উনি?

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ, উনি বুঝেছিলেন এ রোগ চিকিৎসা করার ক্ষমতা আপনার নেই। নেই যখন, তখন টনসীলের জন্য হোমিওপ্যাথি পুরিয়া দিতে দোষ কী?

ব্রজেন ॥ তাই যদি হয়, তাহলে সেটা ক্রাইম গুরুপদবাবু। আমাকে চিকিৎসা করবার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল তাঁর।

গুরুপদ ॥ তাহলে ধনেপ্রাণে মারা যেতেন। এখন শুধু প্রাণেই যাওয়া হবে। সেটা অনেক ভালো।

ব্রজেন ॥ আপনি কী মানুষ মশাই? এমন কথাতে আমি কল্পনাও করতে পারিনা!

গুরুপদ ॥ আরে মশাই যে যাচ্ছে তাকে যেতে দিন এই কুৎসিত সুন্দর দুনিয়া থেকে যে যত তাড়াতাড়ি যেতে পারে সে তত বেশী ভাগ্যবান।

ব্রজেন ॥ আচ্ছা, চলি মশাই।

গুরুপদ ॥ কথাটা খুব তেতো লাগল, না?

ব্রজেন ॥ ছ'ছটা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সংসার করি। এ অবস্থায় যদি একজন

চলে যান, তাহ'লে সে যে আমার কত বড় দুর্ভাগ্য সে আপনি বুঝবেন না।

গুরুপদ ॥ যেহেতু আমি ব্যাচেলার সেই হেতু আপনার অবস্থা আমি রিয়েলাইজ করতে পারব না। এই তো আপনার বক্তব্য ?

ব্রজেন ॥ ঠিক তাই।

গুরুপদ ॥ বুঝতে পারি। সব বুঝতে পারি। কিন্তু বুঝে কী করতে পারি ? কিছুই না। অবশ্য পরামর্শ দিতে পারি, গুরুতর পরামর্শ। কী বলতে পারি জানেন ? বলতে পারি যে যাচ্ছে সে যাক্। তাকে ধরে রাখবার নিষ্ফল চেষ্টা করে নিজেকে খোঁড়া না করাই ভাল।

ব্রজেন ॥ আপনার চিন্তাধারা নিয়ে আপনি থাকুন মশাই। তার সাথে তাল রেখে চলবার মত মনের অবস্থা এখন আমার নেই। চলি।

[ব্রজেন ক্ষুব্ধ অন্তরে বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল। গুরুপদ ব্যথিত অন্তরে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে উত্তেজিত হয়ে পড়ল]

গুরুপদ ॥ মূক মৌন বিবসন
জীবনের অহল্যা পাথরে,
বঞ্চনার বারি বিন্দু
গণ্ড হতে ধীরে ধীরে ঝরে।
গতানুগতিক দিন
আয়ু ক্ষীণ
আশা ভরসার কথা
ব্যর্থ হয় বিশাল অম্বরে।

তবু এরা স্বপ্ন দেখবে। স্বপ্নের গলার টুঁটি চেপে ধরতে পারবে না। সাহস নেই। তিলে তিলে মরবে, তবু এ্যাকেবারে মরবে না। বাঁচবার সিঁড়িগুলো ভাঙবার জন্তে জন্মেছে সব।

[সাহেবি পোশাকে গুরুপদর সমবয়সি বন্ধু অজিত একটু আগে বাইরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে চুপচাপ হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইল, তার উপস্থিতি গুরুপদ জানতে পারল না]।

অজিত ॥ কারা বাঁচবার সিঁড়ি ভাঙবার জন্যে জন্মেছেরে।

গুরুপদ ॥ আমরা। আমাদের অর্বাচীন বংশধরের দল। একা মরবে না, সব গুলোকে নিয়ে...

[হঠাৎ গুরুপদর কথা থেমে গেল। খটকা লাগল। কার সাথে কথা বলছে সে। ঘুরে অজিতকে দেখে চমকিত হল]

একি, অজিত! আরে অজিত তুই।

অজিত ॥ হ্যাঁরে, আমি।

গুরুপদ ॥ তুই! তুই কবে ফিরলি?

অজিত ॥ কবে নয়, বল কতদিন। তবে হ্যাঁ, বাংলায় এসেছি আজ। এসেই তোর কাছে চলে এলাম।

গুরুপদ ॥ বোস, বোস।

[অজিত চেয়ারে বসল, গুরুপদ চৌকির উপর বসল।]

অজিত ॥ তোর উগ্র ভাবটা আজও যায়নি দেখছি। একা একাই বকে চলেছিস।

গুরুপদ ॥ ওটা জন্মগত অধিকার। এক স্তরের মানুষ কথা বলে কাপড় পরিয়ে, ভিতরে থাকে কুৎসিত রোগ আর এক স্তরের মানুষের কথাগুলো সব ন্যাংটা, তাই ঘা-টা লাগে দমকা আঘাতের মত। হয় থমকে দাঁড়ায়, না হয় নাক শিঁটকে পালায়। কিন্তু ওসব কথা থাক। কেমন আছিস বল্।

অজিত ॥ ভালই।

গুরুপদ ॥ দেহের ভালো তো দেখতেই পাচ্ছি। মনের কথা বল্। মান মর্য্যাদার ওজন কত মন বাড়ল, তার কথা বল।

অজিত ॥ আমেরিকা থেকে R. P. E Factory-র Engineer এর পদ নিয়ে এলাম বম্বে। মাসখানেক ছিলাম সেখানে। কাল থেকে কোলকাতার যেন ফ্যাক্টরীর চীফ Engineer-এর দায়িত্ব নিতে পাঠিয়ে দিল এখানে।

গুরুপদ ॥ যাক্ এতদিন পর গোত্রগণ্ডি কাটালি! দোতলা ছেড়ে উপর তলায় উঠলি!

অজিত ॥ তাহ'লে সকালে এখানে ল্যাণ্ড করে সন্ধ্যেতেই তোর কাছে আসতাম না।

গুরুপদ ॥ রাগ করলি?

অজিত ॥ তোর উপর রাগ করে কী হবে?

গুরুপদ ॥ কিছু হোক আর চাই না হোক্, রাগতে তোকে দেব না। হরি—, হরি—,

হরিপদ [নেপথ্যে] ॥ যাই দাদা।

গুরুপদ ॥ তাড়াতাড়ি আয়।

[হরি বাঁদিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল]

হরিপদ ॥ কী বলছ?...আরে অজিত দা!

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ, অজিতদা এসেছে, অনেকদিন পর সুদূর আমেরিকা থেকে। অতএব আতিথেয়তায় যেন কোন ত্রুটি না হয়। চটপট পচার দোকানে গিয়ে দু'কাপ ডবল হাফ।

হরিপদ ॥ যাচ্ছি।

[চৌকির নীচে একটি এ্যালুমনিয়মের মগ ছিল। সেটা বের করে নিয়ে বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'ল, কিন্তু গুরুপদর কথায় থেমে গেল]

গুরুপদ ॥ বাবা তো নেই?

হরিপদ ॥ নেই, কিন্তু আমি আছি।

গুরুপদ ॥ ঠিক আছে, ডবল হাফ দু'টো ট্রিপল কাপে চলবে।

হরিপদ ॥ আচ্ছা, আপনি বসুন অজিতদা। আমি এখুনি চা নিয়ে আসছি।

অজিত ॥ আচ্ছা।

হরিপদ বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল।]

গুরুপদ ॥ চার বছর পর ফিরলি, প্রথমেই এলি আমার বাড়ী। সহজভাবে তোকে স্বাগত জানান আমার উচিত ছিল, কিন্তু পারিনি। ট্যারা চোখ আর ব্যাঁকা বচন নিয়ে পথ চলে চলে সৌজন্যবোধকে ধুলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। কী করি বল?

অজিত ॥ কিচ্ছু করতে হবে না। এখন কী করছিস তাই বল।

গুরুপদ ॥ যখন সমুদ্র পাড়ি দিলি, তখন যা করছিলাম, আজও তাই করি।

অজিত ॥ তার মানে?

গুরুপদ ॥ মানে আর কী? চাকরী খোঁজার চাকরী নিয়ে স্যাণ্ডেল ছিঁড়ছি।

অজিত ॥ ও, তাহ'লে বিয়েথাও করিসনি?

গুরুপদ ॥ না।

অজিত ॥ মাকে দেখছি না, তিনি কোথায়।

[গুরুপদ এ প্রশ্নে চমকে উঠল, ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্তেজিত হ'ল। সে উত্তেজনা দমন করে সহজভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে বলল]

গুরুপদ ॥ উপরে। [অজিত গুরুপদর চাউনিকে অনুসরণ করে দেখল টালির চাল। বুঝল সব। ব্যথিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল]

অজিত ॥ ওঃ, কতদিন?

গুরুপদ ॥ দু'বছর।

অজিত ॥ কী হয়েছিল? কিসে মারা গেলেন?

[গুরুপদ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, অভিমানে, রাগে দুঃখে যেন ফেটে পড়ল]

গুরুপদ ॥ খিদে পেয়েছিল, না খেয়ে মারা গেলেন।

অজিত ॥ গুরুপদ!

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ রে! বাবার চাকরী নেই, আমি বেকার, হরি ছাত্র, মার অসুখ। বুঝতেই পারছিস।

অজিত ॥ তোর মনে ব্যথা দেবার জন্যে আমায় ক্ষমা কর গুরু।

গুরুপদ ॥ না, ব্যথা আমি পাইনি, কিন্তু ক্ষোভ রয়েছে বুক ভরে। জোয়ান ছেলে আমি, মা আমার চিকিৎসার অভাবে, পথ্যের অভাবে হৃৎপিণ্ডকে থামিয়ে দিল। কি করতে পেরেছি?

অজিত ॥ ও কথা থাক গুরু।

গুরুপদ ॥ কাঁদিনি, চোখের জল ফেলিনি, পুড়িয়ে এলাম মাকে কঠিন কঠোর মন নিয়ে, কিন্তু যখন পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করাল—

[বলতে বলতে গুরুপদ চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বলতে বলতেই আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ঘরের এক কোণে]

আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূক নিরাশ্রয়
ইদং নীর মিদং ক্ষীর স্ন্যাত্ত্যা পিত্ত্যা সুখি ভবঃ
শ্মশান নল দগ্ধমি প্রতি প্রাপ্তসি বান্ধব
ইদং নীর মিদং ক্ষীর স্ন্যাত্ত্যা পিত্ত্যা সুখি ভবঃ।

তখন আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। হু হু করে কান্নার বন্যায় বুক আমার ভেসে গিয়েছিল। একটু গঙ্গার জল, জল যেখান সামান্য কাঁচা দুধে তার সারা জীবনের উপোসী পেটটাকে আমি ভরিয়ে দিয়েছি।

অজিত ॥ তুই কাঁদছিস?

গুরুপদ ॥ মার জন্যে আমার কান্না আসে অজিত। মা, যার কোন দাবী ছিল না, ভালমন্দ খাবার কোন স্পৃহা ছিল না, নির্লিপ্ত, নীরব ছিল যার অবস্থিতি, যে আর কিছু চায়নি, শুধু দেখতে চেয়েছিল এই সংসারে সামান্য সাচ্ছল্য, সেই মার জন্যে আমার কান্না আসে অজিত।

[হঠাৎ হরিপদ কাচুমাচু ভাবে বাইরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল]

হরিপদ ॥ দাদা।

[গুরুপদ দ্রুত নিজেকে সহজ করে নিয়ে ফিরে দাঁড়াল।]

গুরুপদ ॥ কী রে ? চা আনলি না ?

হরিপদ ॥ এদিকে শোন্।

গুরুপদ ॥ বল না কী হয়েছে ?

হরিপদ ॥ শোন্ না।

গুরুপদ ॥ পচা ধারে চা দেয়নি, এই তো ?

হরিপদ ॥ হ্যাঁ। আর দেবেই বা কেন ? বাবা এক্ষুনি এক কাপ চা ধারে খেয়েছেন, ক্ষেপে গেছে পচাদা।

গুরুপদ ॥ দেখছিসতো জীবন কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে ? একদিন যে ঋণ মুক্ত হতে পারি, সে বিশ্বাসও ওদের আর নেই।

[গুরুপদ ঐ কথাকটি অজিতকে উদ্দেশ্য করে বলল। অজিত মাথা নীচু করল। গুরুপদ ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করে হরিকে দিল]

যা, নিয়ে আয় তাড়াতাড়ি।

[হরিপদ বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল]

অজিত ॥ কী দরকার ছিল ? বাধা দিলে ক্ষেপে যাবি তাই চুপ করে ছিলাম। চা তো আমি খেয়ে এসেছি।

গুরুপদ ॥ তা হোক্—।

[ধীরে ধীরে রাজমিস্ত্রি অমূল্য বাইরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল]

এসো অমূল্যদা, কী খবর ?

[গুরুপদ আবার চৌকির উপর বসল]

অমূল্য ॥ খবর একটা আছে বড়বাবু। দায়ে না পড়লে তোমার কাছে আসি না, সে তো তুমি জানো।

গুরুপদ ॥ তাতো জানলাম। কিন্তু এটি কে জানো? যেটি তোমার সামনে বসে রয়েছে!

[অমূল্য এতক্ষণ অজিতকে লক্ষ্য করেনি এবার দেখল]

অমূল্য ॥ এই দেখ, এ যে অজিত দাদাবাবু। এতদিন কোথায় ছিলে গো? অনেকদিন তোমায় এ পাড়ায় দেখিনি।

অজিত ॥ বাইরে ছিলাম অমূল্যদা, চার বছর। এই চার বছরে তুমি কিন্তু অনেক বুড়ো হয়ে গেছ।

অমূল্য ॥ আর দাদাবাবু, বয়েস তো হ'ল।

অজিত ॥ গুরু, অমূল্যদাকে নিয়েই তো তুই একটা কবিতা লিখেছিলি, কী কবিতা যেন? সেই যে বলতিস— ?

গুরুপদ ॥ বুড়ো হ'লে অমূল্যদা যা হবে?

অজিত ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কী যেন?

গুরুপদ ॥ আমি দেখি।

আমি দেখি
বস্তির সঙ্কীর্ণ সড়কে
ক্ষুধিত মানুষ চলে ধুঁকে ধুঁকে।
তার দুই চোখে দেখি
বঞ্চনার করুণ চাহনি।
আলো নেই আছে শুধু
গভীর নিকষ অন্ধকার।
মূক আঁখি বলে তার,
জানি, জানি, সব কিছু জানি।
হে বন্ধু, তোমার প্রসার
সহরের সব স্থানে
প্রাচীর তুলেছে বড বড়,

বলতে পারে ?
ঐ ইট চুন বালি
কাদের শক্তিতে হ'লো জড়ো ?
ঐ যে প্রাসাদ সৌধ
মাথা উঁচু করে আছে গর্বে অহঙ্কারে,
কার পদধ্বনি ওর বুকের পাঁজড়ে ?
বার্দ্ধক্যে মাজাভাঙা শিল্পী আজ
ঘোরে পথে পথে,
দু'চোখে অশ্রুঝরে
দু'মুঠো অন্ন নেই পেটে।

অজিত ॥ বাস্তব, চূড়ান্ত বাস্তব গুরু।

অমূল্য ॥ নেই বড়বাবু নেই, দুমুঠো ভাত নেই আমার পেটে।

গুরুপদ ॥ কিন্তু আমি তো তোমার পেট ভরিয়ে দিতে পারব না অমূল্যদা। আমার নিজের পেটই যে খালি।

অমূল্য ॥ সে জন্যে আমি আসিনি। টাকা পয়সা তোমায় দিতে হবে না। শুধু একটা চিঠি লিখে দিতে হবে।

গুরুপদ ॥ চিঠি কাকে লিখতে হবে ?

অমূল্য ॥ পরেশবাবুকে। ছেলেটার পরীক্ষার ফীয়ের ব্যবস্থা করে দেবার একটা চিঠি।

গুরুপদ ॥ তোমার ছেলে পরীক্ষা দেবে ?

অমূল্য ॥ হ্যাঁ, বড়বাবু।

গুরুপদ ॥ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা ?

অমূল্য ॥ তাই হবে বোধ হয়। ঐ রকম নামই করছিল।

গুরুপদ ॥ এ ঘোড়া রোগ তাকে ধরালে কেন অমূল্যদা ?

অমূল্য ॥ জানি বড়বাবু, গরীবের এ ঘোড়া রোগ। কিন্তু আমি এ রোগ ওকে

ধরাইনি। মাথায় একটু লম্বা হয়েছে যেই, তখুনি নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেছি। কাজে লাগিয়ে দিয়েছি। তা না হ'লে সংসার চলে না বড়বাবু। ছেলেটা আমার খাটে, সমানে খাটে, আর রাতের বেলায় পড়ে। কারো সাথে খুব একটা কথাবার্তা নেই। নিজের মনে চলে। আজ সাত দিন হ'ল হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছে, পরীক্ষা দেবে। বড় ভাবনায় পড়ে গেছি বড়বাবু।

অজিত ॥ খুব মনের জোর তো ছেলেটির।

অমূল্য ॥ হ্যাঁ দাদাবাবু, জীবন আমার খুব খাটে।

গুরুপদ ॥ এ দেশে এসব ট্যালেন্টের কোন স্থান নেই অজিত।

অজিত ॥ তা ঠিক।

গুরুপদ ॥ কিন্তু অমূল্যদা, পরেশবাবু আমার কথা শুনবে না।

অমূল্য ॥ কেন শুনবে না বড়বাবু?

গুরুপদ ॥ সেদিনকার পরেশ আজ পরশমণি হয়েছে বলে।

অমূল্য ॥ কী বললে, বুঝলাম না বড়বাবু।

গুরুপদ ॥ পরেশ বদলিয়ে গেছে অমূল্যদা।

অমূল্য ॥ বদলিয়ে গেছে!

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ।

অমূল্য ॥ তা হ'লে কেন তার হয়ে তুমি খেটেছিলে? কেন বলেছিলে, সে আমাদের উপকার করবে? তাকে ভোট দিলে আমাদের ভাল হবে?

গুরুপদ ॥ ও কথা বলতে হয় বলে।

অমূল্য ॥ ওকথা বলতে হয় বলে?

গুরুপদ ॥ অবাক হ'লে?

অমূল্য ॥ তুমি যে অবাক করলে বড়বাবু!

গুরুপদ ॥ আচ্ছা, তা হ'লে কটা কথার জবাব দাও।

অমূল্য ॥ বল।

গুরুপদ ॥ পরেশকে তুমি, শুধু তুমি কেন, আমাদের এ বস্তির সকলেই চেনে ?

অমূল্য ॥ হ্যাঁ, চেনেই তো, ছোটবেলা থেকেই চেনে।

গুরুপদ ॥ পরেশ গরীব ছিল ?

অমূল্য ॥ ছিলই তো। ওর বাবা একবার ভাঙ্গা মেঝেটা শান করিয়ে নিয়ে তিন মাসে আমাকে টাকা শোধ করেছিল। কিন্তু এসব কথা কেন বড়বাবু ?

গুরুপদ ॥ কষ্ট করে সে লেখাপড়া শিখেছিল ?

অমূল্য ॥ হ্যাঁ, ভীষণ কষ্ট করতো। ছেলে পড়িয়ে সেই পয়সায় নিজে পড়াশুনো করত।

গুরুপদ ॥ কিন্তু গরীবের ছেলেকে বিনে পয়সায় পড়াতো ?

অমূল্য ॥ তা পড়াতো। আমার জীবনকে তো ঐ অক্ষর পরিচয় করিয়েছে।

গুরুপদ। পাড়ায় কারো বাড়ীতে অসুখ বিসুখ হ'লে রাত জেগে সেবা করতো। কেউ মরলে আর সকলের সঙ্গে সেও মড়া কাঁধে করে শ্মশানে যেতো ?

অমূল্য ॥ হ্যাঁ বড়বাবু, এ গুণ তার ছিল, সে কথা না বলে উপায় নেই।

গুরুপদ ॥ নর্দমার ময়লা, রাস্তার আবর্জনা নিজে হাতে পরিষ্কার করেছে ?

অমূল্য ॥ হ্যাঁ, তাও করেছে।

গুরুপদ ॥ একদিন নয় দুদিন নয়, বহুবার বহুদিন করেছে।

অমূল্য ॥ সেই জন্যেই তো তাকে ভোট দিয়েছিলাম। সে আমাদের ভাল করবে বলে।

অজিত ॥ তাহলে গুরুকে দুষছ কেন অমূল্যদা ? তোমরাইতো তাকে দাঁড় করিয়েছ।

অমূল্য ॥ ছি ছি, বড়বাবুকে দুষছিনা দাদাবাবু। ভোটাভোটির সময় বড়বাবুই বাড়ী বাড়ী গিয়ে তার কথা বলেছিল বলেই বলছি।

[হরিপদ বাইরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল, তার হাতের মগে চা মিষ্টি, ও তিনটি খুরি।]

গুরুপদ ॥ ওর থেকে অমূল্যদাকে একটু দে।

অমূল্য ॥ না, না ছোটবাবু আমায় দিতে হবে না। আমি খাব না।

গুরুপদ ॥ খাও, খাও। একটু গরম জলে ভাগ বসালে রাগ করব না।

[হরি সকলকে খুরিতে করে চা দিয়ে নিজে মগে চুমুক দিতে দিতে ভিতরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল]

অজিত ॥ পরেশের জন্যে এই ক্যাম্পেন করেছিলি নাকি ?

গুরুপদ ॥ পাঁচু মুদির ধারের কলে আটকেপড়া বস্তির মানুষগুলোকে বুঝতে হয়েছিল।

অজিত ॥ কেন,পাঁচু মুদিও দাঁড়িয়েছিল ?

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ, সেই জন্যেইতো পরেশের হয়ে খাটতে হয়েছিল! কিন্তু অমূল্যদাদের দল তার উপর যে উপকারের আশা করেছিল, আমি তা করিনি। আমি বিচার করে দেখেছিলাম, ব্যবসা করবার মূলধন সে যোগাড় করেছে কিনা ?

অজিত ॥ এ কি বলছিস তুই ?

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ, অজিত, রাজনীতি করা একটা ব্যবসা, আর সে ব্যবসার মূলধন কী জানিস ?

অজিত ॥ কী ?

গুরুপদ ॥ পপুলারিটি, হোয়াট পপুলারিটি হি গেন্ড।

অমূল্য ॥ পরেশবাবু, বড়বাবুকে খুব মান্যি করে।

অজিত ॥ তাই নাকি ?

অমূল্য ॥ করবেনা ? সে তো জানে বড়বাবুর জন্যেই সে বড় হয়েছে। সেই জন্যেই একটা চিঠি নিতে এলাম। বড়বাবুর চিঠি দেখলে পরেশবাবু একটা না একটা ব্যবস্থা করবেই।

গুরুপদ ॥ বোধহয় করবেনা।

অমূল্য ॥ এ কথা তোমার ঠিক নয় বড়বাবু।

গুরুপদ ॥ বেশ একটু বস, লিখে দিচ্ছি। আমার কথা ঠিক কিনা বুঝতে পারবে।

অমূল্যদা, যে লোক এক সময় দাদা, দাদা করতো সে লোকের মোটর পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে যায়, চোখে চোখ পড়লে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আমার চিঠির মূল্য সে যে কতটুকু দেবে তা আমিই জানি।

অজিত ॥ বলিস কীরে ? খরোলি চেঞ্জড্ ?

গুরুপদ ॥ বদলাবেনা ? পাড়া ছেড়েছে, বড়লোকদের পাড়ায় বাড়ী করেছে, দেশ নেতা মানুষ, তার সোসাইটিই আলাদা, এ্যাণ্ড ছাট ইজ ন্যাচারাল।

অমূল্য ॥ তা হলে সে কী সত্যি সত্যিই তোমার কথা শুনবেনা ?

গুরুপদ ॥ গিয়ে দেখ কী হয়। এ আমার জীবনে এক অদ্ভূত ট্র্যাজিডি অজিত।

অজিত ॥ ট্র্যাজিডি !

গুরুপদ ॥ ট্র্যাজিডি নয় ? যে নিজে রাত পোহালে কীভাবে দিন কাটবে জানেনা, সে আর একজনকে টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে।

অজিত ॥ তা বটে ! আচ্ছা তুই লেখ, আমি চলি।

গুরুপদ ॥ যাচ্ছিস ?

অজিত ॥ হ্যাঁ, আর একদিন আসব। দু'একদিনের মধ্যে পা'রস তো আমার হোটেলে যাস্। গ্র্যাণ্ডে উঠেছি। বার নম্বর স্যুট। দেখি তোর জন্তে কোন একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। [পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে] আর এই টাকা কটা রেখে দে।

[এতক্ষণ টেবিলে কাগজ কলম নিয়ে লিখছিল, এবার অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল গুরুপদ]

গুরুপদ ॥ টাকা ! টাকা কি হবে ?

অজিত ॥ তোর তো টানাটানি চলছে। রাখ্ এটা, আপততঃ চালিয়ে নে।
[লেখা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। গুরুপদ তীব্র দৃষ্টি নিয়ে অজিতের দিকে তাকিয়ে বলল]

গুরুপদ॥ তুইও পরেশের মত বদলিয়ে গেছিস অজিত। তোর মনের আসল মানুষটা বাইরে থেকে ঘুরে এসে মানুষের মর্য্যদা দিতে ভুলে গেছে।

অজিত॥ এ কথা তো আগে বলতিসনা। যখন আমার প্রয়োজনে তুই এগিয়ে আসতিস, তোর প্রয়োজনে আমি ?

গুরুপদ॥ তখন আমরা কেউ জীবন যুদ্ধের সৈনিক ছিলাম না। অন্নের কথা চিন্তা করে হন্নে হয়ে ঘুরে বেড়াতাম না।

অজিত॥ ওঃ আচ্ছা চলি। হ্যাঁ, চাকরীটি যদি জোগাড় করতে পারি সেটা করবি তো ?

গুরুপদ॥ না। নিজের যোগ্যতায় যা জোটে তাই ভাল। আমার জন্যে সুপারিশ তুই করিসনা।

অজিত॥ তোর বাড়াতে আবার আসব তো ?

গুরুপদ॥ অজিত!

অজিত॥ তুই আগের চেয়ে অনেক কঠিন হয়ে গেছিস গুরু।

[অজিত ধীরে ধীরে বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল। এদের ভাবসাব দেখে অমূল্য কেমন যেন বিব্রত]

অমূল্য॥ বড়বাবু ফিরিয়ে দিচ্ছ? যে টাকা দিচ্ছে, সে টাকা তুমি ফিরিয়ে দিচ্ছ ?

[গুরুপদ অমূল্যর কথা শুনে মুহূর্তের মধ্যে কি যেন ভেবে নিল। তারপর বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে জোরগলায় অজিতকে ডাকল]

গুরুপদ॥ অজিত, অজিত শোন।

[অজিত বাইরের দরজা দিয়ে পুনরায় প্রবেশ করল]

দে টাকাগুলো দে।

[অজিত টাকা দিল গুরুপদ সেই টাকা নিয়ে অমূল্যকে দিল। অজিত যেন চাবুকের আঘাত সইতে না পেরে দ্রুত প্রস্থান করল]

এই নাও অমূল্যদা, তোমার ছেলেকে দিও।

অমূল্য ॥ না গো বড়বাবু না। আমি একথা বলিনি।

গুরুপদ ॥ কিন্তু আমি যে কথা বলছি সেই কথা শোন। যাও বাড়ী যাও।

অমূল্য ॥ বাড়ী যাব ?

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ, বাড়ী যাবে।

অমূল্য ॥ এই টাকাগুলো নিয়ে ?

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ, নিয়ে। তোমার ছেলের পরীক্ষার ফী ওতে হয়ে যাবে।

অমূল্য ॥ বড়বাবু, তুমি দেব্‌তা। তুমি দেব্‌তা গো বড়বাবু, তুমি দেব্‌তা ॥

[গুরুপদ এতক্ষণ বাইরের দরজার কাছে এসে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। অমূল্যর কথায় এবার ধমকে উঠল।]

গুরুপদ ॥ কেন গালাগাল দিচ্ছ ?

অমূল্য। না, না। ভুল হয়ে গেছে। ভুল হয়ে গেছে। ওকথা বলবনা। কক্ষণো বলব না। [অমূল্যর চোখে জল। কণ্ঠস্বর ভারি]

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ বলো না। এখন যাওতো। একি ! কাঁদছ কেন ?

অমূল্য ॥ কেন কাঁদছি ? কাঁদছি এই কথা ভেবে যে তুমি বেশী দিন বাঁচবেনা। এই রকম মনের ভাব নিয়ে চললে মানুষ মরে বড়বাবু, মানুষ মরে যায়, বেঁচে থাকেনা।

[অমূল্য কাঁদতে কাঁদতে বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল। নেপথ্য ব্রজেনবাবুর স্ত্রীর কাশির শব্দ। গুরুপদও কাশতে লাগল। দমক সামলে বলল]

গুরুপদ ॥ অমূল্যদা জানে না, আমরা বেঁচে নেই। সেও বেঁচে নেই। আমরা সব মড়া। জ্যান্ত মড়ার মিছিল আমরা··· খক্ খক্ খক্...

[হরিপদ বাঁদিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল]

হরিপদ ॥ দাদা, ঐ রক্তের দাগ উঠল না। ছোপ থেকে গেল।

গুরুপদ ॥ ও আলাদা রক্ত হরি, অত সহজ কাচুনিতে ওঠে না। ঐ মেলে দে।

নেপথ্যে ॥ মাষ্টার মশাই বাড়ীতে আছেন।

[হরিপদ যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল সেই দরজা দিয়ে প্রস্থান করল]

গুরুপদ ॥ কে...? ভিতরে আসুন।

[প্রশান্ত প্রবেশ করল। যুবক সে। সাজ পোষাকে ধনীর ছাপ বর্তমান]

আরে বড়বাবু যে? কী ব্যাপার?

প্রশান্ত ॥ আপনাকে কাল থেকে আমাদের বাড়ীতে যেতে হবে।

গুরুপদ ॥ যেতে পারবনা প্রশান্ত।

প্রশান্ত ॥ কিন্তু অনন্ত যে কিছুতেই বাগ মানছে না। টীচার খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম

গুরুপদ ॥ অনন্তের মত ছাত্রর জন্য অগনিত শিক্ষক অন্তহীন আগ্রহ নিয়ে অনন্তকাল থাকবে প্রশান্ত।

প্রশান্ত ॥ তা হয়ত্তো থাকবে কিন্তু আপনার মত শিক্ষক জুটবে না একজনও।

গুরুপদ ॥ একটু বাড়িয়ে বলছ, না?

প্রশান্ত ॥ না মাষ্টার মশাই। একটুও বাড়িয়ে বলছিনা। ভাই আমার এই পনর দিনে দশ দশজন শিক্ষককে নাস্তানাবুদ করে বরখাস্ত করেছে। আপনার কাছে ছাড়া সে কারো কাছে পড়বেনা।

গুরুপদ ॥ একটু বুঝিয়ে বল, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রশান্ত ॥ ঠিক হবে না মাষ্টার মশাই। আমরা সকলে নাজেহাল হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। আপনি ছাড়া কোন উপায় নেই।

গুরুপদ ॥ কিন্তু আমি যে নিরুপায়।

প্রশান্ত ॥ একটুও সময় নেই আপনার?

গুরুপদ ॥ সময় আমার প্রচুর

প্রশান্ত ॥ তবে?

গুরুপদ ॥ তোমাদের বাড়ীতে টিউশনি আমি করবনা প্রশান্ত।

প্রশান্ত ॥ বুঝতে পারছি আপনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু আমার ভাই কী দোষ করেছে বলুন?

গুরুপদ ॥ প্রশান্ত।

প্রশান্ত ॥ বলুন।

গুরুপদ ॥ আমার বাবা অনেক কষ্ট করে আমাদের বড় করেছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে দু'বেলা দু'মুঠো পেট ভরে খেতে দিতে পারি না। সেই বুড়ো মানুষটা কী দোষ করেছে বলতে পার?

প্রশান্ত ॥ এ প্রশ্নের কী উত্তর দেব?

গুরুপদ ॥ পৃথিবীর কেউ কোনও দোষ করে না। দোষ করায় সমাজ, সংসার, মানুষের আশা আকাঙ্খা।

প্রশান্ত ॥ তা হ'লে সত্যি সত্যি অনন্তের ভার আপনি নেবেন না।

গুরুপদ ॥ না।

প্রশান্ত ॥ বাবা বলেছেন, আপনার পারিশ্রমিকের অঙ্ক তিনি বাড়িয়ে দেবেন।

গুরুপদ ॥ বাবা! তোমার বাবা তো মারা গেছেন।

প্রশান্ত ॥ এ কি বলছেন আপনি?

গুরুপদ ॥ সত্যি প্রশান্ত আমি তার জন্ম খুব দুঃখিত।

প্রশান্ত ॥ কিছু মনে করবেন না, একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি।

গুরুপদ ॥ বল না।

প্রশান্ত ॥ আপনার মস্তিষ্ক বোধহয় সুস্থ নয়।

গুরুপদ ॥ কেন? এ'তক্ষণ তো তোমায় কোন কথার বেঠিক জবাব আমি দিইনি।

প্রশান্ত ॥ তাহ'লে আমার বাবা মারা গেছেন বলছেন কেন?

গুরুপদ ॥ মারা গেছেন বলে।

প্রশান্ত ॥ কিন্তু তিনিই যে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

গুরুপদ ॥ না না, তিনি মারা গেছেন। ব্যোমকেশ মিত্তির বেঁচে থাকতে পারেন না।

প্রশান্ত ॥ আমার সামনে আমার বেঁচে থাকা বাবাকে মৃত প্রতিপন্ন করে আপনার লাভ ?

গুরুপদ ॥ কোনও লাভ নেই প্রশান্ত, কোনও লাভ নেই। কিন্তু যা সত্য, তাকে অস্বীকার করায় ক্ষতি আছে অনেক

প্রশান্ত ॥ তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত জানেন যে তিনি মৃত ?

গুরুপদ ॥ নিশ্চয়ই।

প্রশান্ত ॥ তাহ'লে বোধকরি এটাও জানেন যে কবে তিনি মারা গেছেন ?

গুরুপদ ॥ নিশ্চয়ই জানি আজ থেকে পনরো দিন আগে।

প্রশান্ত ॥ মাষ্টার মশাই।

গুরুপদ ॥ উত্তেজিত হয়োনা প্রশান্ত, শোন, সাড়ে সাত মাস আগে ব্যোমকেশ মিত্তিরের কাছে গৃহশিক্ষক গুরুপদ মুখুজ্জ্যে একটা ন্যায্য দাবী জানিয়েছিল।

প্রশান্ত ॥ কী দাবী ?

গুরুপদ ॥ মাইনেটা বাড়াবার দাবী, খাটুনীটা বেড়েছে বলে।

প্রশান্ত ॥ কী উত্তর পেয়েছিলেন ?

গুরুপদ ॥ ছ মাসের মেয়াদ দিয়েছিলেন তিনি, বিশ্বাস রাখতে বলেছিলেন তাঁর কথার উপর। জীবিত থাকাকালীন ব্যোমকেশ মিত্তিরের কথার খেলাপ হয়না, কথাটা জানিয়ে দিয়েছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় কণ্ঠে, কিন্তু সাত মাসের মাথায় খামের ভিতরে করে প্রতি মাসের মত যে পারিশ্রমিক এল, দেখলাম তা পূর্ববৎ, বুঝলাম ব্যোমকেশ মিত্তির মারা গেছেন।

প্রশান্ত ॥ আপনি কাল আমাদের অফিসে যাবেন। না, অনন্তকে পড়াবার

জন্তে নয়, আপনার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে। সত্যিই তো আপনি কেন ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ?

গুরুপদ ॥ চিরকাল হয়ে আসছি প্রশান্ত। ওটা আমাদের গা-সহা। আর এতে তো আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইনি, বরঞ্চ লাভই হয়েছে বলতে পার।

প্রশান্ত ॥ লাভ হয়েছে !

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ, আক্কেল পেয়েছি। জীবনের কারবারে তোমাদের মত লোকের কথার উপর বিশ্বাস রেখে কোনও কাজ যাতে না করি সে আক্কেল আমার হয়ে গেছে। এটা লাভ নয় ?

প্রশান্ত ॥ আচ্ছা চলি।

গুরুপদ ॥ এসো।

[প্রশান্ত নমস্কার জানিয়ে মাথা নীচু করে ধীরে ধীরে বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল, প্রায় সাথে সাথে সেই পথে শিবপদ প্রবেশ করলেন]

শিবপদ ॥ খোকা তিনটে পয়সা দে।

গুরুপদ ॥ পয়সা আবার কী হবে ?

শিবপদ ॥ বিড়ি ফুরিয়ে গেছে।

গুরুপদ ॥ আচ্ছা বাবা ?

শিবপদ ॥ কী ?

গুরুপদ ॥ তোমার বয়স কত হল ?

শিবপদ ॥ কেন ?

গুরুপদ ॥ বলোনা ?

শিবপদ ॥ তা বাহাত্তর হবে।

গুরুপদ ॥ তাহ'লে তুমি বুড়ো হয়েছ ?

শিবপদ ॥ তাই বলে বাহাত্তুরে হইনি।

গুরুপদ ॥ না, না, সে কথা বলছি না। বলছি তুমি বুড়ো হয়েছ।

শিবপদ ॥ হ্যাঁ, হয়েছি।

গুরুপদ ॥ বুড়ো হলে কী হয়? শিশু হয়। বুড়ো হলে মানুষ শিশু হয়। তুমি এখন শিশু। এ অবস্থায় তোমার বিড়ি সিগারেট খেতে আছে? আমাদের কথা শুনবেনা, কেবল অবাধ্য হবে।

শিবপদ ॥ বাজে বকিস না। থাকে তো দে। না থাকে তো বল্।

গুরুপদ ॥ এই দেখ, তোমরাই যদি এমন ঔদ্ধত্য দেখাও তাহলে ছোটরা আমাদের মানবে কেন বলতো?

শিবপদ ॥ Stupid এত বড় কথা। চাবকে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে দেব। বাপকে শাসন করা হচ্ছে?

[গুরুপদ তাড়াতাড়ি ট্যাঁক থেকে পয়সা বের করে শিবপদবাবুকে দিল। শিবপদবাবু এক রকম ছোঁ মেরে পয়সাটা নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হ'ল]

শিবপদ ॥ দে। না, তোদের কিছু বলাও উচিত নয়। রেগে গিয়ে হয়তো খোরাকটাই বন্ধ করে দিবি। আজকাল তোরা সব পারিস। কিছু বিশ্বাস নেই তোদের, কিছু বিশ্বাস নেই।

[বলতে বলতে বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করলেন। গুরুপদ সামান্য সময় করুণ দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে থেকে আপন মনে আবৃত্তি করতে লাগল]

গুরুপদ ॥ হায় তাতঃ
বুঝিলেনা সন্তানের অন্তরের ব্যথা।
আত্মকেন্দ্রিক মন তব
কুণ্ডলি পাকায় বস্তির অলিতে গলিতে।
বিষাদের হাসি ভিন্ন
অন্য কিছু নাহি ওষ্ঠে মোর,
অন্য কিছু পারিনা বলিতে।

শুভেন্দু॥ [নেপথ্যে] শুরুপদ আছিস—

[হাতে একটা এটাচিকেশ নিয়ে শুভেন্দু হন্ত দুন্ত ভাবে প্রবেশ করল। সে ধনী-সন্তান। তার পোষাক পরিচ্ছদে সে ছাপ বর্তমান। শুরুপদর সে সমবয়সি]

এই যে শুরু—

শুরুপদ॥ আমি জানতাম তুই আসবি। কিন্তু শুভো, আজ আমি বড ক্লান্ত। কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষাগুলো অন্য কোনদিন পথে ঘাটে দেখা হ'লে বলে দিস। আজ বাড়ী যা।

শুভেন্দু॥ পথে ঘাটে দেখা হ'লে কৃতজ্ঞতা জানাব, তুই বলছিল কী শুরু? যেবার মুখে শুনে আমি আর এক মুহূর্ত বাড়ীতে দাঁড়াইনি। ছুটে এসেছি তোর কাছে।

শুরুপদ॥ তাহ'লে বোস্, একটু বিশ্রাম করে নে।

শুভেন্দু॥ না না, বিশ্রামের দরকার নেই।

শুরুপদ॥ তবে কী জন্যে এসেছিস?

শুভেন্দু॥ তোর কাছে সারাজীবন আমি ঋণী হয়ে রইলাম, এই কথাটাই জানাতে এসেছি শুরু।

শুরুপদ॥ ঋণী? কিসের জন্যে ঋণী থাকব? তোর ছেলেকে এ্যাকসিডেন্ট থেকে সেভ করেছি বলে?

শুভেন্দু॥ হ্যাঁ শুরু, হ্যাঁ। বাবলু যদি মারা যেত—

শুরুপদ॥ যেত যেত, তাতে কী হয়েছে? এমনিই তো কত মানুষের কত ছেলে মরে।

শুভেন্দু॥ নারে ঠিক তা নয়। বাবলু মারা গেলে আমার এই বিষয় সম্পত্তি ভোগ করবার কেউ থাকত না।

শুরুপদ॥ শুভেন্দু, তুই আজও সেই ভিত্তিহীন ভাবপ্রবণতা নিয়ে বেঁচে আছিস। এই মন নিয়ে তুই তোর অতবড় ব্যবসা চালাস কী করে?

শুভেন্দু ॥ না, ভিত্তিহীন ভাবপ্রবণতা আমার আর নেই গুরু। বাবা মারা যাবার পর আমাকে দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়েই দাঁড়াতে হয়েছে।

গুরুপদ ॥ আমার বিশ্বাস হয় না। তাই যদি হতিস, তাহলে এখন এইভাবে ছুটে আসতিস না।

শুভেন্দু ॥ আসতাম, নিশ্চয়ই আসতাম, আমার কত বড উপকার যে তুই করেছিস্ জানিস না।

গুরুপদ ॥ জানি, তোর ছেলেটা গাডী চাপা পডছিল, তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি। আর সেই চেষ্টাতে সে বেঁচেছে। রাস্তার যে কোন লোক এটুকু চেষ্টা করত। এটা এমন কিছু মহানুভবতার ব্যাপার নয়।

শুভেন্দু ॥ ঐ আমার একটি মাত্র ছেলে গুরু।

গুরুপদ ॥ দু'দিন পরে আবার একটি হ'তো। এখনও যে হবে না, এমন কথা কেউ বলতে পারে না।

শুভেন্দু ॥ আর একটিও হবে না। বাবলুই আমার একমাত্র বংশধর।

গুরুপদ ॥ কী করে জানলি ?

শুভেন্দু ॥ বাবলু হওয়ার সময় আর কোন সন্তান সন্ততি না হওয়ার পথ তৈরী করে ওদের দুজনকে বাঁচাতে হয়েছিল।

গুরুপদ ॥ ও।

শুভেন্দু ॥ এখন বুঝতে পারছিস, কেন আমি ছুটে এসেছি ? কতবড উপকার তুই করেছিস ? কেন আমি সারা জীবন তোর কাছে ঋণী ?

গুরুপদ ॥ হুঁ।

শুভেন্দু ॥ রেবা তোকে আমাদের বাডীতে যাবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছে আসবার সময় বার বার করে বলে দিয়েছে।

গুরুপদ ॥ রেবা বোনকে বলিস, আর একদিন যাব।

শুভেন্দু ॥ কবে যাবি বল ?

গুরুপদ ॥ দিন ক্ষণ ঠিক করে কথা দেওয়া তো আমার মত মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় শুভো।

শুভেন্দু ॥ বেশ কথা না দিস্ খুব শীগ্‌গীর একদিন যাবি বল্ ?

[এমন সময় নেপথ্যে ব্রজেনবাবুর স্ত্রীর কাশির শব্দ শোনা যেতে লাগল। সেই কাশির শব্দে গুরুপদও কাশতে লাগল। তার অবস্থা দেখে শুভেন্দু একটু সন্দিগ্ধ হ'ল]

কী হ'ল অমন কাশছিস কেন ?

গুরুপদ ॥ না, ও কিছু না।

শুভেন্দু ॥ আজ একটা কথা বার বার মনের মধ্যে তোলপাড করছে।

গুরুপদ ॥ কী কথা ?

শুভেন্দু ॥ শুধু একটা ব্যাপারে নয়, সর্ববিষয়ে তোর কাছে আমি সারাজীবনের জন্যে ঋণীই হয়ে রইলাম।

গুরুপদ ॥ কী রকম ?

শুভেন্দু ॥ তাই নয় কী ? তোর সাহায্য না পেলে আমি কী কোনদিন B A পাশ করতে পারতাম ? রেবাকে পেতাম, যদি না তুই সাহায্য করতিস ? বাবলু আমাদের একমাত্র বংশধর—সেও আজ তোর সাহায্যে জীবন ফিরে পেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার কী জানিস ? আমরা দু'জনেই দু'জনকে প্রচ্ছন্নভাবে এড়িয়ে চলি, তোর Complex আমি বড়লোক, আমার Complex তুই প্রতিভাবান। কিন্তু একটা কথা ঠিক, সারাজীবনের জন্যে মনের দিক দিয়ে তুই আমাকে কেনা গোলাম করে রাখলি।

[গুরুপদ এতক্ষণ শুভেন্দুর কথা শুনছিল আর কি যেন ভাবছিল। শুভেন্দু প্রস্থানোদ্যত হ'লে তাকে ডাকল।]

গুরুপদ ॥ শুভেন্দু শোন।

শুভেন্দু ॥ বল্।

গুরুপদ ॥ আচ্ছা, তুই আমার কাছে তোর মনের দিক দিয়ে সারাজীবনের জন্যে কেনা গোলাম হয়ে রইলি না ?

শুভেন্দু ॥ নিশ্চয়ই, সারা জীবন আমি তোর কাছে ঋণী।

গুরুপদ ॥ না শুভেন্দু, কেউ আমার কাছে ঋণী হয়ে থাক্, এ আমি চাই না।

শুভেন্দু ॥ কী বলছিস তুই ?

গুরুপদ ॥ বুঝতে পারছিস না ? আমি বলছি, তুই আমার কাছে সারা-জীবনের জন্যে ঋণী হয়ে থাক্, এ আমি চাইনা।

শুভেন্দু ॥ তার মানে ?

গুরুপদ ॥ ঋণ শোধ করে ফেল।

শুভেন্দু ॥ ঋণ শোধ করে ফেলব !

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ। তুই বললি B. A. পরীক্ষার সময় আমার সাহায্য না পেলে অর্থাৎ আমার সাজেশান মেনটেন না করলে, তুই B. A. পাশ করতে পারতিস না। রেবাও তোর জীবনে সারা জীবনের সাথী হয়ে আসতো না, যদি না আমি মধ্যস্থতা করতাম। অর্থাৎ মেয়ের বাপ, ছেলের বাপ, দুই তরফের দুই দিকপালকে যুক্তি তর্কে বশ না করলে, তুই রেবাকেও পেতিস না। ঘটনাচক্রে আজ বাবলুও আমারই জন্যে জীবন ফিরে পেল, যে তোর বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তর-ব্যবহারক।

শুভেন্দু ॥ সে কথা তো সত্যি, সত্যি বলেই তো ছুটে এসেছি তোর কাছে।

গুরুপদ ॥ জানাতে এসেছিস কৃতজ্ঞতা, বলতে এসেছিস "গুরু সারা জীবন আমি তোর কাছে ঋণী," তাই না ?

শুভেন্দু ॥ হ্যাঁ গুরু হ্যাঁ।

গুরুপদ ॥ কিন্তু আমি তা চাইনা।

শুভেন্দু ॥ তুই কী চাস ?

[এমন সময় হাত মুছতে মুছতে হরিপদ ভিতরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে অবাক ভাবে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল]

গুরুপদ ॥ টাকা।

শুভেন্দু ॥ গুরু!

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, টাকা চাই। এ জীবনের ঋণ কেন আসছে জীবনে কুকুর হয়ে শোধ করবি? তার চেয়ে কিছু টাকা দে ঋণটা শোধ হয়ে যাক।

শুভেন্দু ॥ গুরু তুই!

গুরুপদ ॥ না না, বেশী নয়, বেশী আমি চাইনা। খুব সামান্য চাইছি। এই হাজার খানেক টাকা, হাজার খানেক টাকা দে, তাতে সব ঋণ শোধ হয়ে যাবে।

শুভেন্দু ॥ তুই টাকা নিবি গুরুপদ?

গুরুপদ ॥ দিলে নেব। নিলে কোনওদিন তোর উপকার করেছি বলব না। খাটুনীর মজুরী দিবি, ঋণের ছুঁচ মনের গায়ে কোনওদিন্ ফুটবে না।······ কীরে? অবাক হয়ে গেলি যে? বড নীচ মনে হচ্ছে না? অত্যন্ত নীচে নেমে গেছি, তাই না শুভেন্দু? যা যা বাড়ী যা।

শুভেন্দু ॥ ছাখ্, আমার কাছে এত টাকা এখন নেই। বোধ হয় শ'দেড়েক আছে। আর বাকী টাকাটার একটা চেক লিখে দিচ্ছি।

[গুরুপদ যেন এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। এই মুহূর্তে কেন যেন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগল। শুভেন্দু এ্যাটাচি থেকে টাকা বের করে টেবিলে রাখল। চেক বই বের করে চেক লিখল, চেকটাও টেবিলে রাখল। গুরুপদ নীরব।

শুভেন্দু ॥ আজ চলিরে। তুই তাহ'লে এর মাঝে এক দিন যাস।

গুরুপদ ॥ না।

শুভেন্দু ॥ না কীরে?

গুরুপদ ॥ তোর বাড়ীতে আর যাব না।

শুভেন্দু ॥ যাবিনা! একটু আগে যে বললি?

গুরুপদ ॥ একটু আগের মুহূর্তটা এই মুহূর্তে বদলে গেল শুভো। তুই নিজেই বল না, আর কী যাওয়া যায়?

শুভেন্দু ॥ আর যাওয়া যায় না?

গুরুপদ ॥ না। যদি যেত, তাহ'লে যেতাম।

শুভেন্দু ॥ তাহ'লে রেবাকে কী বলব বলেদে।

গুরুপদ ॥ যা ঘটল, তাই বলবি।

শুভেন্দু ॥ না—। আমি তা পারব না। তোর কাছে যা সহজ আমার কাছে তা অত্যন্ত কঠিন। শুধু বলব···সে বলেছে সে আসবে।

[বলেই শুভেন্দু দ্রুত বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল। হরিপদ দরজার কাছে দাঁড়িয়েই ছিল। গুরুপদর কাজ দেখে সে যেন দিশাহারা। গুরুপদ ধীরে ধীরে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে শুভেন্দুর রেখে যাওয়া টাকা আর চেক দেখতে লাগল। হরিপদ দু'পা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল।

হরিপদ ॥ দাদা—

গুরুপদ ॥ কী বলছিস?

হরিপদ ॥ দাদা, তুই শুভোদার কাছ থেকে এতগুলো টাকা নিলি?

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ নিলাম।

হরিপদ ॥ কী করবি এত টাকা?

গুরুপদ ॥ টাকা মানুষ কী করে হরি··· ?······

[হঠাৎ ব্রজেনবাবুকে জোর গলায় ডাকল...ব্রজেনবাবু···, ও ব্রজেন বাবু—]

ব্রজেন [নেপথ্যে] ॥ আবার কি হ'ল গুরুপদবাবু—

গুরুপদ ॥ শুনে যান মশাই, শীগ্‌গীর শুনে যান।

ব্রজেন [নেপথ্যে] ॥ যাচ্ছি—

গুরুপদ ॥ টাকা মানুষ কী করে বললি না তো হরি?

হরিপদ ॥ টাকা মানুষ ভোগ করে দাদা!

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ, ভোগ করে, যোগ করে, গুণ করে, আবার বিয়োগও করে, ভাগও করে।

[বিরক্তির ভাব নিয়ে ব্রজেনবাবু বাইরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন]

ব্রজেন ॥ আবার ডাকছেন কেন?

গুরুপদ ॥ আবার আপনার স্ত্রী কাশছেন কেন?

ব্রজেন ॥ কেন কাশছেন তাতো কিছুক্ষণ আগেই জানিয়ে গেলাম;

গুরুপদ ॥ চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করেছেন?

ব্রজেন ॥ কী আর করব বলুন? অফিসে ধার চেয়েছি। যদি পাই তাই দিয়ে যতটুকু সম্ভব চিকিৎসা হবে। না পেলে হবে না। আপনার কথা মত যে যেতে বসেছে, তাকে যেতে দিতে হবে।

[ব্রজেনবাবু প্রস্থানোদ্যত হল।]

গুরুপদ ॥ দাঁড়ান।

[ব্রজেনবাবু দাঁড়াল। গুরুপদ টেবিলের উপর থেকে টাকাগুলো আর চেক নিয়ে তার হাতে দিল]

এই নিন, এতে দেড়শ টাকা আছে। আর এই যে চেকটা দেখছেন, এটা কাল ব্যাঙ্কে গিয়ে ভাঙিয়ে নেবেন, সাড়ে আট'শ টাকা পাবেন।

[টাকা ও চেক হাতে নিয়ে ব্রজেনবাবু বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে পড়ল]

ব্রজেন ॥ দেড়'শ টাকা! সাড়ে আট'শ টাকা! হাজার টাকা!

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ, হাজার টাকা। নোটগুলো জাল নয়, চেকটাও ফল্স নয়। আমার মত লোক দিচ্ছে বলে অবাক হবারও কিছু নেই।

ব্রজেন ॥ গুরুপদ বাবু!

গুরুপদ ॥ বলুন।

ব্রজেন ॥ এতগুলো টাকা আপনি...... আপনি আমায় দিয়ে দিলেন?

গুরুপদ ॥ হ্যাঁ দিলাম।

ব্রজেন ॥ সত্যি সত্যি দিলেন?

গুরুপদ ॥ তবে কী মিথ্যে মিথ্যে? ছেলে-খেলা মনে হচ্ছে?

ব্রজেন ॥ না না, তা মনে হবে কেন? মানে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। মানে, ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছি না।......ভগবান এ কি করে সম্ভব হ'ল ঠাকুর? কী অপার করুণা তোমার? কে বলে তুমি নেই? তুমি আছ ঠাকুর, তুমি আছ।

[হাতে টাকা আর চোখে আনন্দের অশ্রু নিয়ে ব্রজেনবাবু ধীরে ধীরে প্রস্থানোদ্যত হ'ল কিন্তু গুরুপদের ডাকে থেমে গেল।

গুরুপদ ॥ ও মশাই, শুনুন......এদিকে আসুন, এ দিকে আসুন।

[ব্রজেনবাবু ধীরে ধীরে গুরুপদর কাছে এলে গুরুপদ তার হাত থেকে টাকা ও চেক একরকম ছিনিয়ে নিয়ে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বলল।]

এবার যান্।

ব্রজেন ॥ সে কী গুরুপদ বাবু?

গুরুপদ ॥ যান। কী হ'ল? দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? যান। যান চেয়ে নিন হাত পেতে ভগবানের কাছে এক হাজার টাকা, একটি হাজার —টাকা। কি চান?......

[গুরুপদ কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পাইচারি করল। তারপর ব্রজেনবাবুর সামনে আবার এগিয়ে এসে বলল]

বলুন ভগবান করুণা করেনি। আমি—আমি গুরুপদ মুখুজ্যে আপনার পরিবারের চিকিৎসার জন্যে এক হাজার টাকা, একটি হাজার টাকা দিচ্ছি—বলুন, আমি উপকার করছি।

ব্রজেন ॥ হ্যাঁ, আপনিই দিচ্ছেন। আপনিই উপকার করছেন, ভীষণ উপকার করছেন আপনি।

গুরুপদ ॥ এই নিন। যান।

[গুরুপদ এবার সহজভাবে টাকা ও চেক ব্রজেনবাবুর হাতে দিল। ব্রজেনবাবু ধীরে ধীরে বাইরের দরজা দিয়ে প্রস্থান করল। হরিপদ আভ্যপান্ত সব সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।]

দু'টো টাকার জন্যে এরা এক মুহূর্তে ভগবান্‌কেও অস্বীকার করে।

হরিপদ ॥ দাদা—।

গুরুপদ ॥ কী বলছিস?

হরিপদ ॥ ওর থেকে দশটা টাকা রাখলে হ'ত না? দুদিন চলত!

[গুরুপদ যেন চাবুকের আঘাতে চমকে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সে রুদ্র মূর্তি নিয়ে হরিপদর গালে টেনে এক চড় মারল]

গুরুপদ ॥ বেরিয়ে যা এখান থেকে। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবিনা। ভিক্ষে চাইলি তুই? আমার ভাই, গুরুপদ মুখুজ্যের ভাই ভিক্ষে চায়। কুলিগিরি করতে পারে না? রিক্সা টানতে পারে না? রাস্তায় রাস্তায় হকারি করতে পারে না? ভিক্ষে চায়! মরে যা, মরে যা। ভিক্ষে করার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক সম্মানের।

হরিপদ ॥ দাদা, আমি ভুল করেছি। আমি অন্যায় করেছি, আমায় ক্ষমা কর।

গুরুপদ ॥ না। চলার পথ পিছল দেখে যারা থেমে যায়, তাদের আমি ক্ষমা করি না। আমি মিথ্যেই তোকে নিয়ে সাধনা করেছি। জীবনের গান মিথ্যে হয়ে গেছে আমার। মিথ্যে মিথ্যে শুধু বলেছি—

আমি থামব না।
এ পৃথিবীর রাত দিন
দু পায়ে মাড়িয়ে যাব
কিছু মানব না—
আমি থামব না।

[গুরুপদ উত্তেজনায় উন্মত্তের মত যেন দাপাতে লাগল। তার ভাব দেখে হরিপদ ভীষণ ভয় পেল।

হরিপদ ॥ দাদা... দাদা—

গুরুপদ ॥

আমার সত্তার সাথে
আপোষে বৈরী ভাব দিয়ে
জনক জন্ম দিল
কণ্ঠে দিল নাগিণীর মালা।
চক্ষে দিল অগ্নিদৃষ্টি
বক্ষে দিল
নাখাওয়ার জ্বালা।
সে জ্বালায় পূর্ণ মোর দেহের উদর
ক্ষুধা পেলে শুধু বঞ্চনা!
এ চলার পথে তবু
মাথা নোয়াব না।
আমি থামব না।

[হঠাৎ গুরুপদর কাশি পেল। একে ভিতরের এই উত্তেজনা, তার উপর কাশি, সব মিলিয়ে সে যেন একটা অবর্ণনীয় আকার ধারণ করল। হঠাৎ চমকে চিৎকার করে উঠল হরিপদ।]

হরিপদ ॥ দাদা— দাদা, তোর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে দাদা।

[গুরুপদ থমকে গেল। মুখে হাত দিল। হাতে রক্ত]

গুরুপদ ॥ এ্যাঁ? হ্যাঁ, তাইতো, এত রক্ত। নোনতা তাজা লাল রক্ত। ও ও অনেক আগেই বন্ধু আমার বাস করেছো বক্ষে মোর। Very good, Very good. I am fortunate enough. আমি অত্যন্ত

ভাগ্যবান। এই কুৎসিত, বীভৎস সুন্দর দুনিয়া থেকে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আমায় চলে যেতে হবে। কিন্তু তবু যতক্ষণ দেহে রবে প্রাণ—

আমি থামব না।
এ পৃথিবীর রাতদিন
দু পায়ে মাড়িয়ে যাব
কিছু মানব না—

[গুরুপদ ভীষণভাবে আবার কাশতে লাগল। হরিপদ "দাদা-দাদা" বলে অঝোরে কাঁদতে লাগল। পর্দা নেমে এল।]

সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কে

[মূল : আন্তন চেখভ]

অজিত গঙ্গোপাধ্যায়

॥ চরিত্র ॥

বহুরূপী অভিনীত

পরিচালনা : শম্ভু মিত্র

সমরেশ চৌধুরী—অমর গাঙ্গুলী

অক্ষয়বাবু—জ্যাকেরিয়া

অনিলা দেবী—তৃপ্তি মিত্র

কাদম্বিনী—আরতি মৈত্র

সদস্যগণ—শোভেন মজুমদার, কুমার রায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়

[বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্কের বোর্ড অফ ডিরেক্টরের চেয়ারম্যানের আপিস ঘর। আপিস ঘরের উপযুক্ত আস্‌বাব। বাঁদিকে দরজা। দরজার ওধারে ব্যাঙ্কের আপিস ঘর। সময় বেলা একটা। চেয়ারম্যানের প্রাইভেট সেক্রেটারী অক্ষয়বাবু তাঁহার টেবিলে বসিয়া একা কাজ করিতেছেন। টেবিলের উপর কিছু কাগজ-পত্র, টাইপরাইটার ও একটি টোটালাইজার]

অক্ষয় ॥ (দরজার নিকট আসিয়া) এই ভোলা, সামনের ডাক্তারখানা থেকে দুটো সারিডন ট্যাবলেট নিয়ে আয়। আর শোন—তোকে আমি অন্তত দুশোবার বলেছি এ ঘরের কুঁজোটা ভরে রাখতে—ভরিস নি কেন ? হোপলেস্ কোথাকার ! (টেবিলের নিকট আসিয়া) নাঃ, আর পারছি না ! আজ নিয়ে তিন দিন ! সারা দিন এখানে টাইপ করা, রিপোর্ট তৈরী করা, আর রাত্তিরে বাড়িতে গিয়ে ফাইল মেলানো ! (কাশির আবার বোঝার ওপর শাকের আঁটি—বেশ একটু জ্বরও হয়েছে, শীতও

করছে—গা তো বেশ গরম!—হাত-পাও কামড়াচ্ছে! আর মাথা—
মাথায় একি হল রে বাবা! যে দিকে তাকাই সে দিকেই দেখি সাইন্ অফ্
এক্স্‌ক্লামেশন্—রিপোর্টের সমস্ত এক্স্‌ক্লামেশনগুলো ঘোরা-ফেরা করছে!
(চেয়ারে বসিয়া) চেয়ারম্যান! চেয়ারম্যান্ না কচু! একটা ভাঁড়, একটা
হতচ্ছাড়া—উঃ অ্যানুয়াল রিপোর্ট পড়বেন। আবার রিপোর্টের
টাইটেল দেওয়া হয়েছে—বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, আজ যা আছে, আর কাল
যা হবে। কাল কচু হবে! নিজেকে যে কি ভাবে তার নেই ঠিক!
(টোটালাইজারের চাবি টিপিতে টিপিতে) টু···ওয়ান্···নট ওয়ান্
····সিক্স্—উনি করছেন লোকের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা, আর
আর আমাকে তার জন্যে গাধার খাটুনি খেটে মরতে হচ্ছে! কাজ
তো করেছেন তিনি একটাই, কতকগুলো আবোল-তাবোল কথা
দিয়ে একটা রিপোর্ট তৈরী করেছেন! চুলোয় যাকগে সব, জাহান্নামে
যাক্! তাঁর কাজ তো তিনি করে গেলেন—আমি এখন সারাদিন
বসে বসে যন্তরে খটা-খট্ করি! (কাজ করিতে করিতে) ওঃ কাজে
ঘেন্না ধরে গেল!···তাহলে হল গিয়ে—এক··তিন...সাত···দুই...
এক··শূন্য···। কিন্তু হুঁ হুঁ বাবা—মনে থাকে যেন—বলেছ, মাইনে
বাড়িয়ে দেবে। সব যদি কায়দা মাফিক হয়ে যায়—শেয়ার-
হোল্ডারেরা যদি বোকা বনে, তাহলে আমার পনের টাকা ইনক্রীমেন্টের
কথা যেন মনে থাকে! আচ্ছা, তাহলে হল গিয়ে—(টোটালাইজারে
কাজ করিতে করিতে)··কিন্তু রিপোর্টে কাজ না হলে, নালিশ চলবে
না বাবা!··আমি মাথা গরম লোক একবার ক্ষেপ্‌লে খুন পর্যন্ত করে
ফেলতে পারি—হুঁ হুঁ বাবা—

[ঘরের বাহিরে কর্মচারীদের অভিবাদন জ্ঞাপন ও চেয়ারম্যান
সমরেশ চৌধুরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।]

সমরেশ॥ (তখনও ঘরের বাহিরে) ধন্যবাদ! আপনাদের সকলকে,

আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনারা আমার বন্ধু, সহকর্মী—আজ এই যে আনন্দ অভিবাদন আপনাদের কাছে থেকে পেলাম এ আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে—আমি আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি—(ঘরে প্রবেশ করিয়া অক্ষয়বাবুর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন।)

অক্ষয়॥ (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) মে আই হ্যাভ্ দি অনর্ অফ্ কন্‌গ্রাচুলেটিং ইউ অন্ দি ফিফ্‌টিন্‌থ অ্যানিভারসারি অফ্ আওয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাণ্ড্ অফ্ উইশিং ইউ—

সমরেশ॥ (অক্ষয়বাবুকে কথা শেষ করিতে না দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন) থ্যাঙ্ক্ ইউ মাই ডিয়ার অক্ষয়, থ্যাঙ্ক ইউ। জানো অক্ষয়, আজ আমার কী যে আনন্দ হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে তোমাকে একটা চুমু খাই—(অক্ষয়বাবুকে প্রায় চুম্বন করিলেন বলিয়াই মনে হইল। অক্ষয়কে ছাড়িয়া) না না, তুমি লজ্জা পাচ্ছ কেন অক্ষয়! এ ক-দিন তুমি আমার জন্যে কি পরিশ্রমটাই না করেছ···সত্যি বলছি অক্ষয়—ভয়ানক ইচ্ছে করছে তোমায় একটা চুমু খাই—(অক্ষয়বাবু একটু দূরে সরিয়া গেলেন) —তবু তুমি তো সম্পর্কে আমার ভগ্নীপতি! কিন্তু ব্যাঙ্কের আর সবাই? ওরাও কি আমার জন্যে কম পরিশ্রম করেছে এ ক-দিন! ওরা তো আর আমার ভগ্নীপতি নয়! ঠিক কথা বলছি কিনা বল অক্ষয়? ওরা তো সত্যিই আমার ভগ্নীপতি নয়! ভাবতে পার অক্ষয়, ব্যাঙ্কের পনেরটা বছর কেটে গেছে! আমি তো ভাবতে পারি না। একটার পর একটা বছর পড়েছে, আর মনে হয়েছে—এটা বোধ হয় আর কাটবে না। সত্যি কেটেছে তো অক্ষয়? দেখ অক্ষয়, আমার দিকে দেখ! জোর করে বলতে পারো আমিই সমরেশ চৌধুরী? (অক্ষয়বাবু ঘাড় নাড়িলেন) ঠিক তেমনি জোর করে বলতে পার ব্যাঙ্কের পনেরটা বছর কেটে গেছে? (অক্ষয়বাবু আবার ঘাড় নাড়িয়া হ্যাঁ বলিলেন) ব্যস ব্যস, তাহলে আর

কোন চিন্তা নেই। তুমি যখন হ্যাঁ বলেছ অক্ষয়, তখন সত্যিই পনেরটা বছর কেটে গেছে—(ব্যস্ত হইয়া)—হ্যাঁ ভালো কথা, আমার রিপোর্টের কত দূর ? বেশ এগুচ্ছে তো ?

অক্ষয় ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ—আর পাতা পাঁচেক বাকী আছে।

সমরেশ ॥ বাঃ চমৎকার। তাহলে তিনটে নাগাদ রেডি হয়ে যাবে—কি বল ?

অক্ষয় ॥ যদি কোন গণ্ডগোল্ না নয়, তাহলে তিনটের মধ্যে নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে। আর সামান্যই বাকী আছে।

সমরেশ ॥ বাঃ চমৎকার। (অক্ষয়ের দিকে চাহিয়া) সত্যি বলছ তো অক্ষয় ? (অক্ষয় ঘাড় নাড়িলে) তাহলে তো অতি চমৎকার অক্ষয়—অতি চমৎকার। চারটের জেনারাল মিটিং। তাহলে এক কাজ কর—যে ক পাতা হয়েছে আমাকে দাও—একবার চোখ বুলিয়ে নিই—(ব্যস্ত স্বরে) কই দাও—দাও—(রিপোর্ট লইয়া) এই রিপোর্টের ওপর আমার সব কিছু নির্ভর করছে। এ তো শুধু রিপোর্ট পড়া নয়—এ হবে আমার ফায়ারওয়ার্ক ডিসপ্লে। তুমি ভাবছ আমি বাড়িয়ে বলছি অক্ষয়। দেখ দেখ, আমার দিকে চেয়ে দেখ—(অক্ষয় দেখিলে) আমি সমরেশ চৌধুরী এটা সত্যি তো ? (অক্ষয় ঘাড় নাড়িলে) তাহলে জেন, এটাও সত্যি—এ রিপোর্ট আমার ফায়ারওয়ার্ক ডিসপ্লে। চোখ ঝলসে দিয়ে যাব একেবারে। (বসিয়া রিপোর্ট পড়িতে পড়িতে) শরীরটা বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে—বাতের ব্যথাটাও বেড়েছে কাল থেকে—তার ওপর সকাল থেকে ছুটোছুটি, দৌড়োদৌড়ি, এই সব মালা-টালা পড়া, গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা দেওয়া আর ভালো লাগে। সত্যি বড টায়ার্ড ফিল্ করছি অক্ষয়—বড় টায়ার্ড—

অক্ষয় ॥ (লিখিতে লিখিতে) দুই-শূন্য-শূন্য-তিন-নয়-দুই-শূন্য—কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না স্যার—শুধু দেখছি নম্বর—সবুজ কালিতে লেখা নম্বর সব সবুজ

হয়ে চোখের সামনে নেচে বেড়াচ্ছে—(টোটালাইজারের চাবি টিপিতে টিপিতে) এক-ছয়-চার-এক-পাঁচ—

সমরেশ ॥ তার ওপর সকালে আবার এক বিশ্রী ব্যাপার। মালতী এসেছিল আমাদের বাড়িতে—তোমার নামে নালিশ নিয়ে। কাল রাত্তিরে তোমার নাকি আবার মাথা খারাপের মত হয়েছিল! তুমি নাকি একটা পেন্‌সিল কাটা ছুরি নিয়ে তাড়া করেছিলে! এ রকম করলে কি করে চলে বল?

অক্ষয় ॥ (অপেক্ষাকৃত কঠোর স্বরে) অন্যদিন হলে হয়তো আমার সাহস হত না স্যার! কিন্তু আজ আমাদের অ্যানিভারসারি বলেই সাহস করে একটা অনুরোধ করছি! দয়া করে আমার সংসারের কথাবার্তা নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপিসের কাজে এ ক-দিন যে খাটুনিটা যাচ্ছে, অন্তত তার কথা ভেবেও আমাকে রেহাই দিন—দোহাই আপনার—!

সমরেশ ॥ তুমি একেবারে ইম্‌পসিব্‌ল অক্ষয়! কিন্তু তুমি তো এধারে লোক খারাপ নও! তবে মেয়েদের সঙ্গে এরকম কালাপাহাড়ের মত ব্যবহার কর কেন, বলতে পার? আমার তো কিছুতেই মাথায় আসে না—কেন তুমি মেয়েদের অত ঘেন্না কর?

অক্ষয় ॥ আমারও একটা কথা কিছুতেই মাথায় আসে না স্যার—কেন আপনি মেয়েদের অত ভালবাসেন? (অল্পক্ষণ দুজনেই নিজের কাজে ব্যস্ত রহিলেন)

সমরেশ ॥ বুঝলে অক্ষয়—ডিরেক্টরেরা আজ পার্টিতে আমাকে একটা মানপত্র আর একটা রূপোর টি-সেট্ উপহার দেবে! বাইরের পাঁচজন লোকের সামনে—বেশ চমৎকার হবে ব্যাপারটা, কি বল? আর, কিছু হোক আর না হোক, এতে ক্ষতি তো কিছু হবে না! আর তাছাড়া ব্যাঙ্কের রেপুটেশনের জন্যে এ সবও একটু-আধটু দরকার! আরে, তুমি তো

ঘরের লোক, সব জানই—ও মানপত্রও আমার লেখা, আর ও টি-সেট কেনবার টাকাও আমি দিয়েছি। কিন্তু কি করি বল? নিজে থেকে কোন কিছু দেবার কথা তো তারা ভাবতেই পারে না। (চারিদিকে দেখিতে দেখিতে) এ ঘরের ফার্ণিচারগুলো কি রকম কেনা হয়েছে বল তো? প্রত্যেকটা একেবারে বাছাই করা। ওরা বলে এই সব ছোট-খাট জিনিস নিয়ে আমি বড় মাথা ঘামাই। বলে আমার নজর খালি গেটের দরোয়ানের ওপর—লোকটা যাতে বেশ মোটা-সোটা হয়—আমার নজর নাকি খালি ডোর-হ্যাণ্ড্‌ল্‌-এর ওপর সেগুলো যাতে সব সময় ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে থাকে। বলে নজর আমার এম্প্লয়িদের পোষাকের ওপর—তারা যাতে বেশ স্মার্ট্‌লি ড্রেসড্‌ হয়ে আপিসে আসে। কিন্তু তুমিই বল অক্ষয় এগুলো ছোট-খাট জিনিস? বাড়িতে আমি যেমন তেমন করে থাকতে পারি—যা ইচ্ছে তাই করতে পারি—যেখানে সেখানে পড়ে শুয়োরের মত খানিকটা ঘুমুতে পারি—মদ খেয়ে হৈ-হল্লা করতে পারি, কিন্তু তাই বলে—

অক্ষয়॥ একটা অনুরোধ স্যার। দয়া করে কাউকে গালাগাল করবেন না।

সমরেশ॥ ওঃ তুমি সত্যিই একটা ইমপসিবল্‌ লোক অক্ষয়। আমি গালাগাল কাউকে করছি না। আমি বলছি বাড়িতে যাহোক করে থাকলে চলে! কিন্তু এখানে? এখানে প্রত্যেক ব্যাপারটার মধ্যে একটা পালিশ থাকা চাই। ভুলে যাও কেন এটা একটা ব্যাঙ্ক। এখানে প্রত্যেকটা ছোট-খাট জিনিসের মধ্যেও একটা গুরু-গম্ভীর ভাব থাকা চাই। জান অক্ষয়, আমার চেয়ারম্যানশিপের বিশেষত্ব কি? আমি এই ব্যাঙ্কের রেপুটেশন্‌কে একটা হাই লেভেলে উঠিয়েছি। কিসে সবচেয়ে বেশী এসে যায় জান অক্ষয়? প্রত্যেক জিনিসটার সুর যেন উঁচু তারে বাঁধা থাকে। এই যে তুমি! আর একটু বাদেই ডিরেক্টরদের ডেপুটেশন আসবে, আর তুমি কিনা জামাটা পর্যন্ত পরে আসা প্রয়োজন মনে করনি। [illegible] আছ

একটা ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জী যার আসল রং বার করতে গেলে রীতিমত অঙ্ক কষতে হবে। অন্ততঃ আজকের দিনের জন্যও একটা সার্ট-টার্ট কিছু পরে আসতে পারতে তো!

অক্ষয়॥ আমি আমার দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যটা আপনার ডেপুটেশনের চেয়ে বড় মনে করি স্যার! গা-ময় আমার ছোট ছোট ফোঁড়া বেরিয়েছে।

সমরেশ॥ (উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে) তাহলেও এ কথাটা মানবে তো, এ ঘরে তোমাকে মোটেই খাপ খাচ্ছে না? সমস্ত এফেক্ট্‌টা তোমার জন্যে স্পয়েল্‌ড হয়ে যাচ্ছে!

অক্ষয়॥ তাতে কিছু এসে যাবে না। তারা এলে আমি না হয় আলমারীর পাশে গিয়ে লুকোব! (লিখিতে লিখিতে) সাত-এক-সাত-দুই-এক-পাঁচ-শূন্য—বেখাপ্পা জিনিস আমি নিজেই পছন্দ করি না—সাত-দুই নয়—(চাবি টিপিতে টিপিতে) বেখাপ্পা কিছু আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না! আজ আপনার বাড়ির পার্টিতে মেয়েদের নেমন্তন্ন না করলেই পারতেন।

সমরেশ॥ কি যা-তা বাজে বকছ।

অক্ষয়॥ বাজে, বাজে নয়! আপনি কি ভাবছেন তা আমি জানি! ভাবছেন, শাড়ী, গয়না, আর মিহি গলার স্বর—এই তিনে মিলে চমৎকার একটা শো হবে! কিন্তু এই তিনে মিলে সবকিছু আপসেট করে দিতে পারে, তা জানেন? জানেন যত নষ্টের মূল এই মেয়েরা?

সমরেশ॥ আমি তো জানি উল্টোটা। মেয়েরা মানুষকে অনেক উঁচুতে উঠিয়ে দেয়!

অক্ষয়॥ তাই নাকি! আর মই কেড়ে নিয়ে ধপাস করে ফেলে দেয় না? এই মিসেস চৌধুরীর কথাই ধরুন না। শোনা যায় তিনি নাকি বেশ বুদ্ধিমতী! এই তো সেদিন তিনি এমন একটা কথা বলে বসলেন, যার টাল সামলাতে আমার দু'দিন গেল। এক ঘর বাইরের লোক—তার

মাঝে হঠাৎ তিনি এসে আমায় জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা শুনলাম, মিষ্টার চৌধুরী আমাদের ব্যাঙ্কের হয়ে নবভারত প্ল্যাস্টিক্সের শেয়ার কেনার পরই, শেয়ারের দাম বাজারে পড়তে আরম্ভ করেছে? ক-দিন ধরেই দেখছি ওর মনটা ভার হয়ে রয়েছে—তাই তোমাকে জিজ্ঞেস করছি!—আচ্ছা আপনিই বলুন না, এসব কথা কেউ বাইরের লোকের সামনে জিজ্ঞেস করে! আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারি না, কেন আপনি মেয়েদের বিশ্বাস করে এসব কথা বলেন! এর জন্যে কোন্‌দিন না আপনাকে আদালতে দাঁড়াতে হবে!

সমরেশ॥ ব্যস ব্যস ব্যস! আজকের দিনে আর এসব কথা নয়! হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ—(ঘড়ি দেখিয়া, অনিলার তো আসবার সময় হয়ে গেল—আমায় তো এখুনি একবার ষ্টেশনে যেতে হয়। কিন্তু যাই কখন—বড্ড টায়ার্ড! সত্যি কথা বলতে কি অক্ষয়—অনিলা এ সময় এখানে আসুক—এ ইচ্ছে আমার ছিল না! তাই বলে ভেব না, সে আসছে শুনে আমি বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু তাহলেও আর দুটো দিন থেকে এলেই পারত! সাড়ে সতের গণ্ডা ঝঞ্চাট বাড়ল! সন্ধ্যের পর বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ, হেন-তেন! আজ আবার মিসেস মিত্রকে কথা দিয়েছিলাম খাওয়া-দাওয়ার পর একটু—অক্ষয় আমি বড় নার্ভাস ফিল্ করছি—মনে হচ্ছে, আর একটু বাদেই আমার দেহটা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে! অক্ষয়, এরকম হওয়া উচিত নয়। আজ একটা অ্যানিভারসারির ব্যাপার, এত নার্ভাস হলে চলবে কেন?

[পিছনের দরজা দিয়া অনিলা চৌধুরীর প্রবেশ]

সমরেশ॥ এই যে অনিলা, তোমার কথাই হচ্ছিল—(ঘড়ি দেখিলেন)

অনিলা॥ সত্যি! আমার কথা হচ্ছিল? আমাকে তাহলে খুব মিস্ করছিলে বল। শরীর-টরীর ভালো তো? আমারও স্টেশনে নেমেই তোমার কথা মনে হল। জানি তুমি এখন এখানে—তাই তো মাল-পত্তর

বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে সোজা এখানেই চলে এলাম। (অনিলা দেবী কথা বলেন খুব তাড়াতাড়ি মনে হয় যেন এক নিশ্বাসে সব কথা বলিয়া ফেলিতে চান) কত যে কথা আছে বলবার, তার আর ঠিক নেই। আমার আর সবুর সইছে না। (অক্ষয়কে ব্যস্ত হইতে দেখিয়া) না না অক্ষয়, ব্যস্ত হতে হবে না—আমি এক্ষুণি চলে যাব। ভালো আছ অক্ষয়? মালু কেমন আছে—ভালো তো? (সমরেশকে) বাড়ির সব ভালো তো?

সমরেশ॥ ক-দিনেই তোমার শরীরটা একটু সেরেছে দেখছি। ভালোই ছিলে সেখানে, কি বল?

অনিলা॥ চমৎকার! মা আর সুনীলা তোমার কথা বারবার জিজ্ঞেস করেছে—পিসিমা তোমার জন্যে জেলি তৈরী করে পাঠিয়েছে। সকলের তোমার ওপর খুব রাগ—চিঠি-পত্তর দাও না বলে। ওখানে যেসব কাণ্ড হচ্ছে, তা যদি জানতে! ওঃ সে কি সব কাণ্ড—আমার বলতেই ভয় করছে—কি সব ব্যাপার! কিন্তু ব্যাপার কি বল তো? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে আমাকে এখানে দেখে খুব খুশি হও নি—

সমরেশ॥ খুশি হই নি!—কি যে বল তুমি! তাই কখনো আবার হয় না কি! (ক্রুদ্ধ অক্ষয়ের গলা খাঁকারি শোনা গেল)

অনিলা॥ (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সুনীলাটার কথা ভেবে মনে আমার এতটুকু শান্তি নেই! বেচারী!

সমরেশ॥ অনিলা আজ আমাদের ব্যাঙ্কের ফিফ্‌টিন্‌থ অ্যানিভারসারি। এক্ষুণি এ ঘরে ডিরেক্টরদের ডেপুটেশন আসবে—এ সময়, এই জামা-কাপড়ে—মানে বলছিলাম কি একেবারে স্টেশন থেকে সোজা এখানে এসেছ—

অনিলা॥ ও নিশ্চয়। আজ ফিফ্‌টিন্‌থ অ্যানিভারসারি। কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্‌। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা রাত্তিরে করেছ তো? চমৎকার! ভালো কথা,

মনে আছে, তুমি সেই সুন্দর স্পীচটা লিখেছিলে ওদের জন্যে! বড্ড সময় নিয়েছিল কিন্তু—(অক্ষয়ের গলা খাঁকারি)

সমরেশ ॥ (কুণ্ঠিত স্বরে) মানে এসব কথা এখানে বলাটা ঠিক নয় অনিলা, মানে আমি বলছিলাম কি তুমি এই এলে, এখন বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম টিশ্রাম, মানে রাত্তিরে আবার—

অনিলা ॥ আরে এখুনি যাচ্ছি। তোমায় সমস্ত ব্যাপারটা বলতে আমার এক মিনিটও লাগবে না! তাহলে গোড়া থেকে বলি শোন। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, তুমি আমায় ট্রেনে তুলে দিয়ে এলে। আমার পাশে বসেছিলেন এক স্থূলাঙ্গী ভদ্রমহিলা, মনে আছে নিশ্চয়? তুমি তো জান, আমি বেশী কথা-টথা বলতে ভালবাসি না। গোটা তিন-চার স্টেশন চুপচাপ কেটে গেল। তারপর মনে আসতে আরম্ভ করল যত রাজ্যের কুচিন্তা। একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি সামনে বসে আছে একটি ছেলে—সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে বলেই মনে হল। একটু বাদে আর একটি ছেলে এসে বসল—দেখে মনে হল সেটিও স্টুডেন্ট। তাদের ধারণা আমার বয়স নাকি পঁচিশের বেশী নয়! কম আলোয় ভালো করে দেখাও যাচ্ছিল না কিছু। আমি আবার বললুম আমার বিয়ে হয় নি। তারপর সেই রাত বারটা অবধি কি মজার মজার গল্প। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার যোগাড়। শেষকালে আবার দুজনে পালা করে আমাকে গান শোনাতে আরম্ভ করলে। (হাসিতে হাসিতে) ভাগ্যিস ভোর রাতে নেমে গেল, নইলে জানতে পেরে যেত, আমার বয়স পঁয়ত্রিশ, বিয়ে হয়ে গেছে অনেক কাল। সমস্ত এফেক্টটাই তাহলে নষ্ট হয়ে যেত। (ক্রুদ্ধ অক্ষয়ের গলা খাঁকারি আবার শোনা গেল)

সমরেশ ॥ অনিলা, এখানে অক্ষয়ের কাজের ক্ষতি হচ্ছে। এখন বাড়ি যাও লক্ষ্মীটি, পরে সব শুনব'খন—

অনিলা ॥ আরে তাতে হয়েছে! অক্ষয়ও শুনুক না—এক্ষুণি শেষ হয়ে যাবে। বুঝলে অক্ষয় ভারী ইণ্টারেষ্টিং! স্টেশনে দেখি কল্যাণ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সেদিন ওয়েদারও ছিল চমৎকার—[এমন সময় বাহিরে গোলমাল শোনা গেল—ভেতরে যাবেন না—ভেতরে যাওয়া বারণ—কি চাই আপনার—। বাহির হইতে কাদম্বিনী দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কেন আটকাবার চেষ্টা করছেন আমাকে, আমাকে আটকাতে আপনারা পারবেন না—মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে—]

কাদম্বিনী ॥ (ঘরের ভিতরে আসিয়া সমরেশকে নমস্কার করিয়া) আপনিই মিঃ চৌধুরী তো? (ব্যাকুল স্বরে) বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি! আমার নাম কাদম্বিনী গাঙ্গুলী—সুরেন গাঙ্গুলীর স্ত্রী—

সমরেশ ॥ কি চাই আপনার?

কাদম্বিনী ॥ মানে ব্যাপারটা হচ্ছে এই। আমার স্বামী সুরেন গাঙ্গুলী জয় হিন্দ ইন্‌সিওরেন্স-এ কাজ করতেন। আজ সাত মাস তিনি অসুখে শুয়ে—এরই মধ্যে কোম্পানী তাঁকে বিনা কারণে ছাঁটাই করে। তারপর আমি যখন তাঁর আপিসে মাইনে আনতে গেলুম, তখন দেখি চব্বিশ টাকা ছয়আনা কম! জিজ্ঞেস করলুম, কেন? বললে, ওঁর নাকি টাকাটা আপিসে ধার ছিল। কিন্তু তা কি করে হবে মিস্টার চৌধুরী? আজ অবধি আমাকে না জানিয়ে এক পয়সাও উনি ধার করেন নি, আর একেবারে চব্বিশ টাকা ছ-আনা, এ কি করে সম্ভব! আপনিই বলুন—আপিসের কি এটা করা উচিত হয়েছে? তাই আমি আপনার কাছে ছুটে এসেছি মিস্টার চৌধুরী! একে গরীব তায় মেয়েছেলে। আমাদের দেখবার শোনবার কেউ নেই! বাড়ি ভাড়ার আয়ে কোন রকমে সংসার চলে! স্বামীর কাছ থেকে পর্যন্ত একটা মিষ্টি কথা কখনও শুনি নি—আপনি ছাড়া আমার আর কেউ নেই মিস্টার চৌধুরী—এ টাকাটা আপনাকে উদ্ধার করে দিতেই হবে—(একখানি আবেদন পত্র বাড়াইয়া

দিলেন। সমরেশবাবু আবেদনপত্র গ্রহণ করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন)

অনিলা ॥ (ততক্ষণে অক্ষয়বাবুকে লইয়া পড়িয়াছেন) তাহলে ব্যাপারটা গোড়া থেকে বলি শোন অক্ষয়! গেল সপ্তার আগের সপ্তায় মার কাছ থেকে চিঠি পেলাম। সোমেন বলে একটি ছেলে নাকি সুনীলাকে ভালবাসে, বিয়ের প্রস্তাবও নাকি করেছে। ছেলেটি এমনিতে ভালো, কিন্তু টাকা পয়সা মোটে নেই! সুনীলাও নাকি তাকে বড্ড ভালবেসে ফেলেছে। তাই মা আমাকে লিখেছিলেন, আমি যদি গিয়ে সুনীলাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—

অক্ষয় ॥ (কঠোর স্বরে) মাফ করবেন, আপনি আমার হিসেবে সব গোলমাল করে দিলেন! এদিকের হিসেবের অঙ্ক, আর ওদিকে আপনি, আপনার মা, সুনীলা দেবী কোথায়-কবে-কার সঙ্গে, আমার সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল!

অনিলা ॥ হ'ক গোলমাল হিসেবে! হিসেবে গোলমাল হ'লে কিচ্ছু এসে যাবে না! কোন ভদ্রমহিলা যখন কথা বলেন, তখন তাঁর কথা ভালো করে শুনতে হয় বুঝলে! আচ্ছা অক্ষয় তোমার আজ কি হয়েছে বল তো? এত ক্ষেপে রয়েছ কেন? কারো প্রেমে-টেমে পড়ে গেছ নাকি? (হাসিয়া উঠিলেন)

সমরেশ ॥ (কাদম্বিনীকে) মাফ করবেন, এসব কি ব্যাপার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

অনিলা ॥ কি অক্ষয়—সত্যি সত্যি কারো প্রেমে পড়েছ নাকি? এই দেখো তোমার যে কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল।

সমরেশ ॥ অনিলা লক্ষ্মীটি, তুমি একটু ওঘরে যাও তো—এক মিনিট, আমি এক্ষুণি আসছি—

অনিলা ॥ তাড়াতাড়ি এস কিন্তু— (অনিলা দেবীর প্রস্থান)

সমরেশ ॥ দেখুন মিসেস গাঙ্গুলী, আমি তো এর বিন্দু-বিসর্গ কিছু বুঝতে পারছি না। তবে আপনি যে জায়গা ভুল করেছেন—একথাটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। এ আবেদন-পত্রের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই। আপনার স্বামী কাজ করতেন ইনসিওরেন্স্ কোম্পানীতে—আবেদনপত্র আপনার সেখানেই পাঠান উচিৎ।

কাদম্বিনী ॥ কিন্তু আমি পাঁচ জায়গায় ঘুরে তবে এখানে এসেছি। কেউ আমার দরখাস্ত পড়ে পর্যন্ত দেখে নি। কি যে করব তাই ভাবছিলাম। শেষকালে আমার জামাই বললে—জামাইটি কিন্তু আমার বেশ ভালো হয়েছে, বুঝলেন সমরেশবাবু—হ্যাঁ তা সেই জামাই আমাকে বললে—না আপনি সমরেশ চৌধুরীর কাছে যান, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন। দোহাই আপনার মিস্টার চৌধুরী, আমাকে দয়া করে সাহায্য করুন।

সমরেশ ॥ বিশ্বাস করুন মিসেস গাঙ্গুলী, এ ব্যাপারে আমি কিছুই করতে পারি না। আপনি দয়া করে বুঝতে চেষ্টা করুন, আপনার স্বামী কাজ করতেন ইন্সিওরেন্সে, জয় হিন্দ্ ইন্সিওরেন্স আর এটা হচ্ছে বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা?

কাদম্বিনী ॥ আপনি হয়তো আমার স্বামীর অসুখের কথাটা বিশ্বাস করছেন না মিস্টার চৌধুরী—কিন্তু আমার কাছে ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ আছে! এই দেখুন আপনি যদি দয়া করে একবার পড়ে দেখেন—

সমরেশ ॥ (বিরক্ত হইয়া) বাঃ চমৎকার! কে বললে আমি আপনার কথা অবিশ্বাস করছি! কিন্তু বিশ্বাস করুন এসবের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নেই! (অনিলা দেবীর হাসির শব্দ শোনা গেল) এই দেখ, ওঘরে অনিলা আবার ওদের কাজে ডিস্টার্ব করছে। (কাদম্বিনী দেবীকে) যতসব অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা এসবের কোন মানে হয়? কোথায় আবেদন-পত্র পাঠাতে হয়, তাও কি আপনার স্বামী জানেন না?

কাদম্বিনী ॥ আমার স্বামী কিছুই জানেন না মিস্টার চৌধুরী ! তাঁকে জিজ্ঞেস করতে গেলেই তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—তোমার ওসব খোঁজে দরকার কি ? বেরোও সামনে থেকে ।

সমরেশ ॥ কিন্তু মিসেস গাঙ্গুলী—আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন আপনার স্বামী কাজ করতেন জয় হিন্দ ইন্‌সিওরেন্সে, আর এটা ব্যাঙ্ক, বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক—

কাদম্বিনী ॥ আমি সব বুঝেছি মিস্টার চৌধুরী—এখন আপনি বললেই হয় ! আপনি দয়া করে ওদের বলে দিন আমার টাকাটা দিয়ে দিতে ! একবারে না পারে দু-বারে দিক—

সমরেশ ॥ (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) ওঃ— !

অক্ষয় ॥ কিন্তু স্যার, এভাবে এগুলো রিপোর্ট কোন দিনই শেষ হবে না ।

সমরেশ ॥ আর এক মিনিট অক্ষয় ! (কাদম্বিনী দেবীকে) আমার মনে হচ্ছে আপনি এখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেন নি । আমাদের তরফ থেকে জয়হিন্দ ইন্‌সিওরেন্সকে অনুরোধ করার কোন মানেই হয় না । এ সেই কি রকম হল জানেন ? আপনার স্বামী আপনার ওপর অত্যাচার করেন । আপনার নালিশ করবার কথা আদালতে—তা না গিয়ে আপনি এলেন কিনা এক ওষুধের দোকানে নালিশ জানাতে । (দরজার ওধার হইতে অনিলা দেবীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—আমি কি ভেতরে আসতে পারি ?)

সমরেশ ॥ (প্রায় চিৎকার করিয়া) একটু অপেক্ষা কর অনিলা, এক মিনিট্‌, আমি এক্ষুণি আসছি । (কাদম্বিনী দেবীকে) আপনি আপনার স্বামীর পুরো মাইনেটা পান নি, কিন্তু তার জন্যে আমরা কি করতে পারি বলুন ? তা ছাড়া মিসেস গাঙ্গুলী, আজ আমাদের ব্যাঙ্কের ফিফটিন্‌থ্‌ অ্যানিভারসারি—মানে পঞ্চদশ বার্ষিকী ! আমরা সকলেই খুব ব্যস্ত । —যে কোন মুহূর্তে কেউ না কেউ এসে পড়তে পারে—দয়া করে আজকের দিনটা আমাদের ছেড়ে দিন—

কাদম্বিনী ॥ সমরেশবাবু, দয়া করে আমার দিকে চেয়ে দেখুন। আমি অনাথা, দুর্বল, অসহায়, আমাকে দেখবার কেউ নেই। সকাল থেকে কত ঘুরেছি—বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে—মনে হচ্ছে, আমি বোধ হয় এখুনি মারা যাব। কত কাজ আমাকে করতে হয় জানেন? ভাড়া আদায়ের জন্যে আপিসে ছোটাছুটি, বাড়ি-ঘর-দোর দেখা-শুনো—তার ওপর আবার জামাইটির আমার চাকরি নেই—

সমরেশ ॥ দেখুন মিসেস গাঙ্গুলী, আমি—মানে—না, আপনি আমায় মাফ করুন—আমার আর কথা বলার ক্ষমতাটুকু পর্যন্ত নেই। আমার মাথার ভেতর সব যেন ঘুরছে।—মানে—আপনি যে আমাদেরই শুধু ডিস্টার্ব করছেন তা নয়, নিজেরও সময় নষ্ট করছেন। —(আপন মনে) ওঃ কি মোটা মাথা। কি হল? কথাটা মিথ্যে? মোটেই নয়। এ মাথা যদি মোটা না হয় তো আমার নাম সমরেশ চৌধুরীই নয়। (কাতরস্বরে অক্ষয়কে) ও-অক্ষয়, দোহাই তোমার। এঁকে একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দাও না। আমি যে আর পারছি না...(অসহায়ের ন্যায় মুখভঙ্গি করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন)

অক্ষয় ॥ (কাদম্বিনী দেবীর নিকট আসিয়া কঠোর স্বরে) আপনার কি চাই?

কাদম্বিনী ॥ আমি বড় দুর্বল, বড় অসহায়। আমাকে দেখলে মোটা সোটা বলে মনে হতে পারে—কিন্তু বিশ্বাস করুন—আমাকে কেটে টুকরো টুকরো করে যদি প্রত্যেকটা টুকরো আপনি এগ্‌জামিন্ করে দেখেন, তাহলে তার মধ্যে ভালো থাকার চিহ্নটুকুও খুঁজে পাবেন না। আপনি বিশ্বাস করুন, দু-পায়ে ভর দিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার মত ক্ষমতাও আমার নেই। দুটি বেলা আমার একেবারে খিদে হয় না তা জানেন? বিশ্বাস করবেন—সকাল থেকে শুধু খানিকটা চা খেয়ে আছি। বিশ্বাস করুন—চাটুকুও আমার ভালো লাগে নি।

অক্ষয় আমি আপনাকে একটাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছি—আপনি কি চান?

কাদম্বিনী ॥ দয়া করে ওদের বলে দিন, আমার অন্তত পনেরটা টাকা দিতে! বাকী ন-টাকা ছ-আনা আমি না হয় ওমাসে এসে নিয়ে যাব।

অক্ষয় ॥ কিন্তু আপনাকে তো পরিষ্কার বলে দেওয়া হল—এটা জয়হিন্দ ইন্‌সিওরেন্স্ নয়—এটা বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক।

কাদম্বিনী ॥ নিশ্চয়—একশোবার! যদি দরকার মনে করেন—আমি আপনাকে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাচ্ছি—

অক্ষয় ॥ আচ্ছা, আপনার কাঁধের ওপর মাথা বলে কোন জিনিস আছে, না নেই?

কাদম্বিনী ॥ দয়া করে আমার কথাটা শুনুন! আমি আপনার কাছে অন্যায় কিছু চাইছি কি? আইন-মাফিক আমার যা পাওনা, তাই চাইছি। এক পয়সাও বেশী দিতে বলছি কি আপনাকে?

অক্ষয় ॥ ছোট্ট একটা কথা জিজ্ঞেস করেছি আপনাকে—উত্তর দেবেন দয়া করে? আপনার কাঁধের ওপর যেটা রয়েছে, ওটা মাথা, না অন্য কিছু? বোধ হয় অন্য কিছুই হবে, কি বলেন? (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) যাক্‌গে, মরুক্ গে, চুলোয় যাক্। জাহান্নামে যাক্! আপনার সঙ্গে কথা কইবার আমার সময় নেই—আমিব্যস্ত! (দরজা দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) যান!

কাদম্বিনী ॥ (বিস্মিত হইয়া) কিন্তু আমার টাকা?

অক্ষয় ॥ আসল ব্যাপারটা কি বুঝতে পারেন নি এখনও? শুনবেন? শুনুন তাহলে—[কাদম্বিনী দেবীর নিকট আসিয়া চিৎকার করিয়া) আপনার হেডে মাথা বলে কোন বস্তু নেই। কি আছে জ নেন? (টেবিল ঠুকিয়া)—কাঠ, বুঝতে পারলেন—কাঠ!

কাদম্বিনী ॥ (ক্ষুব্ধ হইয়া) তাই নাকি! দেখুন—আপনি দয়া করে নিজের চরকায় তেল দিন! আর তেল যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তো ঘরে যান—সেখানে নিজের বউ আছে—তার সঙ্গে চোট-পাট করুন গিয়ে!

আমার স্বামী আপনার চেয়ে ঢের বড় আপিসে চাকরি করতেন! খবর্দার আপনি আমার সঙ্গে ওভাবে কথা কইবেন না!

অক্ষয় ॥ (ক্রুদ্ধ অথচ মৃদুস্বরে) আপনি যদি এই মুহূর্তে চলে না যান তো আমি দারোয়ান ডাকতে বাধ্য হব! (মেঝেয় পা ঠুকিয়া) যান—বেরিয়ে যান—!

কাদম্বিনী ॥ (কোমরে কাপড় জড়াইয়া) আস্তে কথা বল! এঁ্যাঃ—উনি চেঁচিয়ে কথা বললেন আর আমি ভয়ে মরে গেলুম আর কি! তোমার মত অনেক কেরানী আমার দেখা আছে—বিষ নেই, তার কুলোপানা চক্কোর!

অক্ষয় ॥ ওঃ—মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না একেবারে! কি বিশ্রী! মেয়েছেলে এত বিশ্রী হয়! চোখে চোখ পড়লে রাগে সর্বশরীর জ্বলে যাচ্ছে একেবারে! দেখ, ভালো হবে না বলছি! এখান থেকে এক্ষুণি যদি চলে না যাও তো আমি তোমাকে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেব! কোথাকার একটা বুড়ি বজ্জাত মেয়ে-মানুষ! আমি রাগলে কিন্তু কারো নই বলে দিলুম—মেরে একেবারে জন্মের মত প্যারালিসিস্ করে রেখে দেব। বেরোও বলছি—নইলে কিচ্ছু বলা যায় না—খুন পর্যন্ত করে ফেলতে পারি!

কাদম্বিনী ॥ তোমার মত অনেক কুকুর আমার দেখা আছে। কামড়াবার নেই ক্ষমতা—খালি ঘেউ ঘেউ! ভেবেছেন ওঁর চোখ-রাঙানীতে আমি থেমে যাব! মরে যাই আর কি!

অক্ষয় ॥ (হাত দিয়া চোখ ঢাকিয়া) নাঃ—মুখের দিকে তাকানো পর্যন্ত যাচ্ছে না! তাকালেই গা বমি বমি করছে! কী বজ্জাত মেয়েমানুষ বাবা —(হতাশ ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) তখনই বলেছিলাম—তা আমার কথা শুনলে তবে তো! আপিসে মেয়েছেলে, বাড়িতে মেয়েছেলে—

—(চিৎকার করিয়া) এখন আমি রিপোর্ট শেষ করি কি করে, সেটা কেউ বলে দিয়ে যাক্ আমাকে!

কাদম্বিনী ॥ ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে দেখ! আমি যেন অন্য কারো জিনিস চাইছি! আমি কি বলেছি—আমার পাওনার চেয়ে এক পয়সা বেশী আমাকে দাও! নির্লজ্জ বেহায়া কোথাকার! গেঞ্জি পরে গুণ্ডার মত আপিসে বসে রয়েছে! ষাঁড় কোথাকার। (সমরেশ ও পিছনে কথা বলিতে বলিতে অনিলা দেবীর প্রবেশ)

অনিলা ॥ সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ছিল রজত সেনের বাড়ি টি-পার্টি। সুনীলা পরেছিল লেশের ব্লাউজ আর সবুজ রঙের শাড়ি! চুলটা একটু ওপরে তুলে বেঁধে দিয়েছিলাম, কী চমৎকার মানিয়েছিল সুনীলাকে কি বলব!

সমরেশ ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়! বড চমৎকার মানিয়েছিল।—অনিলা, এক্ষুণি কেউ যদি এসে পড়ে—

কাদম্বিনী ॥ সমরেশবাবু!

সমরেশ ॥ (কাদম্বিনী দেবীর দিকে চোখ পড়িতে হতাশ দৃষ্টিতে) আপনি এখনও যান নি? আবার কি চাই আপনার?

কাদম্বিনী ॥ (অক্ষয়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া) এই লোকটা—টেবিল ঠুকে বলে কিনা আমার মাথায় কাঠ আছে! আপনি ওকে বলে গেলেন —আমার একটা ব্যবস্থা করতে! আর ও কিনা আমায় যা নয় তাই বলে গালাগালি দিতে আরম্ভ করলে—আমাকে অসহায় পেয়ে বলে কিনা আমার ঘেড়ে মাথা নেই!

সমরেশ ॥ ভালো কথা মিসেস গাঙ্গুলি! আপনি এখন যান—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আমি খোঁজ নিয়ে দেখব, কেন অক্ষয় আপনাকে ওসব কথা বলেছে।...আপনি বরং দু-একদিন বাদে আসবেন...(মৃদুস্বরে) ওঃ কি সাংঘাতিক বাতের যন্ত্রণা হচ্ছে!

অক্ষয় ॥ (সমরেশের নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে) আমায় পারমিশন দিন স্যার,

দরোয়ান ডেকে ওটাকে বার করে দিই। নইলে এ একটা ইম্‌পসিব্‌ল্ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

সমরেশ ॥ (সন্ত্রস্ত হইয়া, মৃদুস্বরে) না না—তাহলে বুড়ী এক্ষুণি চেঁচাতে আরম্ভ করবে। চারধার থেকে লোকজন ছুটে আসবে। কেলেঙ্কারির একশেষ হবে তখন!

অক্ষয় ॥ (কাঁদ কাঁদ অবস্থায়) কিন্তু আমাকে যে রিপোর্ট শেষ করতে হবে তিনটের মধ্যে। কি করে হবে, সেটা বলে দিন?

কাদম্বিনী ॥ তাহলে সমরেশবাবু দয়া করে বলে দিন টাকাটা কখন পাচ্ছি? আমার কিন্তু দরকার এক্ষুণি—

সমরেশ ॥ (মৃদুস্বরে) ওঃ বুড়ীকে দেখতে কি কুৎসিত! (কাদম্বিনী দেবীকে মৃদু এবং শান্ত কণ্ঠস্বরে) দেখুন মিসেস গাঙ্গুলী, আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমাদের এটা ইন্‌সিওরেন্স নয়, ব্যাঙ্ক—

কাদম্বিনী ॥ আমার ওপর একটু দয়া করুন সমরেশবাবু—ভেবে দেখুন আমাকে দেখবার কেউ নেই—অসহায়, অনাথা স্ত্রীলোক! আপনি যদি বলেন, ডাক্তারের সার্টিফিকেট হবে না আমি থানা থেকে সার্টিফিকেট এনে দিচ্ছি। আপনি শুধু দয়া করে আমায় টাকাটা দিয়ে দিতে বলুন!

সমরেশ ॥ ওঃ!

অনিলা ॥ আচ্ছা, এরা কেউ আপনাকে বলে নি, আপনি এদের কাজে ব্যাঘাত করছেন? আপনি তো আশ্চর্য মেয়েমানুষ!

কাদম্বিনী ॥ আমার এ বিপদে সত্যিই দেখবার কেউ নেই মিসেস চৌধুরী! সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন—আমি খেয়ে স্বাদ পাই না, ঘুমিয়ে আরাম পাই না, আমার শোয়া-বসা সব ঘুচে গেছে। আপনি বিশ্বাস করুন, আজ সকালে খানিকটা চা খেয়েছিলাম সে চাটুকুও আমার ভালো লাগে নি!

সমরেশ ॥ (ধৈর্যের শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন) কত চাইছেন আপনি?

কাদম্বিনী ॥ চব্বিশ টাকা ছ-আনা—

সমরেশ ॥ বেশ (ব্যাগ হইতে পঁচিশ টাকা বাহির করিয়া কাদম্বিনী দেবীর হাতে দিলেন) এই নিন্ পঁচিশ টাকা এখন দয়া করে এখান থেকে যান, আমাকে রেহাই দিন ! (আসিয়া চেয়ারে বসিলেন। ক্রুদ্ধ অক্ষয়ের গলা খাঁকারি শোনা গেল)

কাদম্বিনী ॥ টাকাটা পাইয়ে দিয়ে সত্যিই আমার বড উপকার করলেন সমরেশবাবু। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ !

অনিলা ॥ (সমরেশবাবুর পাশের চেয়ারে বসিয়া হাত ঘড়ির দিকে দেখিয়া) নাঃ আর থাকা চলে না—কিন্তু গল্পটা যে এখনও শেষ হয় নি। শেষ করেই যাই, কি বল ? বেশী নয়, মিনিটখানেক লাগবে। ওঃ ওখানে কি সব ব্যাপার বুঝলে ! তারপর তো যাওয়া হল রজত সেনের বাড়ি। খাওয়া-দাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা করেছিল সেন ! সুনীলার লাভার সোমেন, সেও ছিল ওখানে। সুনীলাকে আমি আবার আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বোঝাই, দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলি ! সুনীলা রাজী হয়। ওখানেই সোমেনকে ডেকে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সমস্ত পাট চুকিয়ে দেয়। আমি ভাবলাম যাক্, সব ঠিক হয়ে গেল ! মা খুশি হলেন, সুনীলাটাও বেঁচে গেল, আমিও তাহলে এবার একটু হাঁফ ছাড়তে পারব ! তারপর কি হল জান ? চা-টা খেয়ে বাগানে বেড়াচ্ছি এমন সময় (হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া) এমন সময় বাগানের কোণের খালি ঘরটা থেকে গুলির আওয়াজ !

সমরেশ ॥ ওঃ !

অনিলা ॥ ছুটে গেলাম সেখানে, গিয়ে দেখি সোমেন মেঝেয় পড়ে আছে। তার হাতে পিস্তল !

সমরেশ ॥ নাঃ, এ অসহ্য হয়ে উঠেছে ! (হঠাৎ কাদম্বিনী দেবীকে দেখিতে পাইয়া) আপনি এখনও এখানে ? আবার কি চান আপনি ?

কাদম্বিনী ॥ সমরেশবাবু, যদি দয়া করে আমার স্বামীকে আবার চাকরিটা পাইয়ে দেন !

অনিলা ॥ (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম) সোজা নিজের বুক লক্ষ্য করে গুলি করেছে ! সুনীলা তো সেখানেই অজ্ঞান হয়ে গেল ! ছেলেটারও কি ভয়, দু-চোখ ভর্তি জল ! নিজেই ডাক্তার ডাকতে বললে দুটি হাত জোড় করে ! ডাক্তার, বদ্যি, ছুটো-ছুটি ! ডাক্তার এসে ভাগ্যিস বল্‌লে, গুলিটা বুকের আধহাত ওপর দিয়ে গেছে ! নইলে হয়েছিল আর কি !

কাদম্বিনী ॥ বড় উপকার হয় সমরেশবাবু, যদি আমার স্বামীকে চাকরিটা আবার পাইয়ে দেন—

সমরেশ ॥ (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবেন এইরূপ অবস্থা, অক্ষয়ের নিকট আসিয়া দুই হাত জোড করিয়া) এ আর সহ্য হচ্ছে না অক্ষয়, যা হোক করে ওটাকে বার করে দাও, যেমন করে পার !

অক্ষয় ॥ (সোজা অনিলার নিকট আসিয়া) বেরোও এখান থেকে !

সমরেশ ॥ না না, ওকে নয়—ওটাকে, ওই বুড়ীটাকে—(কাদম্বিনী দেবীর দিকে ইঙ্গিত করিলেন ।)

(অক্ষয়বাবুর মুখ দেখিয়া স্পষ্টই মনে হইল, তিনি সমরেশবাবুর কথা বুঝিতে পারেন নাই ।)

অক্ষয় ॥ (অনীলা দেবীকে) বেরোও শিগ্‌গির এখান থেকে ! (মেঝেতে পা ঠুকিয়া) বেরোও বলছি !

অনিলা ॥ (ভীত স্বরে) অক্ষয়, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল । এসব কি বলছ তুমি ?

অক্ষয় ॥ (অনিলা দেবীকে) বেরোও বলছি এখান থেকে ! নইলে একেবারে জন্মের মত পঙ্গু করে দেব । খোড়-কুচো করে ছেড়ে দেব ! বেরোও শিগ্‌গির, নয় তো যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসব !

অনিলা ॥ (চেয়ার হইতে উঠিয়া, অক্ষয়ের নিকট হইতে দৌড়াইয়া পলাইতে পলাইতে) তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! অসভ্য, অভদ্র, বেয়াদব কোথাকার—(পিছনে অক্ষয়কে আসিতে দেখিয়া, ছুটিতে-ছুটিতে) সমরেশ আমাকে বাঁচাও (ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন) সমরেশ!

সমরেশ ॥ (অক্ষয়বাবুর পিছনে পিছনে) অক্ষয়, দোহাই তোমার এবার থাম! আমি জোডহাত করে বলছি তোমাদের, একটু চুপ কর! ওঃ, মান-ইজ্জত সব গেল!

অক্ষয় ॥ (এতক্ষণে কাদম্বিনী দেবীকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার পিছনে ছুটিতে ছুটিতে) বেরোও এখান থেকে, বেরোও বলছি! এই কে আছিস? ধর তো ওটাকে! মেরে মোণ্ডা বানিয়ে ছেড়ে দেব! ঘুঁষিয়ে গলা পাকিয়ে রেখে দেব একেবারে!

সমরেশ ॥ অক্ষয়, দোহাই তোমার। আমি হাত-জোড করছি। এইবার থামো অক্ষয়!

কাদম্বিনী ॥ (ঘরময় ছুটিতে ছুটিতে) সমরেশবাবু, লোকটার মাথা খারাপ! দোহাই আপনার, পাগলের হাত থেকে বাঁচান! ও যদি কমড়ে দেয়, তাহলে আমি আর বাঁচব না! নারায়ণ, শ্রীমধুসূদন, পাগলের হাত থেকে বাঁচাও, রক্ষে করো প্রভু!

অনিলা ॥ (চিৎকার করিয়া) কে কোথায় আছ, বাঁচাও! নইলে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব! (একটি চেয়ারের উপর লাফাইয়া উঠিয়া, সেখান হইতে একটি সোফার উপর লাফাইয়া পডিলেন) ওগো শুনছ, আমি বোধ হয় সত্যি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি, শুনছ (এই কথা বলিতে বলিতে অর্ধমূর্ছিতের ন্যায় সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন)

অক্ষয় ॥ (কাদম্বিনী দেবীর পিছন পিছন) মেরে ফেলে দেব! কেটে ফেলে দেব! ছাল ছাড়িয়ে আনব!

কাদম্বিনী ॥ ভগবান রক্ষে করো! ওগো আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার

হয়ে আসছে যে—(এই কথা বলিতে বলিতে সমরেশবাবুকেই একমাত্র আশ্রয় ভাবিয়া, তাঁহার বুকের উপর প্রায় অর্ধ-মূর্ছিতের ন্যায় হেলিয়া পড়িলেন। দরজার বাহিরে মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল—ডেপুটেশন্-ডেপুটেশন!)

সমরেশ॥ (তাঁহার অবস্থা প্রায় পাগলের মত। আবোল-তাবোল বকিতেছেন) ডেপুটেশন—না না ডেপুটেশন্ তো নয়, রেপুটেশন্—অ্যাঃ রেপুটেশন্ কে বললে—অকুপেশন্—

অক্ষয়॥ (তখনও মেঝেয় পা ঠুকিতেছেন) বেরোও—বেরোও বলছি এখান থেকে! তবে রে তোর নিকুচি করেছে—(জামার আস্তিন গুটাইয়া) একবার ধরতে পারি তোমায়! খুন করে ফেলে দেব একেবারে! (ইতিমধ্যে পরিচালকমণ্ডলীর পাঁচজন সদস্যদের প্রবেশ) একজনের হাতে ভেলভেটের কভারে বাঁধান একটি মানপত্র, আর একজনের হাতে রৌপ্য-নির্মিত একটি টি-সেট। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন অনিলা দেবী সোফার উপর অর্ধ-মূর্ছিত অবস্থায় প্রায় শুইয়া আছেন বলিলেই হয় এবং সমরেশ চৌধুরী দুই বাহুর মধ্যে প্রায়-মূর্ছিত কাদম্বনী দেবীকে লইয়া হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন।)

সদস্য॥ (মানপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন) মাননীয় শ্রীসমরেশ চৌধুরী সমীপেষু—বন্ধুবর! আজিকার এই শুভদিনে অতীতের বিস্মৃত দিনগুলির কথাই আমাদের বার বার মনে পড়িতেছে। মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে এই ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতির ইতিহাস। মনে মনে এক অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও সন্তোষ অনুভব করিতেছি। অবশ্য আমরা জানি, প্রথম দিকে অল্প মূলধনের জন্য আমাদের ব্যাঙ্ক বিরাট একটা কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। ব্যাঙ্কের অনির্দিষ্ট কর্মপন্থা দেখিয়া অনেকেরই সন্দেহ হইয়াছিল। মনে জাগিয়াছিল হ্যাম্‌লেটের প্রশ্ন—টু বি অর্ নট্ টু বি। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ কথাও তুলিয়াছিলেন, ব্যাঙ্ক তুলিয়া দেওয়া হউক। এমন সময়

আপনি আপনার বৃষ-স্কন্ধে ব্যাঙ্কের ভার তুলিয়া লইলেন। আপনার জ্ঞান, আপনার শক্তি, আপনার ক্ষুর-ধার বুদ্ধি ব্যাঙ্ককে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে পৌঁছাইয়া দিয়াছে—(কাদম্বিনী দেবী গোঙাইয়া উঠলেন—ও—ও—)

অনিলা ॥ জল ! একটু জল !

সদস্য ॥ আজ আমাদের ব্যাঙ্কের ডেপুটেশন—না না—মানে খ্যাতি—

সমরেশ ॥ ডেপুটেশন—রেপুটেশন্—অকুপেশন্—না না—অকুপেশন—ডেপুটেশন—রেপুটেশন—(হঠাৎ কথকতার স্বরে)

একদিন দুই বন্ধু গেল বেড়াইতে,
বেড়াইতে বেড়াইতে তারা লাগিল বলিতে ;
বলো না যৌবন তোমার হইয়াছে নষ্ট,
আমার কারণে তুমি পাইয়াছ কষ্ট।

[কাদম্বিনী দেবী তখন আরও জোরে গোঙাইতেছেন]

সদস্য ॥ (মানপত্রের কিছু অংশ ছাড়িয়া দিয়া) আজ ব্যাঙ্কের বর্তমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—

অনিলা ॥ জল ! একটু জল !

সদস্য। দেখিতে প্াই, মানে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই—(কাদম্বিনী দেবীর গোঙানি আরও জোর হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয়বাবু পুনরায় পা ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও বেরোও বেরোও করিতেছেন)—মানে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, মানে বর্তমানে আমাদের মানপত্র পাঠ স্থগিত রাখাই বিধেয় ! (একে অপরের মুখের দিকে তাকাইতে তাকাইতে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় অবস্থায় সদস্যেরা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সমরেশবাবু তখনও ছড়া কাটিতেছেন, বাকী সকলের, অর্থাৎ কাদম্বিনী দেবী, অক্ষয়বাবু এবং অনিলা দেবীর অবস্থারও কোন পরিবর্তন নাই। ঠিক এই অবস্থায় পর্দাও নামিয়া আসিল।)

চর্পট

জোছন দস্তিদার

॥ চরিত্র ॥

গোপাল	চিরচিত্ত
মদন	যুবক
বিবেক	অহনিশা

[একটা দেওয়াল খসা ইঁট বার করা পুরনো ছোট ঘর। দেওয়ালে নানা রকম হাতে-আঁকা ছবি টাঙ্গানো। একটা সাইনবোর্ড টাঙ্গানো আছে। তাতে লেখা 'দি রাজ জ্যোতিষী'। আসবাব পত্তর বলতে একটি তক্তাপোষ, তাতে সতরঞ্চি পাতা। একটা পুরনো টেবিল, টেবিল ঘিরে খান কয়েক রং চটা চেয়ার। ঘরের বাঁ দিকে একটা পুরনো ছোট কাঠের আলমারী, ডান দিকে একটা বই-এর পুরনো র‍্যাক। ঘরে তিনটে দরজা, বাঁ—ডান ও মাঝখানে। মাঝখানের দরজা দিয়ে বাড়ীর ভিতরে যাওয়া-আসা করা হয়। ডান দিকের দরজাটা দিয়ে বাইরের লোক আসে, বাঁ দিকের দরজাটা বাড়ীর পিছনের দিকে যাওয়ার জন্যে বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণত ব্যবহার করা হয়। সময় তখন তিনটে। এ বাড়ীর মালিক শ্রীচিরচিত্ত চিন্তাবিনাশ অধিকারী। বয়স তিরিশের মধ্যে। চেহারা রোগা। পরনে ধুতি ও গেরুয়া রংএর পাঞ্জাবী। একমনে দৈনিক পত্রিকা পড়ে চলেছেন। গোপাল গড়াই চিরচিত্তর বন্ধু। পরনে প্যান্ট-সার্ট]

গোপাল ॥ [নেপথ্য থেকে] চিরচিত্ত, মদনকে পেলাম না।

চির ॥ তাহলে তুইই বলে আয়। [গোপালের প্রবেশ] তুই বলে এসেছিস তো?

গোপাল ॥ হ্যাঁ। এক কাপ চা আর একটা হলো।

চির ॥ বড়—না ছোট?

গোপাল ॥ ছোটর সঙ্গে হলো বললে—নেদোর ঠুসো খেতাম।

চির ॥ চিনি একটু বেশী দিতে বলেছিস তো?

গোপাল ॥ হ্যাঁ, চা-টা তাড়াতাড়ি পাঠাতে বলেছি। যাক্, কাগজে কিছু পেলি?

চির ॥ [কাগজটা পড়তে পড়তে] নাঃ সুবিধেমত চাকরী খালি নেই।

গোপাল ॥ অসুবিধের চাকরী কি আছে?

চির ॥ আশি বছরের এক বেতো রুগীকে পিঠে করে সকাল বিকেল গড়ের মাঠে বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে।

গোপাল ॥ তার ওজন?

চির ॥ প্রায় দু মণ আঠাশ সের।

গোপাল ॥ মাইনে?

চির ॥ দরখাস্তকারীর চেহারা দেখে মাইনে ঠিক হবে।

[মদনের প্রবেশ। কালো চেহারা। তেল চুপচুপে চুল, মুখের তুলনায় গোঁফ ছোট; পরনে ধুতি ও সাদা ফতুয়া। বয়স ২৫-এর মধ্যে]

মদন ॥ [এক কাপ চা হাতে করে প্রবেশ করে] বাবু, দিলনি।

চির ॥ কী?

মদন ॥ এর সঙ্গে ফাঁকা কাপ।

চির ॥ ভিতর থেকে একটা গ্লাস নিয়ে আয়। [চা-টা নেয়]

[মদন ভিতরে চলে যায়]

চা আনতে কোথায় গেছিলি?

মদন ॥ [ভিতর থেকে] কেন নেদোর দোকানে।

গোপাল ॥ বাজে কথা বলিস না মদন। নেদোর দোকান আমি ঘুরে এসেছি।

মদন ॥ [কথা বলতে বলতে গ্লাস হাতে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে] আর একটু ঘুরলে পেতেন।

চির ॥ তার মানে ?

মদন ॥ [কাপ থেকে চা ঢালতে ঢালতে] নেদো আসছিল।

চির ॥ কোথায় ?

মদন ॥ [গ্লাসটা গোপালকে এগিয়ে দিয়ে] আপনার কাছে। বাকী টাকা নিতে।

চির ॥ তারপর ?

মদন ॥ তারপর আর কি, ঘুরিয়ে দিলাম।

চির ॥ পরিষ্কার কোরে সব বল ত।

মদন ॥ আমি বললাম আপনি দাঁড়ান। আমি দেখে আসছি বাবু আছেন কিনা। এ পাশ ও পাশ ঘুরলাম, তারপর বললাম—দেখে এলাম বাবু নেই।

গোপাল ॥ [হেসে] নাঃ তোর মদন দেখছি তৈরী হোয়ে গেছে। সত্যি চিরচিত্ত তোর হাতযশ আছে।

চির ॥ আমিতো উপলক্ষ মাত্র। হিসেব কোরে দেখিস আমরা ভোর থেকে রাত কি রকম নিপুণভাবে অভিনয় কোরে যাই।

মদন ॥ বাবু, বসব ?

চির ॥ এ্যাঁ হ্যাঁ বোসো। ঐ দরজার পাশে। খদ্দের এলে—

মদন ॥ খেঁকিয়ে দেব।

গোপাল ॥ তাড়িয়ে দিবি ?

মদন ॥ আমার বাবু ঠিক বুঝেছেন।

গোপাল ॥ কিরে চিরচিত্ত, ব্যাপারটা কী ?

চির ॥ খেঁকিয়ে দেব মানে ও গলা খাঁকাড়ি দিয়ে আমাকে জানিয়ে দেবে।

[গোপাল ও চিরচিত্ত হেসে ওঠে। মদন টুলে বসে। গোপাল বিড়ি ধরায়। চির নথি নিয়ে রুমাল দিয়ে মুছে কাগজ পড়ায় মনোনিবেশ করে]

চির ॥ [হঠাৎ চিৎকার কোরে] গোপ্‌লা পেয়েছি—

গোপাল ॥ কী আবার পেলি ?

চির ॥ চাকরী !

গোপাল ॥ কী চাকরী মানে কিসের চাকরী ?

চির ॥ মুরগি ধুতে হবে।

গোপাল ॥ [আশ্চার্যান্বিত হয়ে] মু-র-গি ধুতে হ-বে ?

চির ॥ হ্যাঁ, কোন এক চীনে হোটেলে রোজ দুশো মুরগীর ছাল ছাড়িয়ে ধুতে হবে। মাইনে ধোবার কায়দার উপর নির্ভর কোরবে। করবি ?

গোপাল ॥ না।

চির ॥ কেন ?

গোপাল ॥ রোজ দুশো মুরগীর ছাল ছাড়াতে হবে ?

চির ॥ হ্যাঁ।

গোপাল ॥ না না করব না। অভ্যেস হোয়ে যাবে।

চির ॥ তার মানে ?

গোপাল ॥ ছাল ছাড়ানো যদি একবার অভ্যেস হয়ে যায় তাহলে হঠাৎ যদি মালিকের কথার উনিশ-বিশে মাথায় রাগ চোড়ে যায়—তাহলে হয়ত দুম্ কোরে তারও ছাল ছাড়িয়ে ধুতে শুরু কোরে দেব। [দুজনেই হেসে ওঠে]

[মদন পকেট থেকে কৃষ্ণর শতনামের বই নিয়ে দুলে দুলে পড়তে শুরু করে]

হবে না—হবে না, বুঝলি হবে না।

চির। কী হবে না ?

গোপাল ॥ বলছিলাম এ কাঠামোয় শালা আর চাকরী হবে না।

চির ॥ আমার কথা তো শুনবি না, বললাম লেগে পড, তোর ভাল হবে।

গোপাল ॥ তোর এই ব্যবসায় লাগবার কথা বলছিস ?

চির ॥ হ্যাঁ, তোর অসুবিধেটা কোথায় ?

গোপাল ॥ আমি ভাই ভীতু সম্প্রদায়ের লোক—

চির ॥ তোর ভয়টা কিসের ?

গোপাল ॥ মারের।

চির ॥ তুই দেখালি বাবা, মরে বেঁচে আছিস আর এতো—

গোপাল ॥ দেখ চিরচিত্ত, তুই আমার অবস্থা বুঝতে পারবি না।

চির ॥ আমার বুঝে দরকার নেই। দুজনে বি. এ, পাশ করলাম বছর খানেক আগে। আজও চাকরী পে'য়ছিস ? ঘুরতে তো কসুর করিসনি।

গোপাল ॥ তাই বলে…(থেমে যায়)

চির ॥ থামলি কেন বল।

গোপাল ॥ তোর মত মিথ্যে বোলে—

চির ॥ কে আমার রামকৃষ্ণের বাচ্চা এলো।

গোপাল ॥ বলছিলাম তোকে যদি পুলিশে ধরে।

চির ॥ সোজা হিসেব—গুঁজে দেব।

গোপাল ॥ তার মানে ?

চির ॥ মানে সোজা ! বাঁ হাত দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বাঁ হাতে গুঁজে দেব।

গোপাল ॥ ব্যস ?

চির ॥ হ্যাঁ ব্যস। গোটা দেশটা স্রেফ্ গোঁজাগুঁজির উপর চলছে।

গোপাল ॥ নাঃ তোর সঙ্গে কথায় আমি পারব না।

চির ॥ তাহলে আমার কথা মত কাজ কোরে যা।

[নেপথ্যে—আসব ?]

মদন ॥ (গলা ঝেড়ে নিয়ে) বাবু—

চির ॥ (খপ কোরে গোপালের হাতটা চেপে ধরে) Client.—

গোপাল ॥ (থতমত খেয়ে) কাকে কি বলছিস তুই ?

[নেপথ্য থেকে আবার সেই স্বর, আসব ?]

মদন ॥ (বাইরের দিকে লক্ষ্য কোরে) আপনি একটু অপেক্ষা করুন। বাবু বসেছেন।

নেপথ্য থেকে ॥ এতক্ষণ কি তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন ?

মদন ॥ (বিরক্তির স্বরে) দূর মশাই বাবু হাত দেখায় বসেছেন। ডাক পড়লেই ডাকব।

চির ॥ (বাইরের লোকটিকে শোনাবার মত গলার স্বর চড়িয়ে) না না আপনার কথা বলার দরকার কি ? খালি মাথা নেড়ে যান।

গোপাল ॥ (আমতা আমতা কোরে) মানে···আমি···

চির ॥ না মশাই আপনার শনির স্থানচ্যুতি ঘটেছে।

গোপাল ॥ (বুঝতে না পেরে চিৎকার কোরে) এ আবার কী শুরু হোলো ?

চির ॥ সেই কথাইতো বলছি। কোথায় শুরু, কেন শুরু, কবে শুরু আর কী ভাবে শুরু কিছুই বুঝতে পারবেন না।

মদন ॥ (হঠাৎ নেপথ্য লক্ষ্য কোরে) আহাহা না ডাক পড়তেই ভিতরে পা চালাচ্ছেন কেন ?

নেপথ্য থেকে ॥ আমার খুব দরকার।

চির ॥ (গোপালকে ইসারায় বোঝাতে বোঝাতে) কিন্তু শনি যখন ঘরের মধ্যে ঢুকবে তখন কিন্তু খুব হুঁশিয়ার।

মদন ॥ আঃ, কেন কথা শুনছেন না ?

চির ॥ কি হোলো, মদন ?

মদন ॥ তিনি আসতে চাইছেন ?

চির ॥ তা তিনিটি কে ?

মদন ॥ (বার দুই গলা ঝেড়ে) তিনি—

নেপথ্য থেকে ॥ আসব ?

চির ॥ আসুন (চশমাটা বার কোরে নাকের মাঝ জায়গায় পরে নিয়ে) আপনার দেখে শুনে ভাল করে চলা উচিত।

[মোটা সোটা এক যুবকের প্রবেশ। পরনে টেরিলিনের প্যান্ট ও সার্ট। বয়স পঁচিশের মধ্যে। উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা]

যুবক ॥ বসব ?

চির ॥ (গোপালের হাত দেখতে দেখতে দৃঢ়তার সুরে) না মশাই—

যুবক ॥ মানে বসব না ?

চির ॥ (হাত দেখতে দেখতে) অসম্ভব

যুবক ॥ ওঃ আচ্ছা, তাহ'লে দাঁড়িয়ে থাকি।

চির ॥ (হাত দেখে হাসতে হাসতে) থাকতেই হবে - থাকতেই হবে।

গোপাল ॥ (নিজেকে ভাল করে সামলে নিয়ে) আপনার একটি কথাও আমি বুঝতে পারছি না।

চির ॥ না পারাই তো স্বাভাবিক। (গোপালের দিকে তাকিয়ে) আপনার পুত্র কটি ?

গোপাল ॥ আমার হাত কী বলছে ?

চির ॥ আপনার একটিও পুত্র নাই।

গোপাল ॥ (খুশীর সুরে) ঠিক ধরেছেন।

যুবক ॥ (সোৎসাহে) আমি একটু বসি ?

চির ॥ (যুবককে খুঁটিয়ে দেখে আবার হাত দেখতে শুরু করে) মহাশয়ের নাম ?

যুবক ॥ বিবেকবিন্দু বেরা। বসব ?

চির ॥ তা বিন্দুবাবুর প্রয়োজন ?

বিবেক ॥ আমার নাম বিবেকবিন্দু বেরা।

চির ॥ বড্ড বড়।

বিবেক ॥ কী ?

চির ॥ আপনার নামটি। তাই ছোট কোরে নিলাম। আপত্তি আছে ?

বিবেক ॥ আপত্তি কেন থাকবে ? কি যে বলেন আপনি !

চির ॥ সাধু। তা' বিন্দুবাবুর প্রয়োজন ?

বিবেক ॥ হাত দেখাতে চাই।

চির ॥ এক পিঠ, না দু পিঠ ?

বিবেক ॥ এক পিঠে আমি আমার সঠিক প্রশ্নের উত্তর পাব ?

চির ॥ ধরুন আপনি শ্যামবাজারে যাবেন, অর্ধেক ভাড়া দিলে কনডাকটার কি করবে ?

বিবেক ॥ অর্ধেক পথে নামিয়ে দেবে।

চির ॥ তবে ? (গোপালের হাত দেখে বলে)

বিবেক ॥ (ভয়ে তাড়াতাড়ি বলে) না না আপনি এপিঠ ওপিঠ সেপিঠ সব দেখুন।

চির ॥ মদন—

মদন ॥ বাবু—

গোপাল ॥ এক কাজ করলে কি রকম হয়, মদনকে তুই…

মদন ॥ (হাতটা টেনে) তুলা রাশি ? বলি আপনার তুলা রাশি ?

গোপাল ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

বিবেক ॥ বসব ?

চির ॥ বসুন। [ভাল করে হাতের এপিঠ ওপিঠ দেখে] বুঝলেন মশাই আপনার শনির প্রকোপ এমনিতে যাবে না।

গোপাল ॥ তবে ?

চির ॥ আপনাকে ধারণ করতে হবে।

গোপাল ॥ কত লাগবে ?

চির ॥ বেশী না। (ভেবে) অষ্ট ধাতুর মাদুলি, বড—পাঁচ টাকা, ছোট—

চার টাকা। মন্ত্রপূ:ত অষ্টবর্ণের অষ্টপ্রকার সুতো—এক টাকা। বন্ধন প্রণালী,—নারী কেশের বিনুনির মত এ সুতোর বিনুনিতে মাতুলি বন্ধন কোরে দক্ষিণ হস্তের কনুইয়ের ঠিক দু ইঞ্চি উপরে—

গোপাল ॥ আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন। টাকার জন্যে ভাববেন না।

বিবেক ॥ দেখুন, আমার একটু তাড়া ছিল।

চির ॥ দেখছেন তো, আমি তো আর বোসে নেই। (গোপালের হাত দেখতে দেখতে) মহাশয় কী বেকার ?

গোপাল ॥ (সোৎসাহে) কী কোরে বুঝলেন ?

চির ॥ আপনার হস্ত রেখাই বলছে।

বিবেক ॥ স্যার—

চির ॥ বলুন—

বিবেক ॥ বড় দুর্দিন আমার।

চির ॥ বুঝতে পারছি। তা নাহ'লে কি আমাদের মধ্যে আজকের এই সাক্ষাতটি হোতো। (গোপালের হাত ছেড়ে) শীঘ্রই আপনার বৃহস্পতি তুঙ্গে উঠবে। তখন ধুলো ছুঁলে সোনা, আর সোনা ছুঁলে হীরে।

বিবেক ॥ (ব্যস্ততার সুরে) স্যার আমি অফিস থেকে পালিয়ে এসেছি, যদি আরও দেরী হয়—

চির ॥ (বিরক্তির সুরে) উঃ, আপনি জ্বালিয়ে মারলেন বিন্দুবাবু। বলুন—বলুন কি হয়েছে ? (গোপালকে) আপনি একটু বসুন মশাই। দেখতেই তো পারছেন, ইনি একেবারে নাছোড়বান্দা।

গোপাল ॥ ঠিক আছে ঠিক আছে, আমার জন্যে চিন্তা করবেন না। আপনি আমাকে যে আপনার পদতলে ঠাঁই দিয়েছেন এতেই আমি ধন্য।

চির ॥ বলুন আপনার কি সমস্যা ?

বিবেক ॥ সব খুলে বলি ?

চির ॥ সব খুলবার দরকার নেই—সেটা অশালীন হবে। মন খুলে সব বলুন।

বিবেক ॥ আমি…আমি…মানে… প্রেম করেছিলাম।

চির ॥ বেশ করেছিলেন, তারপর ?

বিবেক ॥ খুব ঘুরতাম দু'জনে।

চির ॥ কতক্ষণ ?

বিবেক ॥ তখন ঘড়ি দেখার মত মনের অবস্থা থাকত না।

চির ॥ না থাকাই তো উচিত। বলে যান।

বিবেক ॥ এক অফিসে কাজ করতাম।

চির ॥ (নস্যি নিতে নিতে) করলেন—

বিবেক ॥ নতুন সাহেব এলো।

চির ॥ (আওয়াজ কোরে নস্যি নিয়ে নাক মুছতে মুছতে) সাদা—না কালো ? বাঙ্গালী—না ইংরেজ ?

বিবেক ॥ আজ্ঞে বাঙ্গালী ?

চির ॥ পূর্ব—না পশ্চিমের ?

বিবেক ॥ আজ্ঞে পূর্ববঙ্গের ?

চির ॥ একটু মুস্কিল হোলো, বলুন ?

বিবেক ॥ বোঝেনই তো কেরানীর চাকরী, কতই বা মাইনে পাই।

চির ॥ (বিবেকের মোটা চেহারাটা ভাল করে লক্ষ্য কোরে) চেহারা দেখে তো মনে হয় না।

বিবেক ॥ মোটা বলে বলছেন ? রক্ত নেই ফুলে গেছি।

চির ॥ কথাটা আর ফোলাবেন না। তাড়াতাড়ি বলুন।

বিবেক ॥ জন্মদিনে শাড়ী দিলাম, ব্যস ছিঁড়ে গেল।

চির ॥ নতুন শাড়ী ছিঁড়ল কি কোরে? নিশ্চয়ই দেখে কিনতে পারেননি; নিশ্চয়ই পুরনো স্টক ছিল, নিশ্চয়ই গজিয়ে ওঠা কোন হঠাৎ মিলের শাড়ী, কিংবা……

বিবেক ॥ (কোন ক্রমে চিরর কথা থামিয়ে) আমি ও ছেঁড়ার কথা বলছি না।

চির ॥ (আশ্চর্যান্বিত হোয়ে) তবে?

বিবেক ॥ বলছিলাম আমাদের প্রেমের বাঁধন ছিঁড়ে গেল।

চির ॥ কি রকম……কি রকম?

বিবেক ॥ বড় সাহেব শাড়ী দিল—

চির ॥ কোন দিন?

বিবেক ॥ ঐ একই দিনে—মানে বনানীর জন্ম দিনে।

চির ॥ বুঝতে পেরেছি। দেখি হাত। (গম্ভীর মনযোগসহ হাত দেখে চলে) কতদিন আগে আপনার বনানী শাড়ী পরেছিল?

বিবেক ॥ বনু শাড়ী তো এখনও পরে। ও তো বাঙ্গালী।

চির ॥ (রেগে হাতটা ছুঁড়ে দেয়। টেবিলে ধাক্কা লাগে) দূর মশাই।

বিবেক ॥ (যন্ত্রণায়) উঃ।

চির ॥ আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার দেওয়া শাড়ী শেষ কবে পরেছেন আপনার ঐ · ঐ (ভেবে নামটা মনে করতে না পেরে) আদর কোরে কি নাম ধরে যেন এখুনি ডাকলেন·

বিবেক ॥ (সোৎসাহে) বনানী তো—আমি ডাকি বনু বলে।

চির ॥ হ্যাঁ আপনার বুনো কবে শেষ শাড়ী পড়েছেন?

বিবেক ॥ (ভেবে) তা প্রায় মাস তিনেক আগে—।

চির ॥ দেখা হয় এখনও।

বিবেক ॥ আমি দেখি কিন্তু ও দেখে না।

চির ॥ (হাতের রেখা দেখতে দেখতে) হ্যাঁ হস্তরেখাও তাই বলছে।

বিবেক ॥ (উৎসাহের সঙ্গে) হস্তরেখা আর কি বলছে ?

চির ॥ শুনে দুঃখ্য বাড়বে...... আপাতত কমবার লক্ষণ খুব কম।

[হঠাৎ নেপথ্যে কাকে যেন দেখে মদন বার কয়েক গলা খাঁকানী দেয়]

তোমার আবার কী হোলো ?

বিবেক ॥ কৈ কিছু তো নয়।

মদন ॥ [নেপথ্য লক্ষ্য কোরে] আসছেন।

চির ॥ [হাত দেখতে দেখতে] পোষাক ?

বিবেক ॥ কার আমার—না বন্ধুর ?

চির ॥ [খেঁকিয়ে] এ তো মহা ঝামেলার লোক। আপনার বুনোর পোষাক কে জানতে চেয়েছে ?

বিবেক ॥ আপনিই তো পোষাকের কথা জানতে চাইলেন।

চির ॥ সেটা আপনার কাছ থেকে নয়—(মদনকে দেখিয়ে) ঐ আমার লোকের কাছে।

মদন ॥ বাবু তিনি প্রায় এসে গেলেন।

চির ॥ পরিধানে কী ?

মদন ॥ আজ্ঞে দেখে তো পরাধীন বলে মনে হচ্ছে না।

চির ॥ উঃ পোষাকের কথা জানতে চাইছি।

মদন ॥ সেটা বলবেন তো। শাড়ী।

চির ॥ আসতে দিও। [আবার হাত দেখে চলে]

বিবেক ॥ কী বুঝছেন ?

চির ॥ বোঝাবুঝির ঊর্ধে।

বিবেক ॥ মানে বন্ধুকে আমি পাব না ?

চির ॥ কথায় বলে নারী, অনেকটা দেহের নাড়ির মত। কখন আছে—কখন যাবে কেউ কি বলতে পারে ?

[টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ায় একটি মেয়ে। সাজ-পোষাক আধুনিক, তবে উগ্র নয়। হাতে নরম রংএর ভ্যানিটি ব্যাগ।]

নারী ॥ বসব ?

চির ॥ [হাত দেখা বন্ধ হয়ে যায়, ধীরে ধীরে মুখ তুলে ভদ্র মহিলাকে দেখে নিয়ে আবার হাত দেখতে শুরু করে] প্রয়োজন ?

নারী ॥ হাত দেখাব।

চির ॥ কিসে মার খেলেন ?

নারী ॥ সকলের কাছে।

চির ॥ (চমকে তাকায়) আজ্ঞে ?

নারী ॥ মানে সমাজের কাছে।

চির ॥ (শুকনো স্বরে) ওঃ ! একটু দেরী হবে, বসুন।

নারী ॥ বুঝলেন সারা জীবন খালি মার খাচ্ছি।

চির ॥ (হাত দেখতে দেখতে) তাহ'লে তো এতদিনে অভ্যেস হয়ে গেছে। বসুন।

নারী ॥ একটু তাড়াতাড়ি হোলে···

চির ॥ ভাল হ'ত তাই না ?

নারী ॥ হ্যাঁ।

চির ॥ উপায় নেই। দেখতেই তো পারছেন,—আমি বসে নেই।

বিবেক ॥ এখন, এখন আমি কী করব বলে দিন।

চির ॥ রাহুর কোপ, শনিও প্রবল, বৃহস্পতি ম্রিয়মান, শুক্র কাতর। সমস্যা।

বিবেক ॥ (হতাশার স্বরে) বনানীকে পাব না ?

চির ॥ পেতে পারেন·······

বিবেক ॥ (সোৎসাহে) পেতে পারি ?

চির ॥ আবার নাও পেতে পারেন।

বিবেক ॥ তাহ'লে ?

চির ॥ ওকে ভুলতে হবে।

বিবেক ॥ (চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে) আজ্ঞে…না মানে বিশ্বাস করুন — পারা যাবে না। ভীষণ মানে…আমার বন্ধুর স্বাস্থ্যটা বেশ ভাল। মানে খুব মোটা,—[হাত দিয়ে বোঝায়] এই…এই রকম আর কি, [মেয়েটির দিকে তোলার ভঙ্গিমা কোরে এগোয়] বুঝলেন ওকে আমি একদিন এ. নি কোরে তুলতে গেছিলাম—

চির ॥ (হতচকিত হয়ে) এ…এ এই এ আপনি কি করছেন। উনি আপনার বুনো নয়।

বিবেক ॥ (আবেগের সুরে) সে আমি জানি। আমার বন্ধু ওনার থেকে অনেক নরম, কোমল, চটুল, চঞ্চল, চপল, উদার, দৃঢ়, মধুর, মনোরম—এক কথায় বলতে—

চির ॥ আপনার বুনো সম্বন্ধে আপনার আরো কথা বাকী আছে ?

গোপাল ॥ (চিৎকার কোরে) এই চির…

চির ॥ না না চিরকাল আপনার বলতে হবে না। , এঁকে মেরে দিয়েই আপনাকে আবার ধরছি।

গোপাল ॥ (রেগে) কী যা-তা বলছিস তুই ?

চির ॥ তুই-না আপনি, বলছিস না—বলছেন।

গোপাল ॥ (হঠাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেই জিব কেটে ফেলে) ও হো হো আমি ভুলেই গেছিলাম। [মেয়েটির দিকে তাকায়]

চির ॥ না না না ও'দকে নয়। এদিকে তাকান, ভুলটা এদিকে হয়েছে।

[গোপাল সলজ্জ হেসে মাথাটা নামিয়ে নেয়। মেয়েটির হঠাৎ যেন কি রকম পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ ও যেন এদের এই ব্যবসাটাকে বুঝতে পারে]

বিবেক ॥ (ব্যস্ততার সুরে) আমার বনানীর মানে বন্ধুর কী হবে ?

চির ॥ বললাম তো ধারণ করতে হবে।

বিবেক ॥ (অসহায়ের সুরে) পারব না—পারব না। হাত দুটো আপন মনে বন্ধুকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেও পারে না। (হতাশার সুরে) না না অসম্ভব। (হাত দুটো দিয়ে দেখায়) সে এর থেকেও মোটা।

চির ॥ (রেগে) দূর্‌র মশাই আমি সে ধরার কথা বলছি না।

বিবেক ॥ তবে?

চির ॥ মাদুলী ধারণ করতে হবে।

বিবেক ॥ ধারণ করলে?

চির ॥ আপনার বুনো আপনার বসের শাড়ী ছেড়ে—আপনার দেওয়া শাড়ী পড়ে আপনার বাড়ী এসে—হাসি মুখে আপনার পাশে দাঁড়াবে।

বিবেক ॥ (আনন্দে লাফিয়ে) দাঁড়াবে?

চির ॥ তাইতো উচিত। তবে দাম বেশী লাগবে।

বিবেক ॥ কত?

চির ॥ (অনেকক্ষণ ধরে মনে মনে হিসেব কোরে) তা আপনার চল্লিশ টাকা।

বিবেক ॥ চল্লিশ টাকায় আমার বন্ধুকে পাব বলছেন?

[তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টাকা বার কোরে গুনতে শুরু করে]

নারী ॥ আমার ব্যাপারটা?

চির ॥ মহাশয়ার নাম?

নারী ॥ অহর্নিশা দাশগুপ্তা।

চির ॥ নামটা বেশী রুচীপূর্ণ। তা অহদেবী আপনাকে যে আর একটু বসতে হবে।

বিবেক ॥ আর আটত্রিশ টাকা আছে।

চির ॥ দিয়ে যান। বিকেলে বাকী দু টাকা দিয়ে আমার ঐ লোকের কাছ থেকে মাদুলী নিয়ে যাবেন।

বিবেক ॥ কম করা যায় না স্যার ?

চির ॥ যাবে না কেন—যাবে। তবে আপনার বুনো বসের শাডী পড়ে বসের পাশেই দাঁড়িয়ে থাকবেন।

বিবেক ॥ (চমকে তড়াক করে দাঁড়িয়ে ওঠে) না এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। মাত্র দু টাকার জন্যে আমার বন্ধু পরের হবে, এ আমি বেঁচে থাকতে হতে দেব না।

চির ॥ এটাতো আমারও কথা।

বিবেক। ঠিক আছে আমি সন্ধ্যের দিকে এসে বাকী দু টাকা দিয়ে আমার মাদুলী নিয়ে যাব। নমস্কার।

চির ॥ নমস্কার। (বিবেকের প্রস্থান) মদন, নব ধাতুর নব সংস্করণের বডটা। বাজুতে বাঁধার গাঢ় রক্তিম সুতো—

মদন ॥ তৈরী কোরে রাখব।

চির ॥ সন্ধ্যের আগে।

মদন ॥ মাদুলীর ভিতরে ?

চির ॥ বশীকরণ পুর থাকবে।

গোপাল ॥ (হঠাৎ হেসে ওঠে)

চির ॥ আপনি হাসছেন কেন ?

গোপাল ॥ (নিজের ভুল বুঝতে পেরে) কৈ হাসিনি তো।

[মেয়েটি অনেকক্ষণ ধরে কি যেন লিখছিল। সেটা ভাঁজ করে খামে রাখল]

চির ॥ আওয়াজটা কিসের ?

গোপাল ॥ আজ্ঞে কাশীর।

চির ॥ হাসিরই হোক আর কাশীরই হোক, আওয়াজ যেন আর না হয়। [মেয়েটির দিকে তাকিয়ে] অহোদেবী, আপনি এই চেয়ারটায় বসুন।

[পাশের চেয়ার দেখিয়ে দেয়। অহনিশা বসে) এবার আপনি বলুন অহোদেবী, আপনার সমস্যাটা কী ?

অহ ।। [কাতর স্বরে] আমার স্বামী রোজ মারেন।

চির ।। [অপ্রস্তুত হলেও নিজেকে সামলে নিয়ে] মারেন ? তা কি দিয়ে মারেন ?

অহ ।। আগে মারতেন হাত দিয়ে।

চির ।। বর্তমানে ?

অহ ।। পা দিয়ে। [ডান পাটা সোজা চিরর মুখের কাছে তুলে ধরে]

চির ।। (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) তা বেশ বেশ আঃ পাটা নামান। তা মারার হেতু ?

অহ ।। ভয়।

চির ।। ভয় ! কিসের ?

অহ ।। মরার।

চির ।। বুঝলাম না।

অহ ।। আমাদের বিয়ে হয়েছে মাত্র এক বছর।

চির ।। তা না হয় হোলো।

অহ ।। মাস ছয়েক আগে তিনি একজন জ্যোতিষীকে দিয়ে হাত গুনিয়ে ছিলেন।

চির ।। জ্যোতিষী কি বললেন ?

অহ ।। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই নাকি আমার স্বামীর মৃত্যু ঘটবে। আমাকে বিয়ে করাটাই নাকি তার মৃত্যুর কারণ।

চির ।। তা এর সঙ্গে আপনাকে মারার কারণটা আমার বোধগম্য হোল না।

অহ ।। জ্যোতিষী আরও বলেছে, যদি এক বছরের মধ্যে আমার মৃত্যু ঘটে তাহলে আমার স্বামীর আয়ু সত্তর-এর ঘরে পৌঁছবে।

চির ।। তাও বুঝতে পারলাম না।

অহ ।। উনি আমাকে মারতে মারতে মেরে ফেলে দিতে চান।

গোপাল ।। (চিৎকার কোরে) আপনার স্বামীকে জেলে দেওয়া উচিত।

অহ ।। আর ছ মাস মাত্র তাঁর আয়ু।

চির ।। ছমাস ? সময় আছে! তা আমাকে আপনি কী কোরতে বলেন অহদেবী ?

অহ ।। আপনাকে গণনা কোরে বলে দিতে হবে স্বামীর জ্যোতিষীর কথা সব মিথ্যে।

চির ।। সব বুঝলাম। কিন্তু এ এক ভীষণ শক্ত গণনা অহদেবী।

অহ ।। (ব্যস্ততার সুরে) যত টাকা লাগে আমি দেব।

চির ।। না না, টাকাটা এখানে বড কথা নয়, গণনাটা বড়। দেখি হাত—

[চির হাত বাড়ায়]

অহ ।। আমার না ওনার ?

চির ।। ওনার ! উনিটি কে ?

অহ ।। আমার স্বামী। তাঁকে আমি এনেছি।

চির ।। [আশ্চর্যান্বিত হয়ে] এনেছেন ? তিনি কোথায় ?

অহ ।। [একটু ভেবে] আপনাদের বাড়ীর পিছনের দরজার সামনে……

চির ।। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ?

অহ ।। আজ্ঞে দাঁড়িয়ে নেই, আমাদের গাড়ীতে বসে আছেন।

চির ।। তা পিছনের দরজায় কেন ?

অহ ।। সামনে আপনার নামের বোর্ডটা দেখলে তিনি ভিতরে আসতে চাইবেন না। জ্যোতিষীদের উপর ওনার ভীষণ রাগ। সেদিন তো একজনকে মেরেই বসলেন—

চির ॥ [চমকে] মারলেন ? মানে তিনি—

অহ ॥ সে বাজে জ্যোতিষী। রাস্তার ধারে হাত এঁকে বসেছিল।

চির ॥ বুঝেছি।

অহ ॥ যান না, দয়া কোরে একটু বুঝিয়ে নিয়ে আসুন না।

চির ॥ [একটু ভেবে] বেশ, চলুন। [উঠে পড়ে]

অহ ॥ আমি গেলে উনি আসবেন না। হয়ত মেরেই বসবেন। কালও আমাকে মেরেছেন। [ব্লাউজের বোতাম খুলতে খুলতে] দেখবেন··· দেখবেন ?

চির ॥ [দেখার কৌতূহল মেটাবার জন্যে দেখবার চেষ্টা করে অথচ মুখে জোরের সঙ্গে বলে] আহাহা দেখাতে হবে না দেখাতে হবে না। আমি মানস চোক্ষে সব কিছু অবলোকনে সক্ষম।

অহ ॥ তাহ'লে যাবেন তো ?

চির ॥ অগত্যা টাকাটা কিন্তু বেশী লাগবে।

অহ ॥ যা চান – যত চান দেব। ওকে বুঝিয়ে নিয়ে আসুন।

চির ॥ মদন তুই আমার সঙ্গে আয়তো। যযমান্ খুব শক্তিশালী। একা হয়ত পেরে উঠব না। [গোপালকে লক্ষ্য কোরে] আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি আসছি। [যেতে যেতে ঘুরে] আপনার গাড়ীর রং ?

অহ ॥ কালো।

চির ॥ আয় মদন। [ঘরের ডান দিকের দরজা দিয়ে দুজনে বেরিয়ে যায়]

[অহর্নিশা ওদের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। কি যেন ভেবে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে গোপালের দিকে তাকায়। গোপাল তখন ওর দিকে নরম চাহনীতে তাকিয়েছিল]

অহ ॥ [হঠাৎ হাসে]

গোপাল ॥ (গোপালও হাসে) আপনার স্বামী কিন্তু ভাল না।

অহ ॥ সে আর বলতে। আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আপনার নাম—?

গোপাল ॥ গোপাল গড়াই [সলজ্জ হাসে] ।

অহ ॥ গড়াইবাবু—

গোপাল ॥ বলুন ।

অহ ॥ আপনি পারবেন ?

গোপাল ॥ কি বলুন তো ?

অহ ॥ বড় তেষ্টা ।

গোপাল ॥ জল খাবেন ?

অহ ॥ হোলে ভাল হ'ত । বুঝলেন গড়াইবাবু এ অসহ্য জীবনে বাঁচার সখ আমার মিটে গেছে ।

গোপাল ॥ কি যে বলেন অহো দেবী—আপনার এই সামান্য বয়সে—দাঁড়ান আপনার জল এনে দিচ্ছি । [পিছনের দরজা দিয়ে ভিতরে চলে যায়]

[অহনিশা তাড়তাড়ি চিরর প্রস্থানের দরজা দিয়ে বাইরেটা দেখে নেয় । গোপালের যাওয়ার পথটা দেখে নেয় । কি যেন ভাবে । তারপর ড্রয়ার থেকে সব টাকাগুলো ব্যাগে পুরে সব ভাল করে দেখে নেয় । তারপর খামটা টেবিলে রেখে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায় । একটু পর নেপথ্য থেকে চিরর গলার স্বর শোনা যাবে]

চির ॥ (নেপথ্য থেকে) বুঝলেন অহো দেবী, আপনার স্বামীটি বোধহয় আমার বাইরের বোর্ডটা দেখতে পেয়েছে । সাড়া নেই (প্রবেশ) অহো দেবী আবার কোথায় গেলেন ! (মদনকে লক্ষ্য কোরে) তুই হাঁ কোরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, দেখ কোথায় গেল : গোপালটাই বা কোথায় গেল ।

মদন ॥ (তাড়াতাড়ি টেবিলের তলা, খাটের তলা, আলমারীর পিছন এমনকি চেয়ারের তলা পর্যন্ত ভাল কোরে দেখে নিয়ে) কৈ কেউ নেই তো বাবু ।

চির ॥ (ভাবতে ভাবতে) জলজ্যান্ত মানুষ দুটো…(হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে তাড়াতাড়ি চেয়ারে ওঠে ড্রয়ার খুলে দেখে চীৎকার কোরে ওঠে) মদনরে আমার টাকা—

[গোপাল এক গ্লাস ভর্তি জল নিয়ে তাড়াতাড়ি ঢোকে]

গোপাল ॥ এই যে জল—

চির ॥ জল। কিসের ?

গোপাল ॥ খাবার।

চির ॥ কার জন্যে ?

গোপাল ॥ এ যে অহো দেবী বললেন—

চির ॥ (রেগে) অহো দেবী চাইলেন আর তুমি ভিতরে চলে গেলে। মদন আশ-পাশ ভাল করে খোঁজ—

গোপাল ॥ এখন ?

চির ॥ এখন আর কি এ জল আমার মাথায় ঢাল।

গোপাল ॥ [দৃঢ়তার সুরে] কি হয়েছে বলবি তো ?

চির ॥ সর্বস্বান্ত হোয়ে গেছি। [রেগে চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে ওঠে] আমি পুলিশে যাব, ওকে জেলে পাঠাব।

গোপাল ॥ আরে তোর নামে একটা খাম দেখছি।

চির ॥ আমার নামে খাম ? কৈ পড তো ?

[গোপাল তাড়াতাড়ি চিঠি বার করে পড়তে শুরু করে]

গোপাল ॥ মাননীয় মহাশয়,

বড ঠেকায় পড়েছিলাম। আপাতত শরীর বিক্রী কোরতে হ'ল না। তিন মাসের ভাড়া বাকী। আশি টাকায় দু মাসের মিটবে। হাত দেখাতে এসেছিলাম—পথ দেখে বাড়ী গেলাম। আমি চোর নই। চাকরি খুঁজেও পাইনি। আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধান্তে—

শ্রীমতী অহো

চির ॥ শালা চোর, ঠগ, ধাপ্পাবাজ। (মাথা চাপড়াতে শুরু করে)

গোপাল ॥ (খানিক নীরব থেকে হঠাৎ খুশীর সঙ্গে চীৎকার কোরে) অহো অহো, বড় জোর দিয়েছে।

চির ॥ খুব খুশী হয়েছো না! আমার সর্বনাশ—তোমার পোষ মাস। এখন …এখন আমি কি করব? [মাথা চাপড়াতে থাকে]

মদন ॥ বাবু হাওয়া করব।

চির ॥ কেন…হাওয়া করবি কেন?

মদন ॥ মাথা ঠাণ্ডা না হ'লে,—এ ব্যবসা চালান মুস্কিল।

চির ॥ তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না। ঘরের সব কিছু ভাল করে আবার খুঁজে দেখ। ওঃ এই কি কলকাতা?

[মদন সব কিছু খুঁজতে শুরু করে]

গোপাল ॥ না:, মানে এটা কলকাতা নয় কলতলা। চোখের জলে পিছল হয়ে আছে। দেখে পা ফেলতে না পারলে—একদম ধড়াস।

চির ॥ [চিৎকার কোরে] থাক তোমাকে আর সাহিত্যের ফোয়ারা ছোটাতে হবে না। [মদনকে] আঃ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন যে।

[মদন দ্রুত খাটের তলায় ঢুকে দেখতে শুরু করে]

(হতাশার সুরে) এখন এখন আমি কি করব!

গোপাল ॥ বাবা: সাবাস অহো।

হাত দেখাতে এসেছিলাম

পথ জেনে বাড়ী গেলাম।

[বারবার এই কথাগুলো পড়তে শুরু করে। সুর আস্তে থেকে চরমে ওঠে। চির হাত পাখায় নিজের মাথার ওপর হাওয়া দিয়ে চলে। মদন খাটের তলা থেকে চীৎকার করে চলে—"বাবু এখানে কেউ নেই।" ধীরে ধীরে ঘর অন্ধকার হয়ে আসে।

চোর॥ আপনাদের এই মহানুভবতা আমি কোনোদিনই ভুলব না। আপনাদের স্নেহের ছায়ায় ও আপনাদের জগৎপ্লাবিত চৌর্য প্রতিভার স্পর্শে আমিও একদিন আপনাদের মতো বুদ্ধিমান চোর হয়ে উঠব এই আশাই করি!

সকলে॥ নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই।

[সবাই দাঁত বার করে হাসতে থাকে। পর্দা পড়ে।]

অগ্নিহোত্রী

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

॥ চরিত্র ॥

রাম — অরুণ

বরুণ — হরি

যাদব

[মধ্যবিত্ত পরিবারের বসবার ঘর। অবশ্য দিনে এটা বসবার ঘর হলেও রাত্রে এটাই শোবার ঘরে পরিবর্তিত হয়। একপাশে গোটানো বিছানাসমেত চৌকিটাই তার প্রমাণ। একটি ছোট্ট টেবিলকে কেন্দ্র করে সুদৃশ্য গোটা তিনেক চেয়ার সাজানো রয়েছে। দেওয়ালের ছবি থেকে টেবিলের ঢাকনা পর্যন্ত—সব কিছুতেই অভিজাত রুচির পরিচয় বিদ্যমান। সম্ভাব্যক্ষেত্রে কুটীর শিল্পজাত কিছু দেওয়াল-সজ্জা ব্যবহার করলে ভাল হয়।

সময়: কোন রবিবারের সকাল ৯টা।

পর্দা উঠলে দেখা যাবে রামরতনবাবু একা একটি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। সামনের ছোট্ট টেবিলে ধূমায়িত চায়ের কাপ। সামান্য সময় কেটে যাবার পর অরুণ ভেতর বাড়ী থেকে প্রবেশ করে রামরতনবাবুর সামনে এসে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। রামরতনবাবু ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে নির্বিকার চিত্তে চা খেতে থাকেন। তারপর হঠাৎ চায়ের পেয়ালাটি নামিয়ে রেখে অরুণের দিকে না তাকিয়ে—এবং নিবিষ্টচিত্তে খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে—]

রাম ॥ কিছু বলবে ?

অরুণ ॥ না…মানে…

রাম ॥ মানেটা আমি করে নেব। সমস্ত ভনিতা বাদ দিয়ে তোমার যা বলার আছে—সোজাসুজি বলে ফেল।

অরুণ ॥ না ··ইয়ে····মানে—বলছিলাম কি, বরুণকে আপনি একটু সাবধান করে দিন।

রাম ॥ কেন!

অরুণ ॥ আপনি তো জানেনই চারপাশে বেশ ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে। এখানো যদি ও অবুঝের মত যেখানে সেখানে "ইনক্লাব—জিন্দাবাদ" করে বেড়ায়—!

রাম ॥ (হঠাৎ চোখ তুলে) ১৯০৫ সালে আমার পিতৃদেব আমাকে একবার সাবধান করতে চেয়েছিলেন। উত্তরে আমি কি বলেছিলাম জান? (অরুণ মাথা নীচু করে থাকে) বলেছিলাম—ছেলেকে মাথা নীচু করতে শিখিও না বাবা। যাতে দেশের অকল্যাণ রয়েছে, এমন কোন উপদেশ আজ শুধু স্নেহের বশে দিতে এস না। (স্মৃতি-রোমন্থনে যেন বহুদূরে চলে যান) উই হ্যাড আওয়ার ডেজ। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে—হাতে হাত মিলিয়ে সেটেলড্ ফ্যাক্টকে আমরা আনসেটলড্ করে দিয়েছিলাম। উই গট দ্য জায়েণ্টস অব বেঙ্গল ইন আওয়ার সাইড। কোন বাবার উপদেশ, কোন মায়ের চোখের জল সেদিন আমাদের ঘরের কোণে বেঁধে রাখতে পারেনি। চৌদ্দ বছরের নাবালক শিশু আমি তখন। তবু বাবার ধমকে আমার আবেগ সেদিন ভেসে যায়নি। লাঠি বন্দুক কিংবা জেল অথবা ফাঁসির ভয়ে সেদিন কেউ ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকে নি।···দ্যাট গোল্ডেন পিরিয়ড অব বেঙ্গল! ঘরে ঘরে সেদিন সোনার ফসল ফলেছিল! উই অয়্যার ইউনাইটেড দেন। উই হ্যাড বিন দ্য মাউণ্টেনস অব রেজিসট্যান্স!

অরুণ ॥ (সঙ্কোচে) আমি জানতাম—আপনাকে বলতে এলেই···

রাম ॥ ৪২-এর আন্দোলনে আমি তো তোমাকেও সাবধান করেছিলাম।

সেদিনের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে একবারও স্মরণ রেখেছিলে আমার কথা ?

অরুণ। সেটা ছিল স্বাধীনতার আন্দোলন !…

রাম। (অন্যমনস্ক) কে জানে—হয়তো বরুণের রাজনীতিটাও আসলে স্বাধীনতারই আন্দোলন।

অরুণ। (বিরক্ত) আপনি মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলেন…

রাম। যার কোন মানে খুঁজে পাও না !—তা তোমাদের সরকারী অফিস থেকে শুরু করে একেবারে সরকার বাহাদুর পর্যন্ত মাঝে মাঝে এমন সব কাজ করেন, যার কোন মানে আমিও খুঁজে পাই না। (অন্যমনস্ক) আজ দেখছি সমস্ত পৃথিবীটা শুধু কথার মানে নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছে। বুকের কথাটা সোজা মুখে চলে এলে দেখি হাজার জনে তার হাজার মানে করে বসে আছে। পলিটিক্স রূপান্তরিত হয়েছে ডিপ্লোম্যাসীতে ! আর ডিপ্লোম্যাসীটাও আসলে হয়ে উঠেছে হিপোক্র্যাসী। —হরি !—হরি ! (হরির প্রবেশ)—আর এক কাপ চা নিয়ে আয়।

হরি। ডাক্তারবাবু আপনাকে চা খেতে বারণ করেছেন।

রাম। সে তো আমাকে চা খেতে বারণ করেছেন। তোমাকে চা দিতে তো বারণ করেন নি।

হরি। (নির্বিকার) তাও করেছেন। চুপি চুপি আমাকে ডেকে বলে গেছেন—বড়কর্তা চা চাইলেও তুমি দেবে না। যদি খুব চেঁচামেচি করেন, তবে কালা সেজে বসে থাকবে।

রাম। চা তুই দিবি কিনা তাই বল।—কি ? চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? (হরি নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে আছে দেখে) হতচ্ছাড়া বাঁদর !—এখন তুমি কালা সেজেছ ?

হরি। তা—না সেজে আমার উপায়টা কি ? চা খেলে আপনার রোগ বাড়বে। আর চা দিলে বড়দাদাবাবুর রোখ বাড়বে।

অরুণ ॥ যা—চিনি ছাড়া এক কাপ চা এনে দে।

রাম ॥ থাক। চায়ের বদলে চিরতা খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।

অরুণ ॥ (ঝাঁঝের সঙ্গে) যা—তাহলে চিনি দিয়েই এক কাপ চা এনে দে।

হরি ॥ না—সে আমি দেব না। চাকর-বাকরকে অত খাটিয়ে দেওয়ার দিন আজকাল আর নেই। এ বাড়ীতে চা একবারই হবে। তাতে যার পোষাবে না, তাকে নিজের হাতে চা করে নিতে হবে।

অরুণ ॥ (ধমক) হরি!…কার সামনে কি কথা বলতে হয় সেটুকুও শেখোনি।

রাম ॥ (অত্যন্ত গম্ভীর) হরি!—তুই ভেতরে যা।

হরি ॥ তার চেয়ে বলুন না—একেবারে বাইরে চলে যাই। একজন বার বার [illegible]ছেন। আর একজন দিনে আঠারো বার ধমকাবেন। আর একজন রাত বারটায় এসে চুপিচুপি বলবেন—হরিদা, কেউ জেগে নেই তো। চুপি চুপি আমাকে ভাত দিয়ে দাও!—তা অত ল্যাঠা আমি পোয়াতে পারবো না।

রাম ॥ সারা জীবন পুইয়ে এসে আজ পোয়াতে পারবো না বললে তো চলবে না! দয়া করে এবার ভেতরে যাও—যতদূর মনে হচ্ছে (নাক টেনে) উনুনে চাপিয়ে রেখে আসা ভাত বোধহয় ধরে গেছে।

হরি ॥ সর্বনাশ! ভাতের কথা তো আমার মনেই ছিল না! (দ্রুত প্রস্থান)

রাম ॥ (অত্যন্ত গম্ভীর) হরি এ বাড়ীর চাকর নয় অরুণ! ও এই পরিবারেরই একজন। কার সামনে কি ভাবে কথা বলতে হয় সেটুকু ও খুব ভাল ভাবেই জানে। শুধু তোমার সেটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই।

অরুণ ॥ পরশু দিনও ও স্ট্রাইকের মিছিলে বরুণের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে।

রাম ॥ বরুণকে ও সব চাইতে বেশী ভালবাসে। এমনও হতেও পারে—কোন বিপদ-আপদ ঘটলে বরুণকে বুক দিয়ে আগলাবার জন্যেই ও বরুণের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে।

অরুণ ॥ তা—বরুণেরই বা কি দরকার ষ্ট্রাইকের ব্যাপারে এত মাতামাতি করবার।

রাম ॥ তোমার কি দরকার ছিল ৪২-এর গুলিগোলার মাঝে রাস্তায় ইঁটপাটকেল ছুঁড়ে বেড়াবার। আমারই বা কি দরকার ছিল—১৯০৫-এর রক্তক্ষরা বাংলায় অপরিণত শিশুমন নিয়ে নেচে বেড়াবার। আগুনে হাত রেখে যারা হাতের শিকলটাকেই গলিয়ে নিতে চায় তারা আগুন দেখে ভয় পায় না। আই হ্যাভ সীন সো মেনি ব্রাইট বয়েজ। বুকের রক্ত ঢেলে যারা হাতের পতাকাটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছিল। আজ তাদের আমি দেখতে পাই না। ঐ হরি বা বরুণের মধ্যে যদি অতীত ভারতের শহীদদের বুকের আগুন সমান ভাবে জ্বলে ওঠে তাতে তোমার এত আপত্তি কিসের ?

অরুণ ॥ আমি একা হলে আমার কোন আপত্তি ছিল না। আমার চাকরীটা গেলে—আপনার বা বরুণের খাবার ব্যবস্থাও আমি করতে পারবো না।

রাম ॥ করতে হবেও না। স্বাধীনতার যে স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, সেই স্বপ্নের কোথাও এমন বিচিত্র শাসন-ব্যবস্থার স্থান ছিল না। (স্বগত) আওয়ার ড্রীম ইজ আনরিয়ালাইজড—এ্যাণ্ড উই আর ফ্রী !

অরুণ ॥ পুলিশ থেকে বরুণ সম্পর্কে ইনভেষ্টিগেশন শুরু হয়েছে।

রাম ॥ কি ?

অরুণ ॥ কাল অফিসে এক পুলিশ ভদ্রলোক এসে আমার কাছে বরুণ সম্পর্কে নানা কথা জিগ্যেস করেছেন। ঠিকানাও চেয়ে নিয়েছেন।

রাম ॥ বরুণের ঠিকানাটাও তারা জানে না—অথচ তলায় তলায় বরুণ সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট তৈরী হয়ে যাচ্ছে ! চমৎকার !—এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি সরকারী অফিসে কাজ করো !

অরুণ ॥ (বিনীত অথচ দৃঢ় স্বরে) আমাদের বর্তমান আলোচনাটি ঠিক সরকারী অফিস কিংবা আমার সম্বন্ধেই হচ্ছে না।

রাম ॥ জানি।…ঠিক আছে--আমি বরুণকে বলে দেব। বলে দেব—তোমার দাদার চাকরীটুকু তোমার খাওয়া-পড়ার জন্যেই দরকার। সুতরাং স্বমতনিষ্ঠা কিংবা সততা শিকেয় তুলে রেখে দাও। দি ওয়ার্ড ডিমোক্রাসি ইজ এ ফার্স! ফ্রিডম ইজ ফর দি ম্যাক্সিমাম ফেসিসিয়েটেড ক্লাস! উই লিভ ইন এ্যান এজ—হয়ার অল দা ভ্যালুস আর স্টার্টার্ড। এ্যাণ্ড দা ব্যাকবোনস…ব্রোকেন!

অরুণ ॥ (অত্যন্ত দৃঢ় স্বরে) আপনি যদি চান তাহলে বরুণকে নাও বারণ করতে পারেন। মতামত নিয়ে চুলচেরা তর্ক করার জন্য আমি কোন কথা তুলিনি। বর্তমান জগতে বেঁচে থাকার একটা প্র্যাকটিকাল দিক আছে। চাকরী যাওয়ার ভয়টা শুধু আমার জন্যেই আমি পাইনি। চাকরীটা গেলেও নিজের পেটটা চালাবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা আমার আছে…।

রাম ॥ সেই ক্ষমতাটা শুধু আমাদের নেই! (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অত্যন্ত ভারী গলায়) বরুণের কথা আমি জানি না—কিন্তু…পেট চালাবার মত ক্ষমতা আমার যদিও নেই, তবু না খেয়ে মরার মত ক্ষমতা আমার আছে। বেঁচে থাকার প্র্যাকৃটিকাল সাইডের কথা বলছিলি না! শোন—কাছে আয়। (মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) মৃত্যু-বরণেরও একটা প্র্যাকটিকাল সাইড আছে। ক্ষুদিরাম থেকে রামেশ্বর পর্যন্ত এক একটা সোনার প্রদীপ নিজেরা নিভে গিয়ে ঘরে ঘরে হাজার প্রদীপের রোশনাই জ্বেলে দিয়ে গেছে। অরুণ—মরার মত কিছু প্রাণ যদি একটা জাতের বেঁচে না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে জাতটা আগাগোড়া নিষ্প্রাণ।

অরুণ ॥ (শান্তস্বরে) আপনি কি চান—বরুণ ধরা পড়ুক, আমার চাকরীটা যাক?

রাম ॥ (হঠাৎ দারুণ উত্তেজিত) চাই—চাই; সারা জীবন তাই চেয়েছি। আজ চিতার দিকে পা বাড়িয়েও তাই চাই। বুকের আগুনে মশাল ধুঁয়িয়ে

আমরা যারা অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলাম, তারা কেউ এমন সুখ বা স্বস্তি কখনো চাইনি—যা পাঁচজনের সঙ্গে সমান ভাগ করে নেওয়া যায় না। সংগ্রামের দিনে আমরা সকলে দুঃখটাকে ভাগ করে নিয়েছি। কিন্তু স্বাধীনতার দিনে দেখছি সুখের ভাগটা গিয়ে পড়েছে মাত্র কয়েকজনের হাতে ! [হরির প্রবেশ]

হরি ॥ এত চেঁচামেচি হলে এ বাড়ীতে কাজ করা যাবে না।

রাম ॥ যখন চেঁচানো দরকার—তখন চেঁচামেচি হবেই !

হরি ॥ এক আমার সঙ্গে ছাড়া আর কারো সঙ্গে চেঁচামেচি করা আপনার বারণ।

রাম ॥ এটাও কি ডাক্তার বলে গেছে নাকি ?

হরি ॥ না—এটা আমি বলছি !

রাম ॥ তা—হারামজাদা, তুইও কি ডাক্তার হয়ে উঠেছিস ?

হরি ॥ আপনার ধাতটা তো আমি চিনি ! আর চিনিই যখন—তখন একটু ডাক্তারী করতে দোষটা কি আছে ?

রাম ॥ জ্বালালে দেখছি ! দেখ—তুইও যদি ডাক্তারী শুরু করিস !

হরি ॥ করিনি এমন তো নয়। পায়ে যে-বার গুলি লেগেছিল—সেবার আমিই তো শোন্না আর নরুণ দিয়ে গুলি বার করেছি। রোজ ঘা পরিস্কার করেছি আমি। শিকড়-বাকড় বেঁটে ঘা সারিয়ে তুলেছি আমি।

রাম ॥ ওঃ ! সেসব কথাও তোর মনে আছে !

হরি ॥ মনে থাকবে না ! আপনার চোখে তখন আগুনের ঝিলিক খেলতো :

রাম ॥ (সাগ্রহে) এখন—এখন সেই আগুনের ঝলক আমার চোখে আর নেই—না ?

হরি ॥ আছে। মাঝে মাঝে সে ঝিলিক হঠাৎ থেকে থেকে চমকে ওঠে। আর সেটাই তো ভয়ের কথা বড় কর্তা ! নেভার আগে পিদীম সব দপদপিয়ে জ্বলে ওঠে।

রাম ॥ (হঠাৎ হেসে ফেলে) তুই হতচ্ছাড়া ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কেবল মরার কথাটা আমাকে মনে করিয়ে দিস কেন বলতো ?

হরি ॥ মরণকে তো আর ঠেকানো যাবে না। আর সে সময় আপনার হয়েও এসেছে।

অরুণ ॥ (গর্জন) হরি!

রাম ॥ (স্বগত) কিন্তু মরার আগে আমার চোখের আগুন বুকের আশা কার হাতে তুলে দিয়ে যাবো হরি ? আমার পাশে দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে ছিটকে পড়েছিল তোর কাকা। ছোট জাতের ঐ মানুষটা মরার আগে জেনে গেছলো স্বাধীনতা এলে দুঃখী লোকের আর কোন দুঃখ থাকবে না। মরার আগে তার চোখের আলো এসে বাসা বেঁধেছিল আমার চোখে। কিন্তু আমি মরার আগে সেই সোনার প্রদীপ আমি তুলে দেব কার হাতে ?

হরি ॥ বড দাদাবাবুর হাতে।

রাম ॥ কার হাতে ?

হরি ॥ বড দাদাবাবুর হাতে।

রাম ॥ (সবিদ্রূপে) কেন তোর পেয়ারের ছোট দাদাবাবু...

হরি ॥ ছোট দাদাবাবুকে আমি আগলে বেড়াই। তাই বলে তাকেই আমি বেশী ভালবাসি এমন কথা ভাবলেন কি করে ? অল্প বয়েস থেকে আপনাদের সংসারে মানুষ হয়েছি। আপনার কাছে থেকে শিখেছি অনেক - দেখেছি অনেক, আপনারই আশেপাশের কত লোককে ভোল ফিরিয়ে হঠাৎ গাজনের সন্ন্যেসী হতে দেখেছি।

রাম ॥ (প্রস্থানোদ্যত অরুণকে) চললে কোথায় ?

অরুণ ॥ এখন তো আপনাদের ঐ "গাজনের সন্ন্যেসী" নিয়ে আলোচনার আসর বসবে।

রাম ॥ না - আজ তা বসবে না। পরিবারের একমাত্র আরনিং মেম্বার হিসাবে আজ তোমার সমস্যা নিয়েই আলোচনা হবে।

অরুণ ॥ আমার কোন সমস্যা নেই। সমস্যা যদি কিছু থেকে থাকে সেটা সমস্ত পরিবারের।

রাম ॥ বরুণ ধরা পড়লে সমস্যার মধ্যে বাকী থাকি এক আমি আর হরি।…

হরি ॥ আমি কোন সমস্যা নই বড কর্তা। ছোট ঘরের ছেলে আমি—শুধু আপনাদের কাছ থেকে কিছু ভদ্র কথাবার্তা শিখে ফেলেছি। তা—মুটেগিরি করেও আমার দিন চলে যাবে।

[বাইরে থেকে বরুণের প্রবেশ]

বরুণ ॥ কে তোমাকে মুটেগিরি করতে দিচ্ছে?

হরি ॥ তোমার দপদপানি না কমলে আমার কপালে ঐ মুটেগিরিই আছে।

বরুণ ॥ (হঠাৎ গম্ভীর ভাবে সকলের দিকে তাকিয়ে) কথাটার মানে কি দাঁড়ালো?

বরুণ ॥ তোমার সম্বন্ধে পুলিশ ইনভেষ্টিগেশন চলছে।

বরুণ ॥ কারো না কারো সম্বন্ধে ইনভেষ্টিগেশন করাই পুলিশের কাজ।

রাম ॥ এতে বড বাবুর চাকরীটা যাবার সম্ভাবনা আছে—এ কথাটা কখনো ভেবে দেখেছ?

বরুণ ॥ একটা ইনভেষ্টিগেশনেই অত সহজে চাকরী যায় না।

অরুণ ॥ সরকারের ওপরে এ ব্যাপারে তোমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে তা'হলে?

বরুণ ॥ বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কোন কথা হচ্ছে না। আমি এমন কিছুই করিনি যার জন্য তোমাদের মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকতে হবে।

অরুণ ॥ তাহলে আমার অফিসে পুলিশ এসে তোমার সম্বন্ধে এত কথা জিগ্যেস করলো কেন?

[হরির ভেতর বাড়ীতে প্রস্থান]

বরুণ ॥ সেটা সেই পুলিশকে জিগ্যেস করলেই পারতে।

অরুণ ॥ না—পারতাম না। তিনি নিশ্চয়ই সব কথা আমাকে খুলে বলতেন না।

বরুণ ॥ খুলে বলার মত কোন গোপন কাজ আমি করিনি।

রাম ॥ কিন্তু পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত প্রকাশ্য কোন কাজ করেছ কি?

বরুণ ॥ না।…এটুকু বোধ—বুদ্ধি আমার আছে যে, আমার পক্ষে কোনরকম বিপজ্জনক রাজনীতি করা সম্ভব নয়। হরতালের পক্ষে মিছিলে ঘোরাটা আমি নাগরিক কর্তব্য বলে মনে করেছি। সরকারের সমালোচনা করাটাও আমার নাগরিক অধিকার। বন্ধুবান্ধবের আড্ডায় সে সমালোচনা আমি প্রায়ই করে থাকি।

রাম ॥ (শ্লেষের সঙ্গে) অর্থাৎ কাজের কাজ কিছুই করো না। অথচ অযথা পুলিশকে তাড়িয়ে নাও। আই হ্যাভ নেভার সীন সাচ এ্যান ইডিয়টিক এ্যাডভেঞ্চারিজম! ডু—জাষ্ট ডু সামথিং। তারপর জেলে যাও—মারা যাও—কিংবা জাহান্নামে যাও তাতে কিছু যায় আসে না। সরকারের সমালোচনা করাটা তোমার জন্মগত অধিকার!

বরুণ ॥ কি! কি! —করবোটা কি? কাদের নিয়ে কি করবো? কোথায় গিয়ে কি করবো?…দুবছর চেষ্টা করে একটা চাকরী জোগাড় করতে পারিনি। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সংসারের চিন্তায় দাদার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি তো জানি—হরিদা ইচ্ছা করে কম ভাত খায়! …বাট হোয়াট উড আই ডু?—এক আত্মহত্যা করতে পারি। একটা মানুষকে শুধু শুধু বসিয়ে খাওয়ানোর হাত থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে দিতে পারি। তাই চাও?—বলো তাই চাও?

রাম ॥ (অত্যন্ত দৃঢ় স্বরে) তার আগে একবার আত্মরক্ষার লড়াইয়ে নেমে দেখবি না কে হারে কে জেতে?

বরুণ ॥ চিরকাল আমরাই হেরেছি। দাদার চাকরী কিংবা বাবার পেন্সনের দিকে তাকিয়ে আমরা কিল খেয়ে কিল হজম করেছি। মানুষের স্বপক্ষে

বড বড লেকচার দিয়ে লুকিয়ে চেষ্টা করেছি কোন বড চাকরি বাগাবার। তারপর চাকরীটা পেয়েই ভুলে গেছি লডাইয়ের সঙ্গীদের।... এই ভাবেই আমরা বার বার হেরেছি।

অরুণ ॥ তুই কি আমাকে ঠাট্টা করছিস বরুণ!

বরুণ ॥ না-না। এ শুধু তোমার আমার প্রশ্ন নয়। এ শুধু ঠাট্টার প্রশ্ন নয়। পাডার সকলে আমাদের বাড়ীটাকে ঠাট্টা করে বলে "বিপ্লবী বাডী"! বাবাকে ঠেস দিয়ে বলে—৭৫ বছরের ইয়ং ম্যান! (হঠাৎ ঘুরে রামকে) এই তো—এই তো তোমাদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ! যৌবনের দিনগুলো বনে জঙ্গলে কাটিয়েছ এরই জন্য!

রাম ॥ (দূরাগত স্বরে) আমাদেব স্বপ্নটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে বলেই তো আমাদের দুঃখ। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড দুঃখ আমাদের সেই স্বপ্ন কেউ বুকে তুলে নিলো না।

অরুণ ॥ কেউ হয়তো বুকে তুলে নিয়েছে।—কিন্তু আপনি তাদের চিনতে পারেননি।

রাম ॥ হয়্যার দে আর? তারা আলোর সামনে এসে দাঁডাক উদ্ভাসিত অগ্নিস্নানে মাথা উঁচু করে বলুক—অমৃতের পুত্র আমরা অমৃতে আমাদের জন্মগত অধিকার। বলুক—প্রবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা অটল পর্বত। বলুক—সভ্যতার শব সাধনায় আঘোরপন্থীর তান্ত্রিক আমরা—অনায়াসে আমরা শ্মশানে বাসর বসাই।

অরুণ ॥ (রামকে ধরে) কোন রকম উত্তেজনা আপনার পক্ষে খারাপ।

রাম ॥ জানি। জানি। কিন্তু উত্তেজনার কারণগুলোকে জীইয়ে রাখা একটা জাতির পক্ষে আরো অনেক বেশী খারাপ। আই ওয়াণ্ট টু সী দ্য সোসাইটি চেঞ্জড্। আই এ্যাম সার্চিং ফর দ্য স্পার্ক—দ্য স্পার্ক ইন এভরি আই।

বরুণ ॥ পালা জ্বরের রুগীর মত সমস্ত দেশটা যেখানে ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণায়

শিউরে উঠছে, তখন তুমি প্রতিটি চোখে ভোরের আলো দেখতে চাও। অন্ধকার হাৎড়ে মানুষ আজ শুধু কাদা আর পাঁক তুলছে—সেখানে তুমি পদ্মরাগমণি খুঁজছো!—একে বলে পাগলামী!...

রাম॥ (চীৎকার) সাট্ আপ! ইফ ইট ইজ ম্যাডনেস—আই লাইক টু সি এভরি ওয়ান ম্যাড।

[হরির প্রবেশ]

হরি॥ আবার চটলেন কার ওপর?

রাম॥ নিজের ওপর—নিজের ওপর।

হরি॥ তাহলে নিজের হাত কামড়ান।

রাম॥ কি?

হরি॥ তাহলে নিজের হাত কামড়ে ধরুন—রাগ পড়ে যাবে।

রাম॥ তোর সাহস অত্যন্ত বেড়ে গেছে হরি। একদিন তুই আমার হাতে নির্ঘাৎ খুন হবি।

হরি॥ তা—শুভ কাজে দেরী করে আর লাভটা কি? একটা লাঠি নিয়ে আসি—ঠেসে বসিয়ে দিন আমার মাথায়।

রাম॥ তোমার ঐ নীরেট মাথা শুধু লাঠিতে ভাঙবে না।—যা, এক কাপ চা নিয়ে আয়।

হরি॥ হবে না।

রাম॥ দেখ হরি...

হরি॥ দেখবার কিছু নেই। যা দেখবার তা আমি রোজই দেখছি।

বরুণ॥ হরিদা—আমাকে কেউ ডাকতে এসেছিল?

হরি॥ হ্যাঁ। তোমার ইয়ার দোস্তরা এসেছিল। আর একজন পুলিশের লোকও এসেছিল।

বরুণ॥ কিসের লোক এসেছিল?

হরি ॥ পুলিশের লোক।—তা— তুমি নেই শুনে চলে গেছে। মনে হয় ঘুরে আসবে।

বরুণ ॥ এঁ্যা! আ-আমার বইগুলো সব সরিয়ে ফেলেছ?

হরি ॥ ঐ বই দিয়েই তো আজকের ভাত রান্না হয়ে গেল।

রাম ॥ একটু আগেই না বলছিলে—এমন কিছুই করোনি যাতে পুলিশের নজর তোমার ওপর পড়তে পারে!

বরুণ ॥ সে তো এখনও বলছি।

রাম ॥ তাহলে ওসব বই-ফই সব এল কোত্থেকে?

বরুণ ॥ সে অনেক দিন আগে কিনেছিলাম।

হরি ॥ নতুন বইও দু একখানা ছিল।

বরুণ ॥ সর্বনাশ! সেগুলোও উনুনে দিয়েছ নাকি?

হরি ॥ তা যা পেয়েছি সবই দিয়েছি।

বরুণ ॥ নাঃ! চেকভ গোর্কী টমপেন পর্যন্ত আগুনে পুড়ে শেষ হোল। এর চেয়ে আমার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আমাকে পুড়িয়ে দিলেই তো পারতে।

হরি ॥ যদি বলেন—তবে তাও করতে হবে। আপনাদের কথা তো আর ঠেলতে পারি না।

অরুণ ॥ চেকভ-গোর্কী-টমপেন আর মার্ক টোয়েনের বইগুলো আমি আলাদা করে সরিয়ে রেখেছি।

বরুণ ॥ তার মানে তুমি সবই আগে থেকে জানতে?

অরুণ ॥ আমি জানতাম না কিছুই। আর এখনো কিছুই জানি না। শুধু জানতাম—তোমার কিছু বই পোড়ানোর দরকার হবে খুব শিগগির।

বরুণ ॥ সেটাই বা কি করে জানতে?

রাম ॥ তুই কি জেরা করছিস নাকি?

বরুণ ॥ না। আমি শুধু আশ্চর্য হয়ে ভাবছি—আমার সম্বন্ধে তোমরা এত খবর রাখ, অথচ তোমাদের কোন খবর আমি জানতে পারি না কেন ?

রাম ॥ তার কারণ আমাদের দিকে তুমি ফিরেও তাকাও না। আপন খেয়ালে কিংবা আপন স্বার্থে…

বরুণ ॥ বাবা।…

রাম ॥ চেঁচাবে না। কোন গরম চোখ আমাকে কখনো নরম করতে পারেনি

[নেপাথ্য : বরুণবাবু বাড়ী আছেন ?]

বরুণ ॥ কে ?

[নেপথ্যে : বরুণবাবু বাড়ী আছেন ?]

রাম ॥ আছেন—আপনি ভেতরে আসুন।

[পুলিশ ইনস্পেক্টর যাদব বোসের প্রবেশ]

যাদব ॥ আমি ইনস্পেক্টর যাদব বোস আশা করি আমি এসে আপনাদের কোন অসুবিধে করলাম না। অবশ্য এই সব ধড়াচূড়া ছেড়েই আমার আসা উচিৎ ছিল। [রুদ্রির ভিতরে প্রস্থান।]

বরুণ ॥ তার মানে প্লেন ড্রেসে ?

যাদব ॥ এক্জাক্টলি।—বসতে পারি ?

রাম ॥ নিঃসন্দেহে। এসেছেন যখন—তখন বসবেন, চা খাবেন। তারপর যাবেন।

যাদব ॥ (বিদ্রূপটা গায়ে না মেখে) তারপর বরুণ…

বরুণ ॥ (তীব্র দৃঢ়স্বরে) আমাকে বরুণবাবু বলবেন।

যাদব ॥ (হঠাৎ যেন সচেতন হয়ে) ওঃ ইয়েস ইয়েস। ইয়েস মিষ্টার বরুণ-বাবু, আপনার খবরাখবর বহুদিন পাইনি…

রাম ॥ দ্যাট ইজ আটার ফুলিসনেস অব ইওর পুলিশ ডিপার্টমেণ্ট। ও সারাজীবন এখানেই রয়েছে। এতেও যদি ওর খবর আপনারা বহুদিন

ধরে না পান, তাহলে আপনাদের আই. বি. ডিপার্টমেণ্ট তুলে দেওয়া উচিৎ।

যাদব ॥ আইসী! আ-আপনারা কি ভেবেছেন বলুন তো?

রাম ॥ যারা কখনো কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়নি—আজকালকার দিনে তাদের বাড়ীতেও পুলিশ এলে যা ভাবা উচিৎ আমরা তাই ভেবেছি। বাট ইউ আর রং ইনস্পেক্টর। বরুণকে যা ভেবেছেন, বরুণ তা নয়।

যাদব ॥ কি ভেবেছি?

রাম ॥ সঠিক কি ভেবেছেন জানি না। শুধু এইটুকু জানি হি ইজ নট মিলিট্যাণ্ট এনাফ। আই স্যুড হ্যাভ বীন প্রাউড অব হিম, ইফ হি অয়্যার ছাট। ও জেলে গেলেও আমি এর চেয়ে অনেক বেশী শান্তি পেতাম। বাট হি ইজ নাথিং—নাথিং বাট এ কমন সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া উইথ এ্যান একসেনট্রিক টেন্‌ডেন্সি ফর ক্রিটিসাইজিং দা গভর্ণমেণ্ট। সরকারের সমালোচনা এবং বাড়ীর অন্ন ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন কিছুই ও করেনি, কোন কিছু করার মত সাহসও ওর নেই। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ও হরতালের মিছিলে যোগ দেয়। তারপর বাড়ীতে এসে বই পুড়িয়ে রোমাণ্টিক গ্ল্যামার তৈরী করে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে ওরা মাঝে মাঝে উত্তেজনার আগুন পোহায়।...

অরুণ ॥ ডাক্তার আপনাকে বেশী কথা বলতে বারণ করেছেন বাবা।

যাদব ॥ আপনি আমাকে আগা-গোড়া ভুল বুঝেছেন। আপনারা সবাই আমাকে ভুল বুঝেছেন।

রাম ॥ আপনিই ভুল বুঝেছেন ইনস্‌পেক্টর! দি রিভিলিউশন ইজ ডেড ইন দিস হাউজ। পাড়ার লোকেরা এই বাড়ীটাকে ঠাট্টা করে বলে "বিপ্লব-বাড়ী"! সারকাজম! এ বিটার সারকাজম ফর মি।

যাদব ॥ কি আশ্চর্য! আপনারা সবাই মিলে যদি আমাকে এ ভাবে বিব্রত করেন।

অরুণ ॥ কোন রকম বিব্রত বোধ না করে—আপনার যা জানার আছে জেনে নিন।

যাদব ॥ আমার কিছুই জানার নেই।

অরুণ ॥ তাহলে এসেছেন কেন ?

যাদব ॥ সেটাইতো বলতে চাইছি এতক্ষণ ধরে। আপনারাই তো কোন সুযোগ দিচ্ছেন না।

অরুণ ॥ বেশ। এবার বলে ফেলুন।

যাদব ॥ (হঠাৎ বরুণের দিকে ঘুরে , বরুণ—তুই কি সত্যিই আমাকে চিনতে পারছিস না ?……কি ? অমন হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছিস কেন ? .. যাদবকে মনে পড়ে ?

বরুণ ॥ আপনি…মানে—তুই—তুই যাদব ! মানে যেদো !

যাদব ॥ হ্যাঁ। যেদো।…কিন্তু কি ব্যাপার বলতো ?

রাম ॥ [দূরাগতস্বরে] উই হ্যাড আওয়ার ড্রীমস ! এ্যাণ্ড উই লষ্ট ড্রীমস ! স্বপ্নহীন দুই চোখে আজ শুষ্ক-মরুর অন্তর্দাহ। আই ডু নট নো ফর হুম দি বেল টোলস্ ! বাট দেয়ার ইজ নান টু আনসার ইট। বনজঙ্গল পাহাড় পর্বত পেরিয়ে ধূসর অতীতের কিছু দুরন্ত দামাল ছেলেরা আগুনে হাত রেখে হাতের শিকল গলাতে চেয়েছিল। সগর্বে মাথা উঁচু করে তারা বলেছিল—আমৃত্যু সংগ্রামের শপথ নিয়েছি আমরা; আমাদের প্রাণের প্রদীপ নেভার আগে ঘরে ঘরে আমরা হাজার প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে যাব। কোথায়—সেই প্রদীপ্ত উত্তরাধিকার কোথায় ?

অরুণ ॥ বাবা !

রাম ॥ সাট-আপ ! (ভীষণ বিদ্রূপ) বরুণকে পুলিশে ধরবে ! অল ইম্‌বেসাইলস এ্যাণ্ড রেপ্টাইলস ! বুকে হামাগুড়ি দিয়ে সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। শিরদাঁড়া সিধে মানুষগুলো কি একেবারে হারিয়ে গেল !

আমায় স্বপ্ন আমি কার চোখে রেখে যাব ? আমার বুকের উত্তাপ দিয়ে যাব কার বুকে ?

যাদব ॥ আপনার উত্তরাধিকার মাথায় তুলে নিয়েছে আপনার বড ছেলে।

রাম ॥ হোয়াট ?

অরুণ ॥ যাদববাবু !

যাদব ॥ সমস্ত কাজ আপনি অত্যন্ত সংগোপনেই করছেন অরুণবাবু। কিন্তু সরকারী অফিসের মধ্যে আপনার অতি নীরব রাজনৈতিক কার্যকলাপের খবর সঠিক জায়গাতে ঠিক সময়ই পৌছে যায়।

অরুণ ॥ আপনি কি আমাকে ভয় দেখাতে এসেছেন ?

যাদব ॥ না। আমি এসেছি আমার পুরণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। এত কথা হয়তো বলতামও না। কিন্তু আপনার বাবার দুঃখটা দূর করার জন্যই কথাটা বললাম......।

রাম ॥ আই ফেল আপঅন দ্য থর্নস অব লাইফ !—লুক !—আই ব্লিড। ক্ষুদিরাম থেকে রামেশ্বর—সারি দিয়ে সবাই দাঁড়াও আমার সামনে। লেট দ্য মার্টারস এ্যওয়েক। অরুণ—আমার কাছে আয়। (অরুণ এগিয়ে যায়) ডোণ্ট বি এ্যাফ্রেড মাই বয়। প্রসিড অন উইথ ইওর মিশন। বৃষ্টির মত হয়তো রক্ত ঝরবে—ঝড়ে উড়ে যাবে কত জীবনের ঝরা পাতা—সমুদ্রের মত উত্তাল হয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে বিরাট বাধা। তবু তোমাকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার স্বপ্ন তোর চোখে তুলে দিলাম অরুণ—আমার বুকের দাহ দিলাম তোর বুকে। তোদের পথ আর আমাদের পথ হয়তো মিলবে না! কিন্তু মানুষের দুঃখমোচনের শপথে সব মানুষ তো একদিন মিলবে। সে দিনের জন্য তুই রইলি আমার প্রতিনিধি।

অরুণ ॥ ডাক্তারবাবু আপনাকে উত্তেজিত হতে বারণ করেছেন বাবা।

রাম ॥ (দূরাগত স্বরে) না। আর তো উত্তেজিত হবনা। আমার সব

উত্তেজনা আমি তোকে দিয়ে দিলাম। অতীত ভারতের ভগ্নাবশেষ আমি এবার ছুঁয়েছি নবীন ভারতকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দায় তুলে দিলাম বিংশশতাব্দীর কাঁধে। পৌরুষকে সম্বল করিস অরুণ।

যাদব॥ আমার বলা উচিৎ নয়—তবু বলছি, একটু সাবধানে থাকবেন অরুণবাবু।

রাম॥ (চীৎকার) না। সাবধানে থাকার দিনটা আজ ঘুচে যাওয়া দরকার। জীবন নিয়ে যখন জুয়াখেলা শুরু হয়েছে তখন হার জিতের জুয়াটিও আমরা খেলবো।.... আমার—আমার জন্য ভাবিস না অরুণ! মা বাবা ভাই-বোনের জন্য আমরাও ভাবিনি। আমাদের সামনে ছিল আমাদের মিশন। লেট দ্য মার্টারস এ্যাওয়েক ইন ইউ মাই বয়, লেট দা মার্টারস এ্যাওয়েক ইন এভরি ওয়ান অব ইউ।

পরাজিত পৃথিবী

শ্রীবসন্ত ভট্টাচার্য

চরিত্র

ফাদার — স্মৃষ্টি
পরাণ — কল্লোল
বিপ্লব

[দৃশ্য। বোমা-বিধ্বস্ত ভাঙ্গা গীর্জার অভ্যন্তর। ভাঙ্গা ক্রুশ, যীশুর মূর্তি। ইতস্তত ছড়ানো ধ্বংসস্তূপ।

[পর্দা সরতেই আলো-অন্ধকারে একটি মেয়ের কাতর চোখের চাহনি দেখা যায়। ছিন্নবাস, রুক্ষ কেশ তার। নাম সৃষ্টি। নেপথ্যে সংগীত ধ্বনির সংগে ভেসে আসে গীর্জার প্রার্থনা গীতি। সচকিত হয়ে ওঠে সৃষ্টি। দীপ হাতে, কাঁধে কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ নিয়ে দৃশ্যে আসেন ফাদার ট্রুম্যান। পঞ্চাশ-উর্দ্ধ বয়স তাঁর। দেহের অন্যান্য অংশ ছাড়াও সুন্দর মুখশ্রীতে মহাযুদ্ধের চিহ্ন ছড়ানো। দীপালোকে দেখতে পান সৃষ্টিকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আলো তুলে ধরেন ওর মুখের কাছে]

ফাদার। তুমি, তুমি কে? কথা বলছো না কেন? ··বল, বল তুমি কে? কোত্থেকে এলে? (কাতর চোখে তাকায় সৃষ্টি) ও, তুমিইতো সৃষ্টি! মহাযুদ্ধের বলি তুমিও? যাও, চলে যাও। এখানে কেউ নেই.·· শুধু আমি, আমি আসি—সকালে আর সন্ধ্যায়। কেননা আমার প্রথম নিঃশ্বাস এখনো এর দেয়ালে ধাক্কা খায়। আমাকে ভবিষ্যৎবাণী করে, তাই। (দূরের নিশানা নিয়ে) আর ঐ যে পুড়ে যাওয়া ঝাউ গাছের সারি দেখছো—না, না, ওরাও আমায় বলেনি—আমায় কেউ বলেনি···কেউ বলেনি···

[উত্তেজিত ফাদার স্মৃতির সাগরে ডুবে যেতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েন। ভয়চকিত সৃষ্টি সেদিকে তাকায়। পরক্ষণেই আপন খেয়ালে উঠে পড়েন ফাদার]

তবু আমি বুঝেছিলাম, যেন জানতে পেরেছিলাম—এ চার্চটাকে আমি রক্ষা করতে পারবো না। দেখ, চেয়ে দেখ। এর ছাদ নেই, ঝাড়লণ্ঠনের সেই আলোর ছটা নেই। যেন একটা পোড়ো বাড়ী হয়ে গেছে।…আর যীশু, যীশুও আমারি মতন বাজ-পড়া দেবদারু গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো প্রতিবাদ করেনি।

[যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠস্বর শোনা যায় সৃষ্টির। আলোক বিন্দু ওর মুখের ওপর এসে পড়ে]

সৃষ্টি॥ আঃ আঃ—আমায় একটু -আমায় একটু…

ফাদার॥ বল, আমায় বল।

সৃষ্টি॥ আমি, আমি… [ইসারায় জানায় সে ক্ষুধার্ত]

ফাদার॥ তুমি ক্ষুধার্ত; কিন্তু তোমায় আমি কি খেতে দেবো বলত?

[কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে কয়েকটা বুনো ফল বের করে এগিয়ে ধরেন ফাদার]

আপেলের মত দেখতে এ বুনো ফলগুলো জঙ্গলের পোড়া গাছের ডালে ঝুলছিল। তুলে এনেছি। খাবে?

[ফল নিয়ে এগিয়ে যান ফাদার। চীৎকার করে ওঠে সৃষ্টি]

সৃষ্টি॥ না। আমি খাবো না। কিছুতেই না। তোমরা, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও… আমায় ছেড়ে দাও।

[কান্নায় ফেটে পড়ে যেন, চলে যেতে যায় সে। বাধা দেন ফাদার]

ফাদার॥ সৃষ্টি, সৃষ্টি শোন—শোন—

[থমকে দাঁড়ায় সৃষ্টি। মনে মনে অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করে চলে যেন]

সৃষ্টি ॥ আমার বিয়ে হবে, শাঁখ বাজবে, বর আসবে।···কিন্তু, কিন্তু, ওরা কেন? ওরা আমায় নিয়ে যাচ্ছে কেন? না, না, আমি যাবো না—কিছুতেই যাবো না—আমি যাবো না···

ফাদার ॥ সৃষ্টি, সৃষ্টি যেও না। যেওনা—শোন—

[ভয়চকিত সৃষ্টি বেরিয়ে যায়। ওকে অনুসরণ করতে চান ফাদার। ঠিক এমনি সময় প্রচণ্ড শব্দে গীর্জার দেয়াল ছাদ ভেঙে পড়তে থাকে। মঞ্চটিও দুলতে থাকে। নেপথ্য থেকে দূর কণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসে। সঙ্গে দূরের সোরগোলও শোনা যায়]

একি, দেয়ালগুলো সব দুলছে কেন? মনে হচ্ছে যেন বাইরের আকাশটা পৃথিবীর সংগে লুকোচুরি খেলছে।···তাহলে, তাহলে কি ভূমিকম্প হচ্ছে? যীশু, যীশু এই ধ্বংসস্তূপ দিয়েই কি তুমি আমার সমাধি রচনা করতে চাও? কিন্তু সৃষ্টি, সৃষ্টি যে হারিয়ে গেল? সৃষ্টি···সৃষ্টি যে হারিয়ে গেল···

[প্রচণ্ড আলোড়নের মধ্যে আলো সমেত ফাদার বেরিয়ে যান। এবার আলো-আঁধারির মধ্যে মঞ্চে আসে জংলি আকৃতির একটি মানুষ। চুল, দাড়ি, নখে তাকে মানুষ বলে ভাবাই যায় না। হাতে একটা কৌটো গুটি মেরে সে এসে মঞ্চেরই একটি অংশে ক্রুশের পেছনে লুকিয়ে পড়ে। ছাদের ফাটল দিয়ে সামান্য চন্দ্রালোক আসতে থাকে একটু বাদে বাইরে থেকে দুটো হাতে দগদগে ঘা নিয়ে পঙ্গু পরাণ আসে মঞ্চে। যন্ত্রণা কাতর তথাপি জীবন-মৃত্যুর মাঝে লুকোচুরি খেলছে যেন সে।]

পরাণ ॥ মরিনি, এবারও মরিনি। বেঁচে আছি—ঠিক বেঁচে আছি···[আলো-ছায়ার গীর্জার ভেতর দেখে নিয়ে]···সাহেবদের গীর্জেটাও ভেঙে গেছে? বাঃ গীর্জাটাও ভেঙে গেছে।

[দৃষ্টিহীন কবি কল্লোল হাতরাতে হাতরাতে আসে। মলিন বাস, রুক্ষ বেশ তার]

কল্লোল ॥ কে যেন কথা বললে? কে, কে কথা বললে?…নেই, কেউ নেই এখানে?

পরাণ ॥ আমি তো আছি।

কল্লোল ॥ তুমি, তুমি কে? আঃ—

[এগিয়ে আসতে পড়ে যায় কল্লোল। ওকে হাত এগিয়ে তুলতে যায় পরাণ কিন্তু পারে না। যন্ত্রণার অভিব্যক্তি তার চোখে মুখে। ওর কথার শেষে উঠে পড়ে কল্লোল।]

পরাণ ॥ আমার নাম পরাণ।

কল্লোল ॥ পরাণ। বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো তোমার।

পরাণ ॥ সুন্দর না ছাই।

কল্লোল ॥ কেন?

পরাণ ॥ (হাত দেখায়) দেখতে পাচ্ছো না? দেখ না, চেয়ে দেখ।

কল্লোল ॥ কি দেখবো বলতো?

পরাণ ॥ এই তো, এই আমার হাত দুটো।…জানো, এ আমার কি?

কল্লোল ॥ না, আমি জানি না।

পরাণ ॥ জানবে কেমন করে, তুমি যে অন্ধ!

কল্লোল ॥ অন্ধ!

পরাণ ॥ হ্যাঁ। দেখেও না দেখার ভান করছো।

কল্লোল ॥ না ভাই। কথাটা কিন্তু তোমার ঠিক হল না। দেখতে পাচ্ছি না বলেই তো দেখতে পেলাম না।

পরাণ ॥ কি বললে, দেখতে পাচ্ছ না?

কল্লোল ॥ না।…শুনেছি, পৃথিবীর রং বদল হয়েছে। সমতল জমিগুলি ফেটে চৌচির হয়ে অসমতল হয়ে গেছে। আর দেখ, চেয়ে দেখ—আমার দু'টো চোখের রংও বদল হয়নি। শুধু তার স্বচ্ছতা তলিয়ে গেছে আজকের এই নতুন সভ্যতার অতলে।…তাইতো আমি দৃষ্টিহীন, অন্ধ।

পরাণ ॥ আমায় তুমি দেখতে পাচ্ছ না ?

কল্লোল। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। তোমার কাছটায় কি দেখছি জানো ? শুধু কালো, কালো আর কালোর পাহাড়…

পরাণ ॥ তুমি বেশ সুন্দর কথা বলতো। তুমি কি কবি ?

কল্লোল ॥ ছিলাম। এখন আর নই।

পরাণ ॥ কেন ?

কল্লোল ॥ তুমিও কি চোখে দেখতে পাও না ?

পরাণ ॥ পাই। অনেক কিছু দেখতে পাই।

কল্লোল ॥ কি দেখতে পাও ? শহরের পাশ দিয়ে যে ছোট্ট নদীটা বয়ে যেত কোনোদিন তার গান শুনতে পেয়েছো ?…জৈষ্ঠের আকাশের দিকে তাকিয়ে ধান ক্ষেতের চাপা কান্না কোনোদিন শুনেছো ?…তারপর, তারপর যখন দিগন্তে থেকে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়া কালো মেঘের স্বপ্ন সফল করে, হঠাৎ একদিন পৃথিবী ভাসিয়ে বৃষ্টি নামতো…তার গন্ধ, হ্যাঁ… হ্যাঁ তারও একটা নিজস্ব গন্ধ আছে, সেটা কোনোদিন পেয়েছো ?

পরাণ ॥ না।

কল্লোল ॥ নদীর চড়ায় যে ছোট্ট, ছোট্ট কাঁটা-ঝোপের বন ছিল সেখানে কাঠ বিড়ালির খেলা দেখেছো ?

পরাণ ॥ না।

কল্লোল ॥ বালির মধ্যে তাদের পায়ের চিহ্ন দেখে তুমি কি নিজেকে কোনোদিন নিঃসঙ্গ ভাবোনি ?

পরাণ ॥ না।

কল্লোল ॥ তাহলে তুমি জীবনকে দেখনি। তোমার পরান নামটা কিন্তু ঠিক নয়। বদল করে নিও।

পরাণ ॥ তোমার কথাটা কিন্তু ঠিক হ'ল না কবি।

কল্লোল ॥ কেন ?

পরাণ ॥ হ্যাঁ, এই হাত দুটো দিয়ে যখন আমি লাঙল চালাতাম মাটির বুকের অনেক কথাই যে আমার কানে আসতো।…কচি কচি ধানগাছগুলোর মধ্যে আমি তো ভগবানকেই দেখতে পেতাম ..নীল আকাশের নীচে ওরাইতো আমায় প্রথম জানালো…পৃথিবীটা ভগবানেরই মন্দির।…আঃ জ্বলে গেল…জ্বলে গেল…[হাতের যন্ত্রণায় অর্দ্ধনাদ করে ওঠে পরাণ]

কল্লোল ॥ পরাণ—পরাণ—

পরাণ ॥ হাত দুটোতে অসম্ভব জ্বালা কবি। এ আর কোনোদিন সারবে না।—কোনোদিন না।…

কল্লোল ॥ তাহলে তুমিও আমারই দলে ?

পরাণ ॥ হ্যাঁ। তুমি অন্ধ ; আমি পঙ্গু। আমরা দুজনেই—

কল্লোল ॥ পৃথিবীর বোঝা ! কিন্তু, কিন্তু এমন তো ছিল না পরাণ। হাজার হাজার মানুষ যেমন তোমায় আশীর্বাদ করতো, তেমনি আমার কবিতার কথা ভেবেও—ওকি ? কি যেন একটা এলো ?

[পূর্ণিমার আলো এসে পুরোটা মঞ্চকে আলোকিত করে দেয়।]

পরাণ ॥ বোধ হয় পূর্ণিমা। তাই চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

কল্লোল ॥ চাঁদের আলো ! আঃ !…জানো, সেদিন চৈত্রের শেষ। জোৎস্নায় ভরা পৃথিবী। আমি আর আমার কবিতা ঐ শহরের পাশে ছোট্ট নদীটার ধারে…না, না…কিছু না—কিছু না….

[আবেশ বিভোর কবি সহসা মনোবেদনায় আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে। পরাণ সামাল দিতে যায়। সেও যন্ত্রণা-দগ্ধ হয়।]

পরাণ ॥ কবি, কবি—আঃ জ্বলে গেল, জ্বলে গেল—

কল্লোল ॥ জানো, আমি তখন একা। অভিসার শেষে কবিতা চলে গেছে ! ঘুম আসছে না আমার। ইচ্ছে হ'লো, ইচ্ছে হলো একটা কবিতা লিখি। লিখলাম। চাঁদের আলোর বন্যায় ভাসতে ভাসতে একটা কবিতা লিখলাম। সেটা হ'ল পৃথিবীর চিরদিনের কবিতা।

পরাণ ॥ এ তুমি কী বলছো কবি ?

কল্লোল ॥ হ্যাঁ। আমি যে কল্লোল। পৃথিবীর যৌবন আমি। তাই তো আমার কবিতা চিরদিনের কবিতা। আমার ভাবনা চিরকালের ভাবনা।

পরাণ ॥ আমি, আমি তা'হলে কি ?

কল্লোল ॥ তুমি তো প্রাণ। তুমি প্রয়োজনের আর আমি অপ্রয়োজনের। তবু আমারও প্রয়োজন আছে। ঠিক যেন তোমারি মতন। নইলে পৃথিবীতে ফুলও ফুটবে না পাখীও গান গাইবে না। আর আকাশে রামধনুও উঠবে না।...আচ্ছা, আচ্ছা তুমি কি কোনোদিন আমার কবিতা শোননি ?

পরাণ ॥ না।

কল্লোল ॥ তাহলে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। তোমার মনের গোলাপের চারাগুলো একটা দুটো ফুল দিয়েই শুকিয়ে গেছে। তুমি জানতেও পারো নি সেখানে কোনোদিন বসন্তকাল এসেছিল কি না।

[দীপ হাতে ফাদার আসেন]

ফাদার ॥ নেই, কোথাও নেই। সৃষ্টি যেন হারিয়ে গেল।...[ওদের দেখতে পান] তোমরা, তোমরা কে ?

পরাণ ॥ আমি পরাণ।

ফাদার ॥ পরান! তুমি, তুমি কে ? যেন চেনা চেনা লাগছে। দেখি, আলোর কাছে মুখটা ফেরাওতো দেখি। ও, তুমিই তো কল্লোল ?

কল্লোল ॥ হ্যাঁ, আমারই নাম কল্লোল। কিন্তু আপনি, আপনি কে ?

ফাদার ॥ কবি তুমিও এলে ? কিন্তু কি দেখতে এলে বলতে পার ?...বিধ্বস্ত চার্চের দগ্ধ যীশুকে তোমার কি না দেখলেই হোত না ?

কল্লোল ॥ কে, ফাদার ট্রুম্যান ? তুমি ? আমি তোমারি চার্চে এসে পড়েছি। ...দেখ, আজকের ভূমিকম্পটা কেমন যেন সব ওলট-পালট করে দিয়ে গেল, না ?

ফাদার ॥ হ্যাঁ। অনেক কিছুকেই যেন আর চেনা যায় না।...বাবার কফিনটা মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে। মনে হল, যেন অনেক অভিশাপ নিয়ে সেটা বোমার মত ফাটতে চাইছে—

কল্লোল ॥ না না, বোমা নয় ফাদার, বোমা নয়। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখ,—এর পরও তুমি বোমার কথা বলবে ?

ফাদার ॥ হ্যাঁ।

পরাণ ॥ আমার হাত দুটো দেখ। আর কাল সকালে যখন সূর্য উঠবে তখন পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখো দেখবে, আমি শুধু পঙ্গু নই, পৃথিবীও বন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ফাদার ॥ তাই তো খাদের পাশের বড় ফাটলটার কিছুটা ক্ষুধা আমি মেটাতে গিয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি, পারিনি শুধু এই ভাঙা চার্চ আর দগ্ধ যীশুর কথা স্মরণ করে। মনে হল, অসহায়ের মত ওরাও যেন আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

কল্লোল ॥ ফাদার, ফাদার এ ভাবনা কেন ?

ফাদার ॥ আমায় আর ফাদার বলো না কবি ! কথাটা যেন ব্যঙ্গ শোনায়

কল্লোল ॥ কেন ফাদার ?

ফাদার ॥ হ্যাঁ, শীতের শুরু তখন। চার্চের আশেপাশের শহরতলী ঘুমন্ত পৃথিবী। বাইবেলের একটা অধ্যায় আমার বড় ভালো লাগে। রোজ রাতে সেটা আমি পড়ি। সেদিনও পড়ছি। এমন সময় মনে হ'ল যেন এক লক্ষ এরোপ্লেন ভেঙে পড়ল। রাতের আকাশে চেয়ে দেখি কোটি কোটি সূর্য জ্বলছে—চারিদিকে শুধু আগুন আর আগুন—আগুন আর আগুন...

পরাণ ॥ সেদিন আমিও দেখেছি। এক নিমেষে কেমন করে হাজার হাজার মানুষ ছাই হয়ে যায়। যন্ত্রণার শেষ আক্ষেপটুকুও করবার অবসর তারা পায় না।

কল্লোল ॥ কিন্তু আমি তো পেয়েছিলাম।

কাদার ॥ তাইতো তুমি এখনো বেঁচে আছো।

কল্লোল ॥ তোমাদের মত বাঁচতে পারলাম কই ?

পরাণ ॥ আমার মত ? না·· না, এ বড় অসহ্য যন্ত্রণা কবি। মাঝে মাঝে অসংখ্য ছোট ছোট পোকা বেরোয়। তখন কি মনে হয় জানো ? · একটা লোককে যদি হাতের কাছে পেতাম, বলতাম, এই কাঁধের কাছ থেকে দু'টো হাত যেন সে কেটে বাদ দিয়ে দেয়। একটু শান্তি পাবো। উঃ জ্বালা, বড জ্বালা··· [পরাণ আর্তনাদ করে]

কাদার ॥ বছরখানেকের বোমার আগুন নিভে গেছে কবি, কিন্তু আমার বুকের ভেতরে যে আগুন জলছে সে তো নেভেনি—কোনোদিন তাকে নেভাতেও পারবো না।

কল্লোল ॥ কেন ?

কাদার ॥ এ যে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে। ইচ্ছে করে একটা আনবিক বোমার মতই দেশ, মহাদেশ আর মেরুপ্রান্তরে আমি ফেটে পড়ি, তারপর, ধ্বংস করে দিই সব কিছুকে। সৃষ্টি যাক, কৃষ্টি যাক, ধর্ম যাক· সেই সংগে লোভী মানুষগুলোও যাক॥ আসুক নতুন মানুষ—নতুন জীবন !

কল্লোল ॥ কাদার—

কাদার ॥ হ্যাঁ, আজকের পৃথিবী বড় ভারী হয়ে গেছে। নিজের বোঝা নিয়ে নিজেই সে আর চলতে পারছে না।

কল্লোল ॥ আমি পারতাম। নতুন করে পৃথিবীর অংগসজ্জা করতে পারতাম। কিন্তু কবিতা নেই। নিঃশেষ হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিলিয়ে গেছে, তাই—তাই····

পরাণ ॥ মাটিও আর কোনোদিন কাঁদবে না। তার বুকের স্বপ্ন আমার হাতের ছোঁয়ায় আর কোনোদিন সোনা হয়ে উঠবে না।

কাদার ॥ তাহলে, তাহলে আমি কি করবো ? এই নিথর নির্জন পুরীতে

শুধু কি যক্ষের মত ভাঙা চার্চ আর দগ্ধ যীশুকে পাহারা দিয়ে যাবো ? কাদের জন্যে ? কোন্ মানুষের জন্যে ?

কল্লোল ॥ সে মানুষ যদি কখনো আসে ?

পরাণ ॥ না—না। কোনোদিন নয়। কখনোও নয়। নতুন কোনো মানুষ এখানে আর কোনোদিন আসবে না। অভিশাপের বীজ এখানে ছড়িয়ে পড়েছে। সেই বীজ থেকে প্রথমে আমি, তারপর তুমি, তারপর ফাদার শেষে ঐ পোড়া গাছ, শুকিয়ে যাওয়া নদী…তারপর সবকিছু উল্কার মত ছাই হয়ে মিলিয়ে যাবে। সেদিন তো এলো বলে। তোমরা সবাই তৈরী হয়ে নাও—

কল্লোল ॥ না—না, পরাণ। সেদিন যেন না আসে।

পরাণ ॥ আসবেই।

কল্লোল ॥ আসবেই! পৃথিবীর বুকে আর ফুল ফুটবে না ?

পরাণ ॥ না।

কল্লোল ॥ আকাশে রামধনু উঠবে না ?

পরান ॥ না!

কল্লোল ॥ ফাদার ট্রুম্যান, তাহলে আমায় একটু তোমার ফুলের বাগানে নিয়ে চল। অথবা তোমার ওই ঝিরঝিরে ঝাউবনের কাছে, যেখানে বারো মাস বসন্ত কাল থাকে, সেখানে একটু নিয়ে চল। বুক ভরে আমি নিঃশ্বাস নেবো।

ফাদার ॥ তুমি এখনো কবি ?

কল্লোল ॥ কেন, অপরাধ বুঝি ?

ফাদার ॥ না।

কল্লোল ॥ তাহলে তুমি আমায় নিয়ে চল ফাদার। পরাণ বলছিলো! আকাশে এখন চাঁদ উঠেছে। ঝাউ গাছের পাতাগুলো ঠিক তাহলে দুলছে। চল না, আমায় একটু সেখানে নিয়ে চল।

ফাদার ॥ ঝাউবন নেই কবি।

কল্লোল ॥ নেই? তাহলে তোমার ওই গোলাপ বাগানটায় নিয়ে চল।

ফাদার ॥ সেটাও নেই।

কল্লোল। সেটাও নেই? তবে কি সত্যি এখানে আর কোনোদিন ফুল ফুটবে না?

ফাদার ॥ না।

কল্লোল ॥ হাজার হাজার পাখীর একটাও গান গাইবে না?

ফাদার ॥ না।

কল্লোল। ওই যে কচি কচি ছেলের দল একরকম পোষাক পরে যীশুর গান গাইতে গাইতে স্কুলে যেত, তারাও আর কোনোদিন যাবে না?

ফাদার ॥ না কবি। যীশু তাদের কাছে ডেকে দিয়েছেন।

[যেন তড়িতাহত হয় কল্লোল। তীব্র স্বরে চীৎকার করে ওঠে সে]

কল্লোল ॥ ও যীশু, যীশু। কোথায়, কোথায় তোমায় যীশু? আমায় দেখিয়ে দাও। আমি জানতে চাইবো পৃথিবীর তাতে কতটুকু উপকার হয়েছে? ...কোথায়, তোমার যীশু কোথায়—বল ফাদার, বল। তোমার যীশু কোথায়? [পাগলের মত যীশুর সন্ধান করতে থাকে কল্লোল। ফাদার ওকে শান্ত করে]

ফাদার ॥ কবি, কবি শান্ত হও। শান্ত হও।

কল্লোল ॥ না ফাদার, আমায় তুমি আর কবি বোলো না। নিজেকে বড় নিঃস্ব লাগে।

ফাদার ॥ বোস, এখানে বোস। আসবার পথে কিছু বুনো ফল সংগ্রহ করেছিলাম—খাবে? [ফাদার ওকে বসিয়ে দেয়]

কল্লোল ॥ দাও। বড় ক্ষুধার্ত আমি। চার-ক্রোশ দূরের চড়াটায় আজ

বোধ হয় কেউ যায়নি। পথের পাশে সারাদিন বসে থেকে একটাও বুনো ফল পাইনি।

[ফাদার ব্যাগ থেকে ফল বের করে]

ফাদার ॥ এস, আমরা সবাই ভাগ করে খাই, কেমন?...পরাণ, তুমিও এস। আমি তোমায় খাইয়ে দিই।

[পরাণ এগিয়ে আসে। কল্লোলকে ফল দিয়ে পরাণকে দিতে যেতেই জংলী মানুষটি ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে কেড়ে নেয় ব্যাগটা। বড় বড় নখ দিয়ে গোটা দুই ফল ধরে খেতে শুরু করে। ফাদার ও পরাণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে মঞ্চের দুপাশে সরে দাঁড়ায়। কল্লোল নির্বাক। কিছুই বুঝতে পারেনা সে]

পরাণ ॥ আঃ ভূত—ভূত—

ফাদার ॥ বনমানুষ—বনমানুষ—

কল্লোল ॥ কী হোল ফাদার, কী হোল? তোমরা কথা বলছোনা কেন? বল, বল।...ফাদার—ফাদার—পরাণ—পরাণ কেউ নেই? ফাদার—

[চিৎকার করে ওঠে কল্লোল, ওর সমতালে আর্তনাদ করে জংলী মানুষটি লুটিয়ে পড়ে মাটিতে, এবারে পরাণ আর ফাদার চুপি চুপি এগিয়ে আসে দুপাশ থেকে]

পরাণ ॥ ফাদার, ফাদার এ-কে?

ফাদার ॥ দেখছি।

কল্লোল ॥ তোমরা এখানে। আমি ডাকলাম তবু সাড়া দিলে না কেন?

পরাণ ॥ মানুষের মতই দেখাচ্ছে ফাদার। আবার বনমানুষের মতই চুল, দাড়ি, নখ, সবকিছু দেখছি। কে বলোতো?

[ফাদার ওকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে]

ফাদার ॥ মনে হয় মানুষই। আহা বেচারা ফলটাও খেতে পারেনি। গলায় আটকে গেছে।

পরাণ ॥ মরে গেছে নাকি!

ফাদার ॥ না, এইতো নিশ্বাস পড়ছে।....শিশিটা শিশিটা কোথায়? একটু জল লাগবে...

[ব্যাগের ভেতরের শিশি থেকে ওর চোখে মুখে জল ছিটিয়ে সামান্য একটু গলায় ঢেলে দিতে থাকেন ফাদার]

কল্লোল ॥ তোমরা সবাই চুপ করে আছো কেন? বল, বল কী হোল?

ফাদার ॥ আর একটু খাবে?

[জংলী মানুষটি উঠে বসে ভাষাহীনের মত তাকাতে থাকে। তার নাম বিপ্লব]

পরাণ ॥ আর একটু জল দাও ফাদার। মনে হচ্ছে যেন কতকাল কিছু খায়নি।

ফাদার ॥ খাবে, আর একটু জল খাবে? বলনা, বল—

কল্লোল ॥ কে এলো ফাদার? তোমরা সবাই কার সংগে কথা বলছো?

ফাদার ॥ আমাদেরই এক নতুন বন্ধু।

কল্লোল ॥ কে পাঠালো?

ফাদার ॥ যীশু। যীশু পাঠিয়েছে।

কল্লোল ॥ যীশু পাঠিয়েছে?

[যীশুর নাম শুনে ঠোঁট নড়তে থাকে ~~বিপ্লবের~~। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে যীশুর মূর্তির দিকে। ফাদার ওকে অনুসরণ করেন। হঠাৎ যেন বিপ্লব ভাষা খুঁজে পায়। তীব্র স্বরে আত্ম-নিবেদন করে যীশুর কাছে]

বিপ্লব ॥ যীশু—যীশু—যীশু—

ফাদার ॥ বল, তোমার যা কিছু বলার আছে সব তুমি যীশুকে বল।

[অস্পষ্ট স্বরে ভেঙে ভেঙে কথা বলতে থাকে বিপ্লব]

বিপ্লব ॥ আমি বলবো? যীশু শুনবে?

ফাদার ॥ হ্যাঁ শুনবে। তুমি বল।

বিপ্লব ॥ কিন্তু সে কথাতো যীশুকে শোনাবার নয়।

পরাণ ॥ কী কথা?

বিপ্লব। পৃথিবী ধ্বংসের কথা।

ফাদার ॥ এ তুমি কী বলছো?

বিপ্লব ॥ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি।...বারো বছরের একান্ত সাধনা দিয়ে, রক্ত কণিকার মত বিন্দু বিন্দু আয়ু দিয়ে সে তপস্যাই যে আমি করে গেছি ফাদার। কেমন করে এক নিমেষে পৃথিবী ধ্বংস হ'য়ে যাবে. কেউ জানতেও পারবে না।...আমার নাম বিপ্লব।

ফাদার ॥ বিপ্লব! মানে তুমিই সেই আনবিক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব?

বিপ্লব ॥ হ্যাঁ, আমিই বিপ্লব।

ফাদার ॥ এতদিন কোথায় ছিলে?

বিপ্লব ॥ পাতালে—পাতালে ছিলাম।

পরাণ। পাতালে?

বিপ্লব। হ্যাঁ, যেন একযুগ আমি পাতালে ছিলাম।

পরাণ ॥ সেটাতো গত বছরের কথা।

বিপ্লব ॥ তবু যেন একযুগ মনে হচ্ছে।...হ্যাঁ মনে পড়ছে, মনে পড়ছে। ল্যাবরেটরীর ছোট্ট একটা কক্ষে আনবিক বিষক্রিয়া পরীক্ষা করছিলাম। দীর্ঘ বারো বছরের অক্লান্ত প্রচেষ্টার যেদিন সার্থকরূপ দেখতে পেলাম সেদিনই শত্রুপক্ষের শ'য়ে শ'য়ে বোমা এসে পড়ল শহর আর শহরতলীতে। প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনী দিয়ে ল্যাবরেটরীটা বসে গেল মাটির নিচে। যেন চলে গেলাম পৃথিবীর বুকের কাছাকছি!

কল্লোল ॥ তারপর?

বিপ্লব ॥ তারপর আমি হারিয়ে গেলাম। অন্ধকার নিকষ কালোর বন্যায়

আমি তলিয়ে গেলাম···কয়েকটা দিন আনবিক আলোটাকে জালিয়ে রেখেছিলাম। তারপর সেটাও গেল নিভে—

ফাদার ॥ তারপর, তারপর তুমি কী করলে ?

বিপ্লব ॥ কিদে তেষ্টা, সংশয় আর আতঙ্কে পাগল হয়ে প্রথমে বেরোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বারবার ব্যর্থ হয়ে আয়ুকে টি঳কিয়ে রাখার প্রতিজ্ঞাটুকুই নিলাম।

কল্লোল ॥ কেন ?

বিপ্লব ॥ পৃথিবীকে আর একবার দেখতে হবে—তাই !

পরাণ ॥ কিন্তু টি঳কে থাকলে কেমন করে ?

বিপ্লব ॥ কেন ল্যাবরেটরীতেই ছিলাম। কয়েকদিন ভালই কাটলো। খেলামও বেশ। তারপর খাবার গেল নিঃশেষ হয়ে। শুরু হ'ল উপোস। একটানা উপোস।··

ফাদার ॥ একটানা উপোস ?

বিপ্লব ॥ হ঳্যা, একদিন দেয়ালের ফাটল দিয়ে গড়িয়ে এলো একটা ব্যাঙ, অনেকটা মাংস ছিল তার। আগুনে—ঝল্সে নিয়ে তাই খেলাম। তারপর, তারপর ভিজে দেয়ালের শেওলা, মাঝে মাঝে ছুটো একটা পোকা, গিরগিটি, মাকড়শা, আর সবশেষে আজ, আজ কদিন ধরে খাচ্ছি মাটি···মুঠো মুঠো মাটি—

ফাদার ॥ মুক্তি পেলে কেমন করে বিপ্লব ?

বিপ্লব ॥ কেন, আজকের ভূমিকম্পে···হঠাৎ দেখি অন্ধকার ল্যাবরেটরীর স্যাঁৎসেঁতে মেঝেয় রূপোলী আলোর ছায়া পড়েছে। মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখি আকাশ আর আকাশ। অসংখ্য নক্ষত্র ভরা আকাশ। বেরিয়ে এলাম। যেদিকে ছু'চোখ যায় ছুটতে লাগলাম।

ফাদার ॥ পড়েও গেছ বোধহয় ?

বিপ্লব ॥ হ্যা, অনেকবার।···পাতাল থেকে উঠে আসতেই দেখি একটা খেকি

কুকুর···পিঠের কাছটায় দগ্‌দগে ঘা। সেখান থেকে আলো বেরোচ্ছে,—জোরালো আলো। আমায় তাড়া করলে। পড়ে গেলাম, আবার ছুটলাম। দীর্ঘদিনের অচল দু'টো পা এক সঙ্গে অত চলতে পারবে কেন! তাই অনেকবার পড়ে গেছি।

পরাণ॥ ছুটলে কেন?

বিপ্লব॥ নইলে যে ওরা আমায় মেরে ফেলতো। ওই যে শুকনো নদীটার ধারে অনেকগুলো পঙ্গু মানুষ···ওরা আমায় দেখে ভয় পেয়ে গেছে। ভূত বলে চিৎকার শুরু করেছে! বড বড পাথরের চাঁই তুলে ছুঁড়ে মেরেছে। একটা লাগলেই আমি মরে যেতাম।

পরাণ॥ মরার জন্মে এত ভয় তোমার?

বিপ্লব॥ না ভয় শুধু এই কৌটোটার জন্ম।

পরাণ॥ কী আছে ওতে?

ফাদার॥ খাবার কিছু সংগ্রহ করেছো বোধহয়।

বিপ্লব॥ না।

কল্লোল॥ তাহলে কি আছে তোমার কৌটোর মধ্যে?

বিপ্লব॥ শুনে তোমরা শিউরে উঠবে না তো?

পরাণ॥ এমন কি তুমি শোনাবে যে আমরা শিউরে উঠবো!

বিপ্লব॥ কিন্তু শোনার পর যদি তোমরা আমায় খুন করতে চাও?

ফাদার॥
পরাণ॥
কল্লোল॥ } (এক সংগে ব্যঙ্গ হাসি হেসে ওঠে) হাঃ—হাঃ—

বিপ্লব॥ তোমরা, তোমরা অমন হাসছো কেন? থাম, থাম বলছি।

পরাণ॥ তোমার কথা শুনে আমাদের খুব হাসতে ইচ্ছে করছে। হাঃ—হাঃ। আঃ জ্বালা, বড জ্বালা··· [আর্তনাদ করে]

ফাদার॥ কি আছে তোমার কৌটোর মধ্যে?

বিপ্লব ॥ বিষ আছে। মারাত্মক বিষ।

পরাণ ॥ বিষ! আমায় একটু খাইয়ে দাও বিপ্লব। পরজন্মে আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, এ জ্বালা অসহ্য। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বিপ্লব, বিপ্লব—

কল্লোল ॥ আমায় একটু দাও বিপ্লব। পৃথিবীর কথাগুলো আমি ভুলে যেতে চাই।

ফাদার ॥ ফাদার ট্রুম্যান নামটা কি পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেয়া যায় না?··· বিপ্লব, বিপ্লব তুমি কি আমায় একটু বিষ দেবে না?

বিপ্লব ॥ না ফাদার। এ বিষ তো তোমাদের জন্যে নয়। এ হ'ল দেশ, মহাদেশ ছাড়িয়ে তার আকাশ বাতাস সব কিছুর জন্যে।

পরাণ ॥ তবু তুমি দাও বিপ্লব। এ জ্বালা অসহ্য—অসহ্য—

কল্লোল ॥ আমরা তো পৃথিবীর বোঝা—

ফাদার ॥ আমাদের চলে যেতে দাও।

বিপ্লব ॥ না। এ বিষ আমি তোমাদের দিতে পারবো না।

[বিপ্লবের কণ্ঠস্বর প্রায় স্বাভাবিক হয়]

ফাদার ॥ বিপ্লব!

বিপ্লব ॥ হ্যাঁ। যে যুদ্ধ-উন্মত্ত মানুষগুলোর জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের কোটি কোটি আশা নিয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, যাদের ফেলে যাওয়া নিঃশ্বাস-টুকুও আজ বাতাসের বুকে হারিয়ে গেছে, তাদের ফসিলের ওপর আমি আর নতুন ইমারত গড়তে দেবো না।

কল্লোল ॥ তুমিও সে কথা বলছো বিপ্লব?

বিপ্লব ॥ হ্যাঁ আমি, আমি ধ্বংস করে দেবো এ পৃথিবী। ধুলো, বালি আর বিষাক্ত বাতাসে মিলিয়ে দেবে তার সর্বনাশা মানুষগুলোকে।

ফাদার ॥ বিপ্লব! কি বলছো তুমি?

বিপ্লব ॥ হ্যাঁ ফাদার, ঠিকই বলছি। তোমাদের নিজেদের দিকে একবার

তাকিয়ে দেখতো এরপরও কি স্বার্থপর পৃথিবীকে তোমরা ক্ষমা করতে পারবে? পারবে তার লোভী, শয়তান, বর্বর মানুষগুলোকে বুকে জড়িয়ে ধরতে? বল, বল, তোমরা পারবে কিনা?

পরাণ ॥ কিন্তু ওরা যে সংখ্যায় অনেক!

ফাদার ॥ ওদের শক্তি যে অসীম।

কল্লোল ॥ ওরা যে ভয়ঙ্কর]

বিপ্লব ॥ তাই তো আমি বিপ্লব…আমি বহ্নি…আমি ভয়ঙ্করেরও ভয়ঙ্কর। …হ্যাঁ, এই যে ছোট্ট কৌটোটা দেখছো আস্তে আস্তে খুলবো। একটার পর একটা লাইন ছেড়ে ঢাকনাটা খুলে আসবে; তারপর, তারপর বেরোবে একটা নীল রং-এর টিউব। টিউবটার মুখ খুলে দিলেই… হাঃ—হাঃ—

পরাণ ॥ বিপ্লব!

বিপ্লব ॥ ভয় পেও না,—ভয় পেয়ো না। জানতেও পারবে না, কখন তোমরা হাওয়ার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে গেলে।

ফাদার ॥ কি বলছো বিপ্লব?

বিপ্লব ॥ বলার তো কিছুই নেই ফাদার। মাত্র তিরিশ মিনিট সময়। টিউব থেকে নীল পদার্থটা বায়ুমণ্ডলে মিশে যেতে যেটুকু অবসর।

পরাণ ॥ তারপর?

বিপ্লব ॥ তারপর কি হবে জানো? অতল সমুদ্রের তলায়, পৃথিবীপৃষ্ঠে অথবা বায়ুমণ্ডলে যেখানে যত জীবন আছে, জীবকোষ আছে সব জড় হয়ে যাবে। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে সব।

কল্লোল ॥ বিপ্লব!

বিপ্লব ॥ হ্যাঁ, ওদের দেহ থেকে বেরিয়ে আসবে একটা গ্যাস। অনেক, অনেক শক্তি তার। বায়ুমণ্ডলে আগুন ধরিয়ে দেবে সে। পৃথিবী তখন সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে।

ফাদার॥ সূর্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হবে!

বিপ্লব॥ হ্যাঁ। অনন্তকাল চলে যাবে এই ভাবে—একটানা।···একদিন, একদিন আগুন নিভবে—পৃথিবীর জ্বালাও কমবে। পরম তৃষ্ণায় আকাশের দিকে মুখ তুলে চাইবে সে। বায়ুমণ্ডল ভাসিয়ে আনবে মেঘ—গ্রহ গ্রহান্তর থেকে। সেই মেঘ দেবে বৃষ্টি। অঝোরে অফুরন্তভাবে। প্লাবন আসবে পৃথিবীতে—মহাপ্লাবন। সৃষ্টি হবে Protoplasm কোটি কোটি বছর পরে।

কল্লোল॥ তখন, তখন আমরা কোথায়?

বিপ্লব॥ নেই, আমার কেউ নেই। নিঃসঙ্গ পৃথিবীর বুকে যুগ যুগ চলে যাবে এমনিভাবে একটানা।—তারপর, তারপর আসবে অ্যামিবা। সৃষ্টি হবে সাগরের বুকে ছোট ছোট শর গাছের মত কিছু গাছ। জন্মাবে শামুক, সামুদ্রিক মাছ—সরীসৃপ। আসবে স্তন্যপায়ী।······আসবে জীবন! নতুন জীবন আসবে পৃথিবীতে!

পরাণ॥ আমি তখনও আসবো। পৃথিবীর সাথে মিতালী পাতাবো। সে আমায় মুঠো মুঠো সোনার ধান দেবে।

কল্লোল॥ দেখো, পাখীরা তখন আবার গান গাইবে। শুকনো নদীটা স্রোতের টানে চলার মাঝে মাঝে আমার সাথে অনেক কথা বলবে। ···ফাদার, ফাদার, তোমার ঝাউবনে আবার বসন্তকাল আসবে। দগ্ধ গোলাপ বাগানটা পৃথিবীর যৌবন হবে। আর সেই কচি কচি ছেলের দল আবার যীশুর গান গাইতে গাইতে স্কুলে যাবে।

ফাদার॥ আমাদের এই চার্চের চুড়োটা দূরের জাহাজ থেকেও দেখা যাবে।

বিপ্লব॥' তাইতো এ জড়াগ্রস্থ বন্ধ্যা পৃথিবী,—এ হিংসা-উন্মত্ত লোলুপ পৃথিবী এখন ধ্বংসের প্রয়োজন। বল, বল, তোমরা রাজি আছ কিনা!

কল্লোল॥ হ্যাঁ, নইলে যে নতুন জীবন আসবে না।

প॥ ইস্পাতের আস্তরণ ভেঙ্গে কৃপণ পৃথিবী এক কণাও ফসল দেবে না।

ফাদার॥ তবে এ যক্ষপুরীতে আমি কেমন করে থাকবো? নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি কি এখানে অনন্তকালের মমা সেজে বাতাসের বুকে যুগ-যুগান্তের চাপা কান্না শুনবো? না—না—না, সে হতে পারে না। এ পৃথিবীর কাছে মানবতা পরাজিত হয়ে গেছে।—বিপ্লব, বিপ্লব তুমি ধ্বংস করে দাও, এ পৃথিবী ধ্বংস করে দাও…

[অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে বিপ্লব]

বিপ্লব॥ বিপ্লব আমি—আমি বিপ্লব।…বিদায় বন্ধু বিদায়।

[মঞ্চের মাঝখানে বিপ্লব আসে। পরাণ, ফাদার, কল্লোল তিন দিকে সরে যায়। কৌটার মুখ খুলতে থাকে বিপ্লব। ওরা স্মৃতি-চারণ করে]

পরাণ॥ মেয়েটা একদিন জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা, পৃথিবীর কি রং বদল হয়? বলেছিলাম, না। রূপ বদল হয়।

ফাদার॥ জানো, জানো তখনও আমি যীশুকে দেখিনি! অ্যানি বলে যে মেয়েটা রোজ রোজ চার্চের বাগানে বকুল ফুল তুলতে আসতো…ওর ডানদিকের গালে সুন্দর একটা স্পট্ ছিল।…বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে ঐ মুখখানাকে বড় কাছের মনে হত। …পরে, পরে সেই স্পট্টাই আমি যীশুর গালে দেখতে পেতাম।…

[কথার শেষে কল্লোল আবৃত্তি করতে থাকে]

কল্লোল॥ বলত পৃথিবী কবিতা আমার—
ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি?
জোৎস্নার স্নানে অঙ্গ তাহার শিথিল করিয়া রাখি।
পদ্মকলির বুকেতে এখনো
আছে কি পরশকণা?
পাপড়ির ছায়ে এঁকেছিনু যত বৃন্তের আলপনা।

অলকে ছড়িয়ে আষাঢ় ছিল কি

শ্রাবণ ধারার আশে ?

ভাদ্র কি এলো ভরা নদী দিতে চৈত্রের মধুমাসে।

[কবিতার শেষে বিপ্লব কৌটো থেকে টিউবটা বের করে]

বিপ্লব ॥ শেষ মুহূর্ত। তোমাদের বিদায়—বন্ধু—বিদায়।

[সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে সদ্যজাত শিশুর কান্না শুনে সবাই চমকে ওঠে]

ফাদার ॥ একী ? শিশুর কান্না যেন শুনতে পেলাম।

কল্লোল ॥ হ্যাঁ, ওইতো, ওইতো শিশু কাঁদছে। শিশু কাঁদছে।

[শিশুর কান্না আসে]

পরাণ ॥ পৃথিবীতে আবার নতুন প্রাণ এসেছে।

ফাদার ॥ বন্ধ কর বিপ্লব, বন্ধ কর। খুলোনা, এ বিষের টিউব তুমি খুলোনা, বিপ্লব।

[হিংস্ররূপে গর্জন করে বিপ্লব]

বিপ্লব ॥ ফাদার !

ফাদার ॥ হ্যাঁ, যে সিদ্ধির জন্যে আমাদের এ কৃচ্ছসাধন, সেই নতুন প্রাণতো পৃথিবীতে এসে গেছে। ওইতো, ওইতো তার আহ্বান শুনতে পাচ্ছি !

[ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যান ফাদার]

বিপ্লব ॥ তবু তোমরা আমায় ফেরাতে চেও না।

পরাণ ॥ বিপ্লব। খুলবেনা, এ টিউব তুমি খুলবেনা। আমি তোমায় খুলতে দোবনা।

কল্লোল ॥ হ্যাঁ, নতুন প্রাণ এসেছে পৃথিবীতে। আমায় যে আবার কবিতা লিখতে হবে।...... কিন্তু আমি, আমি যে অন্ধ ! তা হোক তবু লিখতে হবে। কবিতা যে ওর ভাল লাগবে। কবিতা আমায় লিখতেই হবে।

পরাণ ॥ বন্ধ্যা পৃথিবীর বুক থেকে, যেমন করেই হোক ফসলতো তুলতেই হবে। ওকেতো বাঁচাতেই হবে।

[সৃষ্টির কাপড়ের অংশে জড়িয়ে সদ্যজাত শিশু নিয়ে ফাদার আসেন]

ফাদার ॥ দেয়াল চাপা পড়ে সৃষ্টির মৃত্যু হয়েছে। সাময়িক মৃত্যু। তাই সে আড়ালে চলে গেল। কিন্তু, কিন্তু আমায় তো যীশুর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। এর অনেক কথা বলতে হবে—

বিপ্লব ॥ আর আমি, আমি কি করবো? বারো বছরের সাধনায় যে বিষ আমি আবিষ্কার করেছি তাকে নিয়ে আমি কি করবো? তোমরা আমায় একলা ফেলে চলে যাবে? কিন্তু এ বিষ যে আমায় ছাড়তে চাইবে না। বল, বল আমি কি করবো?

ফাদার। বারো বছরের সাধনায় সিদ্ধফল এ বিষকে তুমি মানুষের কল্যাণে লাগাতে পারবে না বিপ্লব? আবার না হয় বারোটা বছর লাগবে। বল, বল তুমি পারবে কি না? বল—

[প্ররোচিত করতে থাকেন ফাদার]

বিপ্লব ॥ না⋯ ⋯না। তুমি আমায় অমনভাবে চঞ্চল করে দিও না ফাদার, তুমি আমায় চঞ্চল করে দিওনা।

পরান ॥ বিপ্লব! বল, বল তুমি পারবে কিনা?

কল্লোল ॥ বিপ্লব! কথা দাও, কথা দাও।

বিপ্লব ॥ হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। বিশ্বাস করো, বিশ্বাস করো কথাটা আমি সে angle থেকে কোনদিন ভেবে দেখিনি।⋯শুধু ধ্বংসের বীজ আবিষ্কারই আমার সাধনায় ছিল। সৃষ্টির অঙ্কুরের কথাতো স্মরণ হয়নি। তাই⋯ তাই⋯

[ফাদারের কোলে শিশু কাঁদতে থাকে। পরাণ আর কল্লোল দুপাশ থেকে এগিয়ে ওকে দেখতে চায়। শিশুর কান্না শুনতে শুনতে হঠাৎ বিপ্লবের ধ্যান ভেঙে যায় যেন]

পারবো ফাদার, পারবো। বারো বছরের সাধনায় সিদ্ধফল এ বিষ থেকে

আমি সৃষ্টির অঙ্কুর জন্মাতে পারবো। আবার নাহয় বারোটা বছর লাগবে। কিন্তু, কিন্তু আমি যে শেষ হয়ে গেছি ফাদার, আমি যে ফুরিয়ে গেছি। [শিশুকে দেখে ওর দিকে এগিয়ে আসে বিপ্লব] হ্যাঁ,…হ্যাঁ, তুমি! তুমিইতো সেই মানুষ যে ধ্বংসের বীজ থেকে সৃষ্টির অঙ্কুর জন্মাবে। হ্যাঁ, তুমি, তুমিইতো সেই নতুন মানুষ যার কাছে আজকের পৃথিবী পরাজিত হয়ে গেছে! আজকের পৃথিবী পরাজিত……

[শিশুকে লক্ষ্য করে টিউবটাকে হাতে নিয়ে ফাদারের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে বিপ্লব]

[পর্দা আস্তে আস্তে নেমে আসে]

উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে

শৈলেশ গুহ নিয়োগী

॥ চরিত্র ॥

পশুপতি	জিতেন
অনিল	পটল
মৃণাল	পুরোহিত
বসন্ত	রতন
মিনু	ক্ষ্যান্তমণি

[একটি বিবাহ-বাসর। জিতেনকে ঘিরে তুমুল হৈ চৈ চলছে। জিতেন বরের ছোট ভাই। সে তার দাদার অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে। কন্যাপক্ষ তার কোনো কৈফিয়ৎ শুনতে রাজী নয়। পর্দা খুলতে দেখা যায় কনের বাবা, দাদা, মামা এবং আরো দু' একজন জিতেনকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে প্রাঙ্গণের এক কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে। কেউ তার জামার কলার ধরেছে ; কেউ তার হাত ধরেছে। কনের বাবা পশুপতির গলা শোনা যায়।]

পশুপতি॥ এটা কি ছেলে খেলা! বিয়ের সব ঠিক—এখন এসে বললেন দাদার ছুটি ক্যানসেল হয়ে গেছে! দাদা আসতে পারবে না! ন্যাকামো করবার জায়গা পাওনি!

জিতেন॥ আপনারা বুঝতে পারছেন না কেন, দাদার পুলিশের চাকরী।

পশুপতি॥ সব বুঝতে পারছি, চালাকী করে অন্য মেয়ে বিয়ে করতে গেছে।

জিতেন॥ ছি ছি—ও কথা বলবেন না। দাদা দেবতুল্য লোক।

পশুপতি॥ তোমার দাদা একটি আস্ত জোচ্চর। চোর ডাকাতদের সঙ্গে কাজ করে সেও একটি ঠগবাজ তৈরী হয়েছে।

জিতেন॥ কি মুশকিল! আপনাদের কি করে বোঝাই—পুলিশের ছুটি যে কোনো সময় ক্যানসেল হয়ে যেতে পারে।

পশুপতি॥ বিশ্বাস করি না। যে অফিসার ছুটি ক্যানসেল করেছে সে কি কোনোদিন বিয়ে দেখেনি না তার নিজের বিয়ে হয়নি?

জিতেন॥ তিনি অল্প বয়েসের অফিসার। তাঁর এখনও বিয়ে হয়নি।

পশুপতি॥ (চিৎকার করে) তার হয়নি, তার বাবার তো বিয়ে হয়েছে!

[কনের মামা অনিল পশুপতিকে থামানোর চেষ্টা করে]

অনিল॥ জামাইবাবু, আপনি চুপ করুন। সকাল থেকে না খেয়ে আছেন। আমি দেখছি কি করা যায়।

পশুপতি॥ কি সর্বনাশের কথা বলতো অনিল! এতগুলো টাকা খরচা করে বিয়ের সব ব্যবস্থা করলাম, টাকাগুলো কি জলে যাবে?

জিতেন॥ জলে যাবে কেন? বিয়ের জিনিসপত্রগুলো তুলে রেখে দিন; পরের লগ্নে বিয়ে দিলেই হবে।

পশুপতি॥ (চড়াগলায়) মুর্খ—এ বছরে আর বিয়ের লগ্ন নেই।

[কনের বড ভাই পটল জামার হাতা গুটিয়ে যায়]

পটল॥ বাবা, সরো তো—ছোটলোককে আমি ঠাণ্ডা করে দিই—

জিতেন॥ আমাকে শুধু শুধু ঠাণ্ডা করবেন কেন? আমি একেবারেই গরম হইনি।

অনিল॥ গরম না হওয়াটাই তো শয়তানী। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে খুনের সমান।

পশুপতি॥ অনিল, যা হোক একটা ব্যবস্থা করো। এরকম বদমাইসী কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

অনিল। আপনি চিন্তা করবেন না জামাইবাবু। এ বিয়ে হতেই হবে।

পটল॥ না, না মামা, দরকার নেই। এই রকম ছোটলোকের সঙ্গে মিনুর বিয়ে না দেওয়াই ভাল।

পশুপতি ॥ কি বলছিস হতভাগা। আমার জি, পি ফাণ্ডের তিন হাজার টাকা খরচ করে ফেলেছি। এই অবস্থায় পিছিয়ে আসব কি করে?

পটল ॥ এগোলে যে তোমার আরো টাকা জলে যাবে বাবা।

অনিল ॥ পটল, তুই থাম। জামাইবাবুকে আর পাগল করে দিস না।

[পাড়ার মৃণাল ও বসন্ত এগিয়ে আসে]

মৃণাল ॥ পশুপতিবাবু, আপনারা নারভাস হবেন না। আমি এ পাড়ার ছেলে। পটল আমার বন্ধু। আমি থাকতে আপনাদের কোন ভয় নেই।

[হঠাৎ বাড়ীর ভেতর থেকে কনের পিসি ক্ষ্যান্তমণি সুর করে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে]

ক্ষ্যান্তমণি ॥ ওরে আমার কি হোলরে—। আমার মিনুর কপালে এই ছিল রে—

পশুপতি ॥ দিদি, চুপ কর। ওরকম করে কেঁদে পাড়ার লোক জড় কোর না।

ক্ষ্যান্তমণি ॥ (একইভাবে সুর করে কাঁদে) ওরে পশু, তাহলে আমি কেমন করে কাঁদব রে—

পশুপতি ॥ আঃ, বাড়ীর মধ্যে যাও না। মেয়েছেলেদের এসব ব্যাপারে থাকতে নেই।

ক্ষ্যান্তমণি ॥ (একইভাবে কাঁদে) আমি কেন ব্যাটাছেলে হোলাম নারে—

পুরোহিত ॥ উন্মাদ হইলা নাকি তোমরা? শুভ কার্যে চোক্ষের জল ফ্যাল্লে বিঘ্ন ঘটে জান না?

পশুপতি ॥ পুরুত মশাই, আপনি দিদিকে ভেতরে নিয়ে যান।

পুরোহিত ॥ আইলাম নমঃ বিষ্ণু কইরা বিবাহ করাইতে, অহন দেহি সব কয়ডাই পাগল। আস আমার লগে।

[পুরোহিত ক্ষ্যান্তমণির হাত ধরে ভেতরে চলে যায়]

বসন্ত ॥ পশুপতিবাবু, আপনি বাড়ীর মধ্যে যান। ব্যাপারটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।

পশুপতি ॥ বেশ, কথা বললে বসন্ত। আমার মেয়ের বিয়ে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর আমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকব?

বসন্ত ॥ আপনাদের বাড়ীর মধ্যে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। আপনার সবার আগে সেখানে সামলান উচিৎ।

পশুপতি ॥ কোনটা উচিৎ কোনটা অনুচিৎ সেটা আমি বুঝব ছোকরা। অন্যের ব্যাপারে তোমাদের নাক গলাতে হবে না।

বসন্ত ॥ (উত্তেজিত হয়ে) একশ'বার নাক গলাব। আমরা পাড়ার ছেলে, আমাদের একটা দায়িত্ব আছে।

পশুপতি ॥ মায়ের চেয়ে যার বেশি দরদ তার নাম ডাইনি!

মৃণাল ॥ আপনারা পাগল হলেন নাকি? সেম্‌-সাইড হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছেন না?

পটল ॥ না না, যা হচ্ছে হোক। এর একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার।

অনিল ॥ পটল তোর বড্ড বাড় হয়েছে। চিরকাল তো বখামি করে কাটালি। ঘাড়ের ওপর একটা আইবুড়ি বোন পড়ে আছে কোনো-সময় ভেবেছিস সে কথা?

পটল ॥ (রেগে) মামা, মুখ সামলে কথা বলো—বলে দিচ্ছি। রেগে গেলে বাবা মামা কিচ্ছু মানব না।

মৃণাল ॥ (চীৎকার করে) আপনারা চুপ করুন। বিপদের সময় যদি আপনারা নিজেদের মধ্যে এইভাবে ঝগড়া করেন এর ফল কি হবে ভাবতে পারছেন? আপনারা কি ভুলে গেলেন ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড্ উই ফল্!

বসন্ত ॥ এখন মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবুন কি করা যায়।

পশুপতি। মাথা ঠাণ্ডা বললেই কি মাথা ঠাণ্ডা রাখা যায়!

বসন্ত ॥ তাহলে প্রাণপণ চিৎকার করুন, আর সেই সুযোগে বরের ভাই এক পা দু'পা করে পালিয়ে যাক।

[সবাই তাকিয়ে দেখে জিতেন পালাবার সুযোগ খুঁজছে]

অনিল ॥ তাই তো! ওযে পালাবার চেষ্টা করছে—

পশুপতি ॥ (চড়াগলায়) এই এদিকে এসো। এগিয়ে এসো—

জিতেন ॥ আমাকে আটকে রেখে কি লাভ ?

পটল ॥ লাভ লোকসান আমরা বুঝব—

মৃণাল ॥ মারো শালাকে—

সবাই ॥ মারো--মারো—

জিতেন ॥ (অসহায়ভাবে) শুনুন—শুনুন—

[সবাই জিতেনকে ধরে বেদম প্রহার দিতে আরম্ভ করে। জিতেন আত্মরক্ষার জন্যে মাটিতে শুয়ে পড়ে। ভেতর থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে আসে বাড়ীর ভৃত্য রতন]

রতন ॥ বাবু, দাদাবাবু, সর্বনাশ হয়েছে !

পশুপতি ॥ কি হয়েছে রতন !

রতন ॥ দিদিমণি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

পশুপতি ॥ মিনু অজ্ঞান হয়ে গেছে ! কেন ?

অনিল ॥ কেন আবার—সাডেন শক্। শিগগির চলুন ভেতরে।

[পশুপতি ও অনিল বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। রতন কাঁদতে আরম্ভ করে]

রতন ॥ (চোখ মুছতে মুছতে) দাদাবাবু, কি সর্বনাশ হলো—

পটল ॥ রতন, তুই এখানে দাঁড়িয়ে বোকার মত কাঁদছিস কেন ?

রতন ॥ কেন কাঁদব না দাদাবাবু—তোমাদের মা মরে গিয়েই যে আমার যত জ্বালা ! আমাকেই যে তোমাদের মা হয়ে চোখের জল ফেলতে হচ্ছে।

আমাকে আর রতন বলে ডেকো না দাদাবাবু। তোমরা আমাকে রতন-মা বলে ডেকো—

[রতন আবার কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর মধ্যে চলে যায়]

মৃণাল ॥ (জিতেনকে) আপনারা কি অবস্থার সৃষ্টি করেছেন, বুঝতে পারছেন ?

জিতেন ॥ বুঝতে পারছি। আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এবার আমাকে ছেড়ে দিন—আমি দাদার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যাপারটা বলি গিয়ে।

পটল ॥ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন। বাবা আর মামা না ফেরা পর্যন্ত এক পা এখান থেকে নড়তে পারবেন না।

জিতেন ॥ আচ্ছা বিপদে পড়া গেছে।

বসন্ত ॥ এ আর কি বিপদ ? সবে ধোলাই শুরু করেছিলাম—বাধা পড়ে গেল। না হ'লে তেলীপাড়ার মার কাকে বলে বুঝিয়ে দিতাম।

[ভেতর থেকে পুরোহিত বেরিয়ে আসে]

পটল ॥ পুরুত মশাই, মিনু এখন কেমন আছে ?

পুরোহিত ॥ চেতনা ফিরছে। পুঞ্জীভূত বেদনাই মূরছা যাওনের কারণ।

পটল ॥ কি করে জ্ঞান ফিরল ?

পুরোহিত ॥ মুদ্রিত চক্ষুযুগলে সজোরে জলের ঝাপটা মারতে মারতে খুইলা গেছে।

পটল ॥ যাক, কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

পুরোহিত ॥ নিশ্চিন্ত হওনের কিছু নাই। কারণ সেই যে চক্ষু খুলছে তো খুইলাই রইছে। আর তা বন্ধ হয় না। ঠিক যেন প্রস্তর নির্মিত দুইটা চক্ষু—নড়েও না চড়েও না।

মৃণাল ॥ সে কি, এই অবস্থায় বিয়ে কি করে হবে ?

পুরোহিত ॥ মাইয়ার কিন্তু পুরা টন্‌টনা জ্ঞান রইছে। চক্ষু মেইলাই কয়—

'আমার বিয়ার কি হইল পুরুত মশাই?' আমি তারে সান্ত্বনা দিয়া কইলাম—হইব মা লক্ষ্মী, হইব। মনে মনে ভাবলাম ছাতা হইব।

মৃণাল ॥ আপনি হাল ছাড়বেন না পুরুত মশাই। আমরা পাড়ার ছেলে যে করে হোক বিয়ে হওয়াব।

পুরোহিত ॥ পাড়ার পোলাগো আমার জানতে বাকী নাই। মুখেই খালি বচন চচ্চরী।

বসন্ত ॥ পুরুত মশাই আপনি তেলীপাড়ার ছেলেদের ক্ষমতা দেখেননি, তাই ও কথা বলছেন।

পুরোহিত ॥ রাখ রাখ, তেলীপাড়া! পাড়াশুদ্ধা এক ফোঁটা তেল নাই আবার নাম দিছে তেলীপাড়া!

জিতেন ॥ (কাতর কণ্ঠে) দেখুন একটা কথা বলছিলাম—দয়া করে যদি—

[ভেতর থেকে পশুপতি ও অনিল বেরিয়ে আসে]

অনিল ॥ আর কোন ভয় নেই—মিনু সম্পূর্ণ সুস্থ।

জিতেন ॥ আমি এখন যাব?

অনিল ॥ এতই সোজা? জোচ্চরকে হাতের নাগালে পেয়ে ছেড়ে দেব?

জিতেন ॥ আমাকে শুধু শুধু দোষারোপ করছেন। এরকম জানলে আমি এখানে আসতাম না। বিয়ে যখন হবার আশা নেই আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।

অনিল ॥ আলবৎ বিয়ে হবে। পুরুত মশাই আপনি কাজ আরম্ভ করুন।

পুরোহিত ॥ বাজে ফ্যাচর ফ্যাচর কইরো না বরের নামে পাত্তা নাই, বিয়া হইব কি কলা গাছের লগে?

অনিল ॥ আমি যদি বর দেখিয়ে দিতে পারি?

পশুপতি ॥ তার মানে?

পটল ॥ কোথায় বর?

অনিল ॥ আছে। তোমরা দেখতে চাও?

সবাই। চাই।

অনিল ॥ (জিতেনকে দেখিয়ে) ঐ তো বর। ওর গলায় ঝুলিয়ে দাও।

জিতেন ॥ (ভয়ে) না না একথা বলবেন না।

পশুপতি ॥ ঠিক বুদ্ধি দিয়েছ অনিল। ধরো ওকে।

সবাই ॥ ধরো—ধরো—

জিতেন ॥ (কাতর কণ্ঠে) শুনুন—শুনুন—দয়া করুন—

পশুপতি ॥ আর একটা কথাও না। ভাল ছেলের মত এখানে এসে দাঁড়াও

জিতেন ॥ আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

মৃণাল ॥ কোন কথা শুনতে চাই না।

বসন্ত ॥ (হাত গুটিয়ে) এর নাম তেলীপাড়া। মারের চোটে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

জিতেন ॥ মারুন—বাপের নামও ভুলিয়ে দিন; কিন্তু দয়া করে আমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন না।

পশুপতি ॥ পুরুত মশাই আপনি দেরী করছেন কেন? মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করুন।

পুরোহিত ॥ (ট্যাঁক থেকে ঘড়ি বার করে দেখে) শ্যাষ হইতে আর পাঁচ মিনিট বাকী আছে। মন্ত্র পইড়া কাম নাই। মাইয়ারে আইনা সাতপাক ঘুরাইয়া দাও।

পশুপতি ॥ (উচ্চস্বরে) রতন, মিনুকে নিয়ে আয়।

[নেপথ্য থেকে রতনের কণ্ঠ শোনা যায়—'আনছি বাবু']

জিতেন ॥ আপনাদের পায়ে ধরছি—এ কাজ আপনারা করবেন না।

[রতন মিনুকে সঙ্গে নিয়ে উলুধ্বনি করতে করতে বেরিয়ে আসে]

পটল ॥ এখানে নিয়ে আয়—

[রতন প্রাঙ্গণের মাঝখানে যেতে থাকে। জিতেন হাউ হাউ করে ওঠে]

জিতেন ॥ (কাঁদতে কাঁদতে) আপনাদের কি প্রাণে দয়া নেই। একলা পেয়ে আপনাদের যা খুশী তাই করছেন। আমি বিয়ে করব না।

পশুপতি ॥ একশবার করবে। তোমাদের চোদ্দগুষ্টিকে বিয়ে করিয়ে ছাড়ব।

জিতেন ॥ (মিনুর কাছে গিয়ে) আপনি আমাকে বাঁচান।

মিনু ॥ বিয়ে করতে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? বিয়ের পর দেখবেন, কত সুখ—কত—আনন্দ—

জিতেন ॥ আপনাদের কি করে বোঝাই। আমি বিয়ে করতে পারি না। আমার অসুবিধে আছে।

পটল ॥ অসুবিধে থাকলে ছেড়ে দেওয়া ভাল। এই শালাদের বিশ্বাস নেই। কোথাও কোন গণ্ডগোল পাকিয়ে বসে আছে।

অনিল ॥ তোমার মত অপদার্থের কথা শুনলে আমাদের চলবে না। যা করছি করতে দাও।

পটল ॥ মুখ সামলে কথা বলো মামা। রেগে গেলে আমি কিন্তু মানুষ থাকি না।

পশুপতি ॥ ধমক দিয়ে) চুপ কর পটলা। লঘু গুরু জ্ঞান নেই।

জিতেন ॥ (মিনুকে) আপনি কি আমার অনুরোধ শুনবেন না?

মিনু ॥ আপনার কি অসুবিধে আছে বলুন?

জিতেন ॥ আমি—আমি ডলিকে কথা দিয়েছি।

মিনু ॥ ডলিকে কথা দিয়েছেন! ওরকম কথা আমাকেও এর আগে সাতজন দিয়েছিল। কৈ তারা তো কেউ আমায় বিয়ে করেনি!

পশুপতি ॥ ছি ছি মা ওকথা বলতে নেই।

মিনু ॥ কেন বলব না বাবা। আমার এত বয়স হয়ে গেল তবু তোমরা একটা বিয়ে দিতে পারলে না যাও বা অতিকষ্টে একজনের সঙ্গে ঠিক করলে সেও এলো না। আমি কি তোমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে?

জিতেন ॥ আমার কথাটাও দয়া করে একবার চিন্তা করুন।

মিনু ॥ (ধমক দিয়ে) চুপ করুন। আপনার কোন কথা শুনব না। আপনাকেই আমি বিয়ে করব। আপনি রেডি?

জিতেন ॥ আনরেডি (হাত জোড় করে) দোহাই আপনার। আমি কোন দোষ করিনি।

পশুপতি ॥ (গলা চড়িয়ে) কি বললে—দোষ করিনি? এতগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করেও বলা হচ্ছে কোন দোষ করিনি! দাঁড়াও এখানে সোজা হয়ে।

জিতেন ॥ (হঠাৎ রেগে) না দাঁড়াব না। দেখি আপনারা কি করে আমার বিয়ে দেন!

[জিতেন দু'হাতে শূন্যে ঘুষি চালাতে থাকে। সবাই কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হকচকিয়ে যায়]

পটল ॥ কি—আমাদের পাড়ায় এসে আমাদের ওপর রোয়াব দেখান হচ্ছে। মার শালাকে—

[পটল এগিয়ে যায়। মৃণাল ও বসন্ত মালকোচা মেরে প্রস্তুত হয়]

মৃণাল ॥ আমরা রেডি পটলা। তুই হিট কর।

[পটল সুযোগমত জিতেনের গলা চেপে ধরে। মিনু বাধা দেয়]

মিনু ॥ কি করছিস ছোড়দা। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে—

[পটলা জিতেনকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে থাকে]

পটল ॥ একটা জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। মেরেই ফেলে দেব শালাকে—

মিনু ॥ (ধরা গলায়) ছোড়দা কেন তুই ওকথা বলছিস? তুই কি জানিস না —ওকে মেরে ফেললে আমি বিধবা হব!

জিতেন ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে মিনুকে) বাজে বকবেন না—আমি কি আপনার স্বামী যে আমি মরে গেলে আপনি বিধবা হবেন? আমি এখুনি মরব। দেখি আপনি কি করে বিধবা হন?

মিনু ॥ (বিকট আওয়াজ করে) বাবা ওকে বাঁচাও—

[হঠাৎ মিনু চোখ উল্টে অচৈতন্য হয়ে যায়। পশুপতি ও অনিল দৌড়ে গিয়ে ধরে]

পুরোহিত ॥ মাইয়াটা পুনরায় চেতনা হারাইল।

অনিল ॥ (দু'হাতে ঝাঁকিয়ে) মিনু—মিনু—

[মিনু চোখ মেলে তাকায়]

মিনু ॥ আমার বিয়ে হবে না মামাবাবু ?

অনিল ॥ হ্যাঁ—হবে। (জিতেনকে দেখিয়ে) ঐ যে তোমার স্বামী দাঁড়িয়ে আছে।

[মিনু এগিয়ে গিয়ে অর্দ্ধ-চৈতন্য অবস্থায় বলতে থাকে]

মিনু ॥ তাই তো- এই তো আমার স্বামী।

জিতেন ॥ না—না—আমি স্বামী নই।

পশুপতি ॥ চোপরাও উল্লুক। ওকে বলতে দাও। দেখছ না ওর জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ ফেরেনি।

জিতেন ॥ (অসহায় ভাবে) আচ্ছা বলুন।

মিনু ॥ (অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থায়) আপনি আমার ইহকাল—পরকাল। অর্দ্ধাঙ্গ —পূর্ণাঙ্গ। আপনি পতি—আপনি স্বামী।

জিতেন ॥ (ঢোক গিলে) আপনার বলা শেষ হয়েছে ?

মিনু ॥ না আরো আছে। আপনার কুলোর মত বক্ষপটে আশ্রয় দিয়ে, চাপাটীর মত প্রশস্ত ললাটে চন্দন দিয়ে, গণ্ডারের মত গণ্ডদেশে মালা দিয়ে, ক্যাঙ্গারুর মত পদযুগলে প্রণাম দিয়ে আমায় গ্রহণ করুন—

পুরোহিত ॥ খাইছে— এযে রীতিমত বিকার।

[বাড়ীর মধ্য থেকে বঁটী হাতে অর্দ্ধ উন্মাদ অবস্থায় বেরিয়ে আসে ক্ষ্যান্তমণি]

ক্ষ্যান্তমণি ॥ আজ তোকে খুন করব !

[সবাই ভয়ে দু'পাশে সরে যায়। ক্ষ্যান্তমণি জিতেনের সামনে এসে দাঁড়ায়] এই তো—একেই খুঁজছিলাম—

জিতেন ॥ (ভয়ে হাত জোড় করে) জয় মাকালী রক্ষা করো—আমি নই—দাদা—

ক্ষ্যান্তমণি ॥ দাদা—টাদা জানি না। মাথা নীচু কর। এখুনি তোকে বলি দেব !

জিতেন ॥ করছি। (হাঁটু গেড়ে বসে) বিদায় পৃথিবী—

ক্ষ্যান্তমণি ॥ (বঁটী তুলে) জয় মা—

অনিল ॥ (ক্ষ্যান্তমণির হাত থেকে বঁটিখানা কেড়ে নেয়) কি করছেন ? খুন করবেন নাকি ? চলুন ভেতরে—চলুন—

[অনিল ক্ষ্যান্তমণির হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়]

পশুপতি ॥ পুরুত মশাই, আপনি মন্ত্র পড়তে দেরী করছেন কেন ?

পটল ॥ ও ব্যাটা কাজের নামে অষ্টরম্ভা। কেবল কানের কাছে তখন থেকে ট্যাকর ট্যাকর করছে। দু'ঘা না দিলে ইঞ্জিন ষ্টার্ট করবে না।

পুরোহিত ॥ (রেগে) কি—ঘা মাইরা ইঞ্জিন ষ্টার্ট করাইতে চাও ? আউগাও দেহি কত ক্ষমতা—

[অনিল বেরিয়ে আসে]

অনিল ॥ আহা পুরুত মশাই, আপনি পাগল হলেন নাকি ?

পুরোহিত ॥ পাগল আমি হইছি না তোমাগো গুষ্টি পাগল হইছে। অসভ্য পরিবার !

পটল ॥ মুখ সামলে কথা বলো পুরুত মশাই। ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব

পশুপতি ॥ (চেঁচিয়ে) এই হারামজাদা পটলা, চুপ করবি কি না বল ?

পটল ॥ চুপ করে করেই তো সব কাজ পণ্ড হতে বসেছে।

পশুপতি ॥ (চিৎকার করে) চু-প্।

পুরোহিত ॥ ইঁচড়ে পক্ক পোলা কোথাকার!

অনিল ॥ থাক পুরুত মশাই, আপনি মাথা ঠাণ্ডা করুন।

পুরোহিত ॥ আইজ সকাল বেলা যহনই আমার ইস্ত্রীর মুখ দেইখা উঠছি তখনই ভাবছি আইজ আমার কপালে কি আছেরে মশাই—

মিনু ॥ পুরুত মশাই, আমার বিয়ে হবে না?

পুরোহিত ॥ হইব মা লক্ষ্মী—হইব—।

মিনু ॥ কখন হবে?

পুরোহিত ॥ অহনই হইব। (ঘড়ি দেখে) সর্বনাশ কাম সারছে! লগ্ন চইলা যাইতে মাত্র এক মিনিট সময় আছে মা লক্ষ্মী, তুমি সত্বর বরের চতুর্দিকে সাতবার পাক খাইয়া লও।

পশুপতি ॥ সে কি, পিঁড়ি আনবে না?

পুরোহিত ॥ সময় নাই! দৌড়াও মা লক্ষ্মী!

[মিনু ইতস্তত করতে থাকে]

জিতেন ॥ খবরদার, ভাল হবে না বলছি—

অনিল ॥ বসন্ত, মৃণাল তোমরা জিতেনকে শক্ত করে ধর।

মৃণাল ॥ ঘাবড়াবেন না মামাবাবু। আমরা বরের পায়ে বল্টু এঁটে টাইট করে দিচ্ছি। [মৃণাল ও বসন্ত জিতেনকে শক্ত করে ধরে রাখে। জিতেন ছটপট করতে থাকে]

পুরোহিত ॥ দৌড়াও মা লক্ষ্মী—দৌড়াও—

[মিনু দৌড়ে জিতেনের চারদিকে ঘুরতে থাকে। রতন উলুধ্বনি দেয়]

জিতেন ॥ (চিৎকার করে) একি মগের মুল্লুক নাকি? আমি কেস করব জেলে পুরব।

বসন্ত ॥ (ধমক দেয়) চুপ, হাতুড়ি মেরে মাথা ভেঙ্গে দেব।

[জিতেন ভয়ে চুপ করে। ততক্ষণ মিনুর সাতপাক ঘোরা হয়ে গেছে]

পশুপতি ॥ (খুশী হয়ে) যাক—ভালভাবেই শুভকাজ সম্পন্ন হয়ে গেল।

[সাতবার ঘুরে মিনুর মাথা ঘুরতে থাকে]

মিনু ॥ (টলতে টলতে) আমার ভীষণ মাথা ঘুরছে পুরুত মশাই—

পুরোহিত ॥ ভয় নাই। ঘুরানী লাগছে।

অনিল ॥ উল্টোদিকে আবার সাতবার ঘোর তা'হলে মাথা ছেড়ে যাবে।

পুরোহিত ॥ খবরদার মা লক্ষ্মী—ঐ কর্ম কইরো না, উল্টা পাক দিলেই বিবাহ বন্ধন খুইলা যাইব। অরা মূর্খ, অগো বুদ্ধি সুদ্ধি নাই। একটু সময় খাড়াইয়া থাক, আপনিই মাথা ছাইড়া যাইব।

পটল ॥ এই রতন হতভাগা—হাঁ করে কি দেখছিস ? ভেতরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।

রতন ॥ আমায় অত করে বলতে হবে না দাদাবাবু। আমি মেয়ের মা হই। আমার সব খেয়াল আছে।

পশুপতি ॥ (চমকে) কি বললি—কি বললি তুই ?

রতন ॥ (চাপা গলায়) ছিঃ, জামাই-এর সামনে ওভাবে কথা বলতে নেই।

[রতন লজ্জায় হাসি হেসে ভেতরে চলে যায়। পশুপতি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে]

পশুপতি ॥ এই পটলা। সবাইকে ভেতরে নিয়ে যা।

পটল ॥ হ্যাঁ যাই। আয় মৃণাল, বসন্ত—

পুরোহিত ॥ মূর্খ, পুরোহিতেরে আগে না খাওয়াইয়া নিজেরা গিললে নরকে যাইবা।

পশুপতি ॥ ঠিকই তো—আসুন পুরুত মশাই। আপনার খাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

পুরোহিত ॥ এতক্ষণে তোমাগো চেতনা হইছে। রাক্ষসের গুষ্টি !

[রতন বেরিয়ে আসে]

রতন ॥ সবাই আসুন ব্যবস্থা হয়ে গেছে

অনিল ॥ নিমন্ত্রিত লোকজন কেউ এলো না, আমাদের আগে বসা কি ঠিক হবে ?

রতন ॥ ওমা—তাও জানো না ! তোমাদের সরকার নেমন্তন্নের দফা যে শেষ করে দিয়েছে। এসো—এসো কত কাজ পড়ে রয়েছে—

[মিনু ও জিতেন ছাড়া সবাই ভেতরে চলে যায়]

জিতেন ॥ কাজটা খুব ভালো হোল না। ডলিকে এখন আমি কি কৈফিয়ৎ দেব ?

মিনু ॥ (গম্ভীরভাবে) বিয়ের পর অন্য মেয়ে সম্বন্ধে চিন্তা করা চরিত্রহীনতার লক্ষণ।

জিতেন ॥ একজন মেয়েকে কথা দিয়ে আরেকজনকে বিয়ে করা বুঝি খুব সৎ চরিত্রের লক্ষণ ?

মিনু ॥ সামান্য ব্যাপার নিয়ে অত ভাবছ কেন ?

জিতেন ॥ সামান্য ব্যাপার ! ডলি শুনলে ঠিক আত্মহত্যা করবে।

মিনু ॥ করবে না।

জিতেন ॥ তার মানে ?

মিনু ॥ আমি বলছি ডলি আত্মহত্যা করবে না।

জিতেন ॥ ডলিকে আপনি—তুমি চেন ?

মিনু ॥ সুধীরবাবুর মেয়ে তো ?

জিতেন ॥ হ্যাঁ—

মিনু ॥ সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে ?

জিতেন ॥ (অবাক হয়ে) হ্যাঁ—

মিনু ॥ (হেসে) আত্মহত্যা করবে না

জিতেন ॥ কেন ?

মিনু ॥ সে আরেকজন ছেলেকে বিয়ে করার জন্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে

জিতেন ॥ তুমি কি করে জানলে ?

মিনু ॥ আমিও যে সেই লাইনেই ছিলাম।

জিতেন ॥ (চমকে) এঁ্যা—কি বলছ তুমি ?

মিনু ॥ ঠিকই বলছি। ব্যর্থতার জন্যে আজকাল কোন মেয়েই আত্মহত্যা করে না। ভালবাসা যদি অপরাধ না হয়, তা হলে বহুজনকে ভালবেসে অবশেষে একজনকে বিয়ে করাই সবচাইতে ভাল।

জিতেন ॥ (দু'হাতে মাথা চেপে) চুপ করো—চুপ করো—আমি পাগল হয়ে যাব।

আর এক তরঙ্গ

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য

চরিত্র

কুঞ্জ	ঠাকুর মশাই
সাধন	চৌধুরী
বংশী	মহাদেব
সদানন্দ	যুগল

গোপাল

[একটা মন্দিরের একাংশ দেখা যাচ্ছে। মন্দিরের ডানদিকের একটা চত্বরের ওপর গরদের কাপড় পরে ঠাকুরমশায় মন্দিরের দিকে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। কিছু কিছু লতাগাছ ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে। সময়টা গভীর রাত্রি এবং সেই নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। এই সময় বাইরে থেকে শিশুর আওয়াজের মত শব্দ শোনা যায়। সংগে সংগে চণ্ডী থেকে উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি শোনা যায়। আবৃত্তি বাইরে থেকে মাইক যোগে বা ঠাকুর মশায়ের কণ্ঠ থেকে হতে পারে। ঠাকুর মশায় একটু সরে গেলে দেখা যাবে একটা হাড়িকাঠ। আবৃত্তি শেষ হলে ঠাকুর মশায়ের নাম ধরে ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে কুঞ্জ। কুঞ্জের বয়স ৫০-৫৫। একজন সাধারণ চাষীর পোষাক। কুঞ্জ এসে ঠাকুর মশায়ের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ঠাকুর মশায় খানিকটা সরে গিয়ে চীৎকার করে ওঠে—]

ঠাকুর ॥ পুজো করবার সময় হোল আর তুই কিনা আমাকে স্পর্শ করতে এগিয়ে আসছিস হতভাগা।

কুঞ্জ ॥ আমার ছেলেকে বাঁচান ঠাকুর মশায়।

ঠাকুর ॥ তোর ছেলে—মানে—

কুঞ্জ ॥ সদা—সদা আমার ছেলে ঠাকুর মশায়।

ঠাকুর ॥ যণ্ডা মতন গুণ্ডা ছেলেটা তোর দুলাল বুঝি !

কুঞ্জ ॥ ও অবুঝ—ঠাকুর মশায়। মা'কে বলে ওর পাপটা মাপ করে দিন।

ঠাকুর ॥ আমি মাপ করার কে রে ব্যাটা ! যার ভাবনা তিনিই ভাববেন। যা—যা আমাকে পূজো সারতে দে।

কুঞ্জ ॥ বাপ হয়ে আমি মা'র কাছে মাপ চাইতে এসেছি। আপনার দয়া হোক।

ঠাকুর ॥ অমনভাবে দয়া করতে গেলে মা'র কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ দোব বল !

কুঞ্জ ॥ আপদে বিপদে আপনার চরণে নির্ভর করেছি ঠাকুর মশায়। ... ার আমাকে বাঁচান।

ঠাকুর ॥ দেখতো কুঞ্জ তোরা কি রকম ভুল করিস। আমি মা'র সেবক মাত্র। আমি তোদের শাস্তি দিতে পারি না আবার পাপ করলে তা মকুবও করতে পারি না।

কুঞ্জ ॥ আমার যে ঐ একটামাত্র ছেলে ঠাকুর মশায়।

ঠাকুর ॥ বেশ'ত তাকে নিয়ে আয়। মা'কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করি।

কুঞ্জ ॥ ও সোনাবাঁধে গেছে।

ঠাকুর ॥ কি—কি বললি হতভাগা। সোনাবাঁধে গেছে তোর ছেলে ?

কুঞ্জ ॥ আমার নিষেধ শুনল না। ওর মা'র নামে দিব্যি দিলাম তাতে কাজ হল না। আমি শেষ পর্যন্ত লাঠি নিয়ে তেড়ে গেলাম তবুও—

ঠাকুর ॥ তবুও— ?

কুঞ্জ ॥ রাগের মাথায় ছেলেটাকে লাঠি দিয়ে পিটালাম। কপালটা কেটে ঝরঝর করে রক্ত ছুটল কিন্তু তবু মুখে কথাটা বলল না। আমি জানেন ঠাকুর মশায় আমি—

ঠাকুর ॥ আহা-হা! কাঁদছিস কেন! কি হল তাই বল না?

কুঞ্জ ॥ রক্ত দেখে আমি থাকতে পারলাম না। ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম। তারপর—

ঠাকুর ॥ তোর ছেলে অবাধ্য হয়ে গেছে। তুই ওকে—

কুঞ্জ ॥ সদা চোখের জল মুছে আমাকে বললে—বাবা সারা জীবন তুমি মাঠ চষেছ! বছরের অর্দ্ধেক দিন খেতে পাও নি—বাড়ী-ঘর-জমি-ঘটিবাটি সব নিলামে চলে গেছে। এমন কি—

ঠাকুর ॥ আবার কাঁদছিস—?

কুঞ্জ ॥ বললে এমনকি আমাকেও উপোষ করিয়ে রেখেছ। তোমরা সহ্য করেছ। আমরা সহ্য করব না। আমাদের সত্যিকারের বাঁচার ইচ্ছেতে তুমি বাপ হয়ে কাঁটা বিঁধিয়ে দিও না।

ঠাকুর ॥ ব্যস্। অমনি গলে গেল আমাদের কুঞ্জবাবু।

কুঞ্জ ॥ মা-মরা ছেলেকে এরপর আমি কি বলব ঠাকুর মশায়। আমি তো ওর বাপ।

ঠাকুর ॥ বাপ বলে ছেলেটার পাপের কথা ভুলে গেলি!

কুঞ্জ ॥ সব কথা মনে ছিল। কিন্তু যখন বলল তুমি আমাকে উপোষ করে রেখেছো তখন যেন কেমন হয়ে গেলাম। ওকে আর আটকাতে পারলাম না।

ঠাকুর ॥ মা আমার শক্তির আধার, ভুলে গেছিস কুঞ্জ।

কুঞ্জ ॥ আপনি দয়া করুন।

ঠাকুর ॥ যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।

মানে বুঝিস?

কুঞ্জ ॥ আপনাকে আমাদের সর্বস্ব বলে জেনে এসেছি।

ঠাকুর ॥ মা শক্তিরূপিনী। চক্ষু বন্ধ করে পৃথিবীর পাপ অবলোকন করেন

তারপর—তারপর—মা মাগো—কুঞ্জর ছেলে—মা একবার চোখ খোল—এ গ্রামে তোমার দেওয়া উপদেশকে গ্রাহ্য না করার মত ছেলে—সদা, কুঞ্জর ছেলে, মা-মাগো তুমি শুনতে পাচ্ছ না—কুঞ্জ—সদা—

[ঠাকুর মশায় ক্রমশঃ চীৎকার করতে থাকেন। কুঞ্জ বিচলিত হয়ে "ঠাকুর মশায়—ঠাকুর মশায়" বলে চীৎকার করতে থাকে]

কুঞ্জ ॥ ঠাকুর মশায়—ঠাকুর মশায়। বাঁচান—সদাকে বাচান।

ঠাকুর ॥ মা স্বপ্ন দিয়েছেন তাই গ্রামের বাঁধ উপছে মেছোঘেরীর জল প্রবেশ করবে গ্রামের কৃষি জমিতে। জোর করে দখল করা কৃষি জমির চাষীরা সব পাপী। সেই পাপ ধুয়ে মুছে দেবেন মা। আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন। তার বিরুদ্ধাচরণ যে করবে—

কুঞ্জ ॥ ঠাকুর মশায়!

ঠাকুর ॥ আজ নিশীথ রাত্রেঐ জল প্রবেশ করবে, তার বিরুদ্ধাচরণ করলে মা'র আদেশে তাকে বলি দেওয়া হবে।

কুঞ্জ ॥ সেবার যখন গ্রামে ওলাওঠা দেখা দিল তখন আমার বৌটা মা'কে রক্ত দিয়েছিল গ্রামের মংগলের জন্যে।

ঠাকুর ॥ দূর পাগলা। সে ত গাঁয়ের সব এয়োতিরাই দিয়েছিল। সেই পুণ্যেই তো তোর ছেলেটা অমন নাদুস-নুদুসটি হতে পেরেছে। এখন তার যদি অতি বাড় বাড়ে তাহলে মা কি তাকে ছেড়ে দেবেন ভেবেছিস!

কুঞ্জ ॥ আমি করব ঠাকুর মশায়।

ঠাকুর ॥ গত বছর যখন চৌধুরীদের জমি তোরা জোর করে দখল করলি তখনই তোদের বলেছিলাম, ওরে বেশী বাড়তে যাসনি—শেষে ঝড়ে পড়ে যাবি।

কুঞ্জ ॥ কিন্তু জমিটা তো সত্যিই আমাদের। চিরকাল আমাদের বলে জেনে এলুম আর যখন আমরা বললুম, ধান এবার আমাদের ঘরে তুলে চৌধুরী মশাইকে যা দেবার তা দেব, অমনি চৌধুরী মশাই ফস করে বলে বসলেন

—ওখানকার সব জমিটা আমার। এটা তো অন্যায় বলে বসলেন চৌধুরী মশাই।

ঠাকুর ॥ দেখ বাপু, আমি হলাম গে তোদের গ্রামের পুরোহিত। তোদের মংগল করাটাই আমার একমাত্র কাজ। আমি যেমন তোদের তেমনি চৌধুরী মশাই-এর। কারুর কোলে ঝোলটানা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তবে এটুকু বলব, চৌধুরী মশাই কখনো ভুল করেন না।

কুঞ্জ ॥ ওনার জমি হলে আমরা জোর করে দখল নেবার পর উনি ছেড়ে দিতেন বুঝি! সেপাই পাঠিয়ে ধরিয়ে নে যেতেন না?

ঠাকুর ॥ অমন ভাল লোক কোথায় পাবি বল। কিন্তু মা শুনবেন কেন বল। আজ বাতেই মা পাপীদের শাস্তি দিতে লেগে গেছেন।

কুঞ্জ ॥ ওটা যে সত্যি আমাদের জমি নয় তা আমরা কেমন করে জানব বলুন। বাপ-পেতামহ—

ঠাকুর ॥ ঐ রোগেই তো তোরা মরিস। তোদের চোদ্দগুষ্টিকে চৌধুরী বংশ দেখে এল আর আজ তারা তোদের শত্রু হলেন। বোঝ এবার!

কুঞ্জ ॥ আমি সত্যি বলছি ঠাকুর মশাই। ও জমিটা আমাদের জেনে দখল নেছিলাম গাঁয়ের সকলে।

ঠাকুর ॥ (চীৎকার করে) তাহলে বলছিস মা যে আমাকে স্বপ্ন দিয়েছে তা ভুল—আমার পূজা ভুল—আমার মন্ত্র ভুল—আমি অসৎ—আমি—আমি—

কুঞ্জ ॥ (ভয় পেয়ে যায়) তা নয়—বিশ্বাস করুন এখন আমি বুঝতে পেরেছি তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমার ছেলেটাকে একমাত্র আপনিই বাঁচাতে পারেন ঠাকুর মশাই। বুড়ো বয়সে ঐ একটা ছেলেই আমার—

ঠাকুর ॥ ঠিক আছে—ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করব। মা'র কোপে একবার পড়লে তাকে বাঁচান বড় শক্তরে কুঞ্জ। অমন ডাকসাইটে ছেলে যদি এরকম ভুল করে বসে তাহলে কে রক্ষে করবে বল। সোনাবাঁধ

ছাপিয়ে জল আসবে গাঁয়ের মধ্যে। তাকে আটকান কি মানুষের সাধ্যি আছে রে!

কুঞ্জ॥ চলে যাবার সময় বললে—জল আটকাতে চললাম।

ঠাকুর॥ জল আটকাতে চলল!

কুঞ্জ॥ দোষ নেবেন না ঠাকুর!

ঠাকুর॥ নীচু জমিতে জল এলে তোদের ক্ষতি কি?

কুঞ্জ॥ আমি এসব কিছুই ভাবিনি ঠাকুর। আমার ছেলে ভেবেছে। বলে তোমার কাল গিয়েছে। বলে মার খাব আর খালি পেটে হা হুতাশ করে বেড়াবার দিন চলে গেছে। এখন নাকি মার কে বদলা মার। খুন কে বদলা খুন।

ঠাকুর॥ তুইও শিখে নিয়েছিস দেখছি।

কুঞ্জ॥ ওরা সব সময়ই ঐ এক কথাই বলে।

ঠাকুর॥ ওরা—মানে কতজন কুঞ্জ।

কুঞ্জ॥ গাঁয়ের অনেক লোক।

[প্রবেশ করে সাধন। সাধনও একজন প্রৌঢ় চাষী]

সাধন॥ কত লোক তার হিসেব ঠাকুর মশাইকে দেবার দরকার নেই কুঞ্জদা। তুমি ঘরে চল।

কুঞ্জ॥ সাধন, আমার সদা যে—

সাধন॥ তার জন্যে ঠাকুরমশায়ের পায়ে পড়বার তো কোন দরকার নেই।

ঠাকুর॥ মানে মন্দিরে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলছিস, ভুলে যাসনি সাধন!

সাধন॥ আমাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার মতলব করেন যে মা সেই মাকে বিসর্জন দিয়েছি, জানবেন ঠাকুর মশাই।

ঠাকুর॥ মা ইচ্ছে করলে তোর ঐ লকলকে জিভখানা টেনে ছিঁড়ে দিতে পারেন তা জানিস?

সাধন॥ যতক্ষণ না পারছেন ততক্ষণ আপনার গুণ কীর্তন করে যাই!

ঠাকুর ॥ বংশীকে ভুলে গেলি নাকিরে ?

সাধন ॥ মায়ের মন্দিরের পুরোহিত হঠাৎ জেলে-সর্দার বংশীর সাহায্য নিতে চাইছেন কেন বলুন তো ? মা শক্তিময়ী তাহলে আপনাকে ত্যাগ করেছেন বলুন ?

ঠাকুর ॥ মা নিজে কাজ করেন না। কাজ করান তাঁর ভক্তদের দিয়ে। বংশী তাঁর ভক্ত। আমি স্বপ্ন পেয়েছি—।

সাধন ॥ রাখুন আপনার বুজরুকী। কুঞ্জদা, সদাকে ফেরাবার জন্যে এখেনে ধন্না দিয়ে কোন লাভ নেই।

কুঞ্জ ॥ কিন্তু ঠাকুর যে বলছেন মা'র স্বপ্নে সমস্ত গাঁ এখুনি ভেসে যাবে।

সাধন ॥ সোনাবাঁধের ওপর পাহারা রেখে দেখলে চল মা'র স্বপ্নাদেশ না বংশী জেলের দল বাঁধ ভেঙে আমাদের চাষের জমিতে নুন জল ঢোকাচ্ছে।

ঠাকুর ॥ মারঙ্গে চালাকী। জানিস, এখুনি মা'র ইচ্ছেতে তোকে বলি দিতে পারি !

সাধন ॥ দেশ থেকে কি আইন সব লুঠপাঠ হয়ে গেছে নাকি ? নাকি সতী পোড়ান, নরবলি আবার নতুন করে চালু করলেন চৌধুরী মশায়ের মাইনে-করা চাকর ভাস্কর ঠাকুর !

ঠাকুর ॥ এতদূর—তোর এতদূর স্পর্ধা সাধন। তুই কিনা এই গাঁয়ে বসে ভাস্কর ঠাকুরকে অপমান করতে সাহস পাস ! আমি এখুনি—

সাধন ॥ থাক গাঁ মাথায় করে মা শক্তিময়ী—মা শক্তিময়ী করে রাত দুপুরে চীৎকার করবার দরকার নেই। আমরা চলে যাচ্ছি। চলে এস কুঞ্জদা।

কুঞ্জ ॥ তুই যা সাধন। আমি সদাকে বাঁচাব। ঠাকুর মশাইকে বলে—

সাধন ॥ সোনাবাঁধে গিয়ে বাধা না দিতে পারলে সব্বনাশ হয়ে যাবে কুঞ্জদা। এদের পায়ে পড়ে কাঁদলেও কোন সুরাহা হবে না। আমি বলছি তুমি চলে এস।

কুঞ্জ ॥ চৌধুরীমশাই এমন কাজ কখনও করতে পারে না। এ তোদের বানান কথা সাধন। আমার সদাকে আমি মা'র কোপে ফেলতে পারবো না।

সাধন ॥ এরা শয়তান—এরা পিশাচ। পয়সার জন্যে এরা জাত মান মা'র ইজ্জত পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পারে!

ঠাকুর ॥ এ্যাই—এ্যাই সাধন—ভদ্রলোকের মত কথা বল।

সাধন ॥ সত্যি কথা বলতে গেলে যদি ছোটলোকের মত শোনায় তো শোনাক।

ঠাকুর ॥ তোকে বেঁধে রাখব জানস।

সাধন ॥ চৌধুরী মশায়ের গুণ্ডা দিয়ে বুঝি।

ঠাকুর ॥ মা আমাকে যে শক্তি দিয়েছেন তাতে চৌধুরী মশায়ের—

সাধন ॥ বাড়ীতে নিজের মেয়েকে পাঠাতে বাধ্য হয়েছেন।

ঠাকুর ॥ কি? কি বললি হতভাগা—গরু—।

সাধন ॥ আমি কেন! গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবাই জানে আপনার মেয়ের কীর্তিকলাপ। আর আপনার ওপর চৌধুরী মশায়ের নজর যে ভাল কেবল ঐ জন্যে তাও সবাই একবাক্যে বলে।

ঠাকুর ॥ আমার নামে কেচ্ছা রটিয়ে বাঁচতে পারবি মনে করছিস।

সাধন ॥ বলি দেবার সাহস থাকে তো দিন দেখি! অনেকক্ষণ তো হেই—হেই করছেন এবার কাজটা দেখান?

ঠাকুর ॥ মা তুমি একবার বল। ঐ খাঁড়াটাকে কাজে লাগাই। তোমার অপমান আর সইতে পারছি না মা!

সাধন ॥ আহারে! মা তোমার দুঃখে ছেলে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছে মা। একবার আদেশ দাও। আমার ধড় মুণ্ডটা আলাদা করে দিক।

ঠাকুর ॥ বুঝবি। কাল সকালে যখন দেখবি তোদের হাজার হাজার বিঘে জমি ঐ নোনা জলের তলায় ডুবে গেছে তখন বুঝবি মা'র কথা সত্যি কিনা। তারপর তোর ব্যবস্থা আমি করাব।

সাধন ॥ বংশীর জালে আমাকে ফেলবেন এই তো! যেমন আজ বলি দেবেন কুঞ্জদার ছেলে সদাকে!

কুঞ্জ ॥ কি বলছিস, সাধন!

সাধন ॥ ঠিকই বলছি কুঞ্জদা। সদা গাঁয়ের সব জোয়ানদের নিয়ে বেরিয়ে গেছে সোনাবাঁধে পাহারা দেবার জন্যে। বংশীর দল নিশ্চয়ই বাঁধ ভেংগে নোনা জল ঢোকাবে আমাদের জমিতে।

কুঞ্জ ॥ এতো অন্যায় কাজ সাধন।

সাধন ॥ ওরা অন্যায় করতেই চাইছে। গতবছর আমরা জমি নিয়েছি। সে শোক ভুলতে না পেরে চৌধুরী মশাই এইভাবে দখল নিতে চাইছেন।

ঠাকুর ॥ বেশতো, যা বংশীর সংগে লড়াই করগে যা।

সাধন ॥ যাবোই তো, ঘরে বসে কুঞ্জদার মত মার খেতে পারব না। যেমন কুকুর তেমনি মুগুরের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে।

ঠাকুর ॥ যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা হারামজাদা!

সাধন ॥ আর এগোবেন না। শুধু ছোঁয়া বাঁচান দায় হবে তাই নয়— ছুঁড়ে ফেলে দেব ঐ হাড়ি কাঠে।

ঠাকুর ॥ তবে জেনে রাখ এরপর তোর পালা।

সাধন ॥ দেখব কত লোককে বলি দেবার ক্ষমতা আপনার আছে। আমি চললাম কুঞ্জদা। তবে তোমাকে বলে যাচ্ছি এভাবে নিজেদের সব্বনাশ আর ডেকে এনো না।

কুঞ্জ ॥ তবে যে গাঁয়ের ওলাওঠা সারাবার জন্যে তোর বৌদি রক্ত দিল! তখন—

সাধন ॥ তোমাদের পুরোন কথায় আমি কিছুই জানি না। আজ যা দেখছি তাই বলছি। সদার জন্যে এখেনে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলে অন্যায় করা

হবে। তাতে তোমার পাপ আরও বাড়বে বই কমবে না।

[চলে যেতে যায়]

ঠাকুর ॥ আমি চৌধুরী মশাইকে সব কথাই বলব সাধন।

সাধন ॥ ভয় পাব ভাবছেন? আপনার মেয়ের গুণের কথাটা একটু বেশী করে বলবেন। তাতে রাগটা বেশী হবে। আর ঐ খাঁড়াটা হয়ত আরও বেশী ধারাল করার প্রয়োজন হবে।

ঠাকুর ॥ বুঝলি কুঞ্জ, আমি হচ্ছি মা'র সেবক। অত্যধিক রাগ প্রকাশ করা আমার অত্যন্ত অপরাধ। আমি সাধনকে বেশ শিক্ষা দিতে পারতাম কিন্তু—

কুঞ্জ ॥ আমরা সবাই আপনার সন্তানের মত। আমাদে অন্যায়গুলো আপনি ক্ষমা না করলে কে করবে ঠাকুর?

ঠাকুর ॥ এরা তো এটাই বুঝতে চায় না। মনে করে আমি ওদের ঠকাচ্ছি। ওরে বাবা, জমি চৌধুরীদের। লুঠেছিস তোরা। চাষ করছিস তোরা। আবার মাঠের ধান ঘরে তুলেছিসও তোরা। এর মধ্যে আমার নাক গলাবার প্রয়োজনটা কোথায়!

কুঞ্জ ॥ সেটা তো সত্যি কথাই ঠাকুরমশাই। সেই জন্যেই তো আপদে বিপদে আপনার কাছে ছুটে আসি।

ঠাকুর ॥ তোর মনে আছে সাধনের বৌটার কথা। ঐ যেরে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করল।

কুঞ্জ ॥ মনে আছে ঠাকুর।

ঠাকুর ॥ ঐ বৌ-এর জন্যে তো সাধনের শ্রীঘর দেখতে হোত নাকি?

কুঞ্জ ॥ সাধন বলে, চৌধুরীদের বাড়ী সেবার যে লোকটা কোলকাতা থেকে এসেছিল সে নাকি পুকুর ধারে সাধনের বৌকে—

ঠাকুর ॥ মিথ্যে কথা, একেবারে ডাহা মিথ্যে কথা। আরে সে হোল কলকাতার একজন বিখ্যাত ব্যবসাদারের ছেলে। তার দরকারটা কি

বলত এই অজ পাড়াগাঁয়ে এসে সাধনের বৌকে টান মারবার। ওসব লোক ক্ষ্যাপানোর চেষ্টা। আসলে সাধনই ওর বৌকে গলা টিপে মেরে ফেলে পুকুরে ভাসিয়ে দিয়েছে।

কুঞ্জ ॥ না—না ঠাকুর মশাই তা কেমন করে হবে। অমন মিল এ তল্লাটে দুটো ছিল না। দেখলেন না সেই থেকে সাধনটা বিয়ে পর্যন্ত করলে না।

ঠাকুর ॥ তুই চুপ কর দিকিনি। দারোগাবাবু নিজের মুখে বলেছেন বৌকে গলা টিপে মেরে তবে জলে ভাসান হয়েছে।

কুঞ্জ ॥ আমি হলপ করে বলতে পারি এটা নেঘ্যাৎ বানান কথা।

ঠাকুর ॥ আঃ, থাম কুঞ্জ। তখন চৌধুরীবাবু অত পয়সা-কড়ি খরচা করে সাধনকে বাঁচালেন।

কুঞ্জ ॥ এও তো খুব অন্যায় কথা ঠাকুর মশাই। একটা খুনেকে চৌধুরীমশায়ের বাঁচান কি ঠিক হল!

[প্রবেশ করেন চৌধুরী মশায়। গায়ে ফতুয়া ও মোটা কাল পাড কোঁচান ধুতি। হাতে একটা ছড়ি। বয়স ৫০।৫৫ হবে]

চৌধুরী ॥ না বাঁচাল ওটা যে ফাঁসিতে যেত কুঞ্জ। তোদের যদি দেখতেই না পারলাম তাহলে গাঁয়ে বসে না থেকে শহরে গিয়ে আমার লোহা লক্কডের ব্যবসা দেখলেই তো ছিল ভাল।

কুঞ্জ ॥ (নমস্কার করে) আমার সদাটার জন্যে এসেছি চৌধুরী মশায়।

চৌধুরী ॥ তোর সদা যে অন্যায় করছে তা তুই ভাল করেই জানিস। তবু তুই কেন এলি বল কুঞ্জ।

কুঞ্জ ॥ আমার যে একটা মাত্র ছেলে বডবাবু।

চৌধুরী ॥ তাকে আমার বাঁচান উচিত, বলছিস তো!

কুঞ্জ ॥ ওকে হারালে আমি বেঁচে থাকব কি নিয়ে বলুন।

চৌধুরী ॥ বাজে কথা থাক। কোথায় গেল ছোঁড়াটা?

কুঞ্জ ॥ সাধন বলছিল সোনাবাঁধে দলবল নিয়ে গেছে। '

চৌধুরী ॥ (চীৎকার করে ওঠে) ভাস্কর!

ঠাকুর ॥ পাপ ঢুকেছে কর্তামশাই। সমস্ত গাঁয়ে পাপ ঢুকেছে। এরা নরবলি হবে বললে আইন দেখায়।

চৌধুরী ॥ আইন দেখায়! তোমার স্বপ্নের কথা এরা এখনও শোনেনি?

ঠাকুর ॥ কুঞ্জের দল শুনে ছুটে এসেছে কিন্তু সদা দল নিয়ে এগিয়ে গেছে? আর—

চৌধুরী ॥ আর- -!

ঠাকুর ॥ সাধন এসেছিল শাসাতে

চৌধুরী ॥ কি বলে গেল?

ঠাকুর ॥ আপনার নামে কেচ্ছা ছড়াল। সেই সঙ্গে আমার ঘরের—

চৌধুরী ॥ সেই পুরোন কাসুন্দী। বংশী দেখা করে গেছে, ভাস্কর?

কুঞ্জ ॥ আমার সদাকে ফিরিয়ে দিতে হবে বড়বাবু।

চৌধুরী ॥ আমি কি তোর সদাকে আটকে রেখেছি!

কুঞ্জ ॥ ঠাকুর মশাই বলেছেন মা'র দয়া হলে নাকি- -।

চৌধুরী ॥ তোর ছেলের এত সাহস কোথা থেকে হ'ল, কুঞ্জ?

কুঞ্জ ॥ ছোটছেলে বুঝে কাজ করতে পারে না বড়বাবু।

চৌধুরী ॥ তাহলে একটু শিক্ষা পাক।

ঠাকুর ॥ মা-র কোপে পড়লে বাঁচান মুশকিল হবে।

চৌধুরী ॥ যাতে না পড়ে তার চেষ্টা কুঞ্জ করবে বৈকি।

কুঞ্জ ॥ ঠাকুর মশাই দয়া করুন। মা'কে একবার—

চৌধুরী ॥ মার আদেশে গ্রামের চাষজমি ভাসছে। এতে ঠাকুর মশায়ের তো কোন হাত নেই।

কুঞ্জ ॥ আমি ছেলেকে বুঝিয়ে বলে—

চৌধুরী ॥• সোনাবাঁধে চলে যাও। এখুনি ছেলেকে বুঝিয়ে নিয়ে এস। সেই

সঙ্গে দলবলকে নিয়ে আসবে। মা-র আদেশ অমান্য করলে সকলে শেষ হয়ে যাবে কুঞ্জ।

কুঞ্জ ॥ আমি যাচ্ছি বড়বাবু। আমি ওকে ফিরিয়ে আনবই। আপনি তাকে ক্ষমা করবেন বড়বাবু!

চৌধুরী ॥ মা র কাছে মাথা নোয়াবি তাহলেই যথেষ্ট। আমি কেরে ব্যাটা! না কি বল ভাস্কর!

ঠাকুর ॥ মূর্খদের বোলেও বোঝান যায় না।

কুঞ্জ ॥ আমি এখনই ওকে ধরে নিয়ে আসছি ঠাকুর মশাই। আমার একমাত্র ছেলেকে আমি হারাতে পারব না। [প্রস্থান]

চৌধুরী ॥ সদানন্দ আমার আনন্দের ব্যাঘাত করছে ভাস্কর!

ঠাকুর ॥ আমার স্বপ্নের কথা ওরা অবিশ্বাস করছে কর্তামশাই।

চৌধুরী ॥ স্বপ্ন ওদের বিশ্বাস হবে যখন কাল সকালে ওরা দেখবে যেছো ঘেরীর নোনা জল চাষের জমিতে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে।

ঠাকুর ॥ কিন্তু আজ রাতে যদি সদার দল—

চৌধুরী ॥ সদা দল নিয়ে গিয়েছে কে তোমাকে বললে?

ঠাকুর ॥ সাধন এসেছিল কুঞ্জকে নিয়ে যেতে। সেই সব কথা জানিয়ে গেল। আমাকে শাসিয়ে গেল, সেই সঙ্গে আপনাকে অপমান করে গেল।

চৌধুরী ॥ আমাকে অপমান ও অনেক দিন ধরেই করে চলেছে। সেটার জন্যে দায়ী তুমি—তোমার এই শক্তিময়ী।

ঠাকুর ॥ আপনার জন্যেই তো আমি স্বপ্ন দেখলাম যে—

চৌধুরী ॥ চুপ কর! সামান্য মূর্খ চাষীদের তুমি বোঝাতে পারলে না। টাকার পর টাকা নিয়ে চলেছ তোমার মন্দির সংস্কারের জন্যে। গত বছর সমস্ত জমিতে ওরা বসে পড়ল জোর করে। ঐ জমি উদ্ধারের নাম করে গত তিন দিন ধরে খুব শাঁখ ঘণ্টা বাজালে আর আমার টাকার শ্রাদ্ধ করলে। এখন বলছ সদা দল নিয়ে সোনাবাঁধে হাজির হয়েছে।

ঠাকুর ॥ আমি তো সব রকম ব্যবস্থা করেছি কর্তামশায়। চারিদিকে জোর করে জমি দখল শুরু হয়েছে। মালিকরা যে এতদিন জোর করে ঐ জমি দখল করে রেখেছিল তাও প্রমাণ হতে আরম্ভ করেছে। এ অবস্থায় আমি মা'র নাম করে যা করেছি তাতে ঐ বুদ্ধুগুলো তা সহজেই মেনে নেবে হুজুর।

চৌধুরী ॥ মেনে তারা নিয়েছে কিনা সেটা বল ?

ঠাকুর ॥ না—মানে—

চৌধুরী ॥ ঠিক করে বল।

ঠাকুর ॥ আজ্ঞে কুঞ্জর মত আরও গাঁয়ের লোক—

চৌধুরী ॥ গাঁয়ে সাধনের মত লোক নেই। কুঞ্জর ছেলের মত আরও ছেলে গাঁয়ে নেই কি ?

ঠাকুর ॥ এ ভিন্ন অন্য উপায় কিছু ছিল না কর্তামশায়।

চৌধুরী ॥ চুপ কর বেকুব কোথাকার। বংশীর দলের সংগে মুকাবেলা করে এমন সাহস এ গাঁয়ে জন্মায়নি।

[প্রবেশ করে বংশী, যুগল এবং মহাদেব প্রত্যেকের হাতে লাঠি। সকলেই খুবই উত্তেজিত।]

বংশী ॥ আমি সেটাই জানাতে এসেছি কর্তামশায়।

চৌধুরী ॥ কটা আহাম্মকের জন্যে আমরা কি সকলেই দেবতার কোপে পড়ব বলতে চাস ?

বংশী ॥ দেবতা টেবতার নাম নিয়ে আর ছেলেখেলা করবেন না কর্তামশাই গাঁয়ের সব জোয়ানেরা ওসব কথায় থুথু দিচ্ছে। আসল কথা বলুন আমাদের দিয়ে যে কাজ করাচ্ছেন তাতে ঝুঁকি অনেক। সেইমত বুঝে কথা দিন কর্তামশাই।

চৌধুরী ॥ শক্তিময়ী যদি ঠাকুর মশাইকে স্বপ্ন দিয়ে থাকে তবে আমি তা

মধ্যে নাক গলিয়ে পাপের ভাগীদার কেন হই বল বংশী। তবে মানা না মানা তোদের ব্যাপার। তোরা যা ভাল বুঝিস তাই কর।

মহাদেব॥ দেবতাকে মানব না একথা বলছে না সর্দার। কিন্তু গাঁয়ের রোষ যা পড়েছে তাতে বিপদ এলে ঠাকুর মশাই ঠেকাবেন কি কর্তামশাই।

যুগল। আমারও কথা তাই। এই অন্ধকারে কোদাল চালাতে হবে। কেউ যদি ঢেলা মারে তাহলেও আমরা জখম হতে পারি। সে বিপদট তো আমাদের ঘাড়েই আসবে।

চৌধুরী॥ কেউ বাধা দেবে ভাবছিস কেন?

বংশী॥ গাঁ থেকে কম করে দু'শ লোক গেছে মশাল নিয়ে।

চৌধুরী॥ তোদের জেলেরা সংখ্যায় কত, বংশী?

বংশী॥ ওর চেয়ে কম হবে না। কিন্তু জেলেপাড়ার সকলে তো জানে ন বংশী মাটি কুপিয়ে জল নামাবে মাঠে?

মহাদেব॥ সবাই জানে মা-র ইচ্ছেয় মেছোঘেরী তিনগুণ হচ্ছে। জেলের মাছ বেশী পাবে ঠাকুরের দয়ায়।

চৌধুরী॥ তাহলে একথা বিশ্বাস করছে না কেন চাষীর দল?

যুগল॥ সাধন আছে। সদা, মাধব, শম্ভু সকলকে বুঝিয়েছে এটা আপনা কারসাজি।

ঠাকুর॥ কর্তামশাই কি শুধু শুধু কারসাজি করছে রে হতভাগা! আমি স্ব পেয়েছি বলেই তো—

বংশী॥ তাহলে সবাই চুপ করে বসে থাকুন না। মা-র কাজ মা নিশ্চয় করবেন।

ঠাকুর॥ মা পথ দেখান। আমরা সেইপথ ধরে চলি। পথ ভুল করে সদাদের মত এ বছরের জমি ওবছরে জলে ডুববে। এই তো নিয়ম বংশী

যুগল ॥ তাহলে রাত বিরেতে আমাদের না পাঠিয়ে নিজে গেলেই তো পারতেন।

চৌধুরী ॥ কাকে কি বলছিস জানিস, যুগল! গাঁয়ের কোন লোক যা সাহস করে না তুই তাই করছিস তা বুঝতে পারছিস?

মহাদেব ॥ আমাদের নতুন মেছোঘেরী চাই না কর্তামশাই।

চৌধুরী ॥ মেছোঘেরী না বাড়াতে পারলে আমি ব্যবসা তুলে দেব। তোদের জেলেপাড়ার কি অবস্থা হবে তা ভেবে দেখেছিস!

বংশী ॥ আপনি তুলে দিলেও আমরা মেছোঘেরীর মালিক হয়ে সকলে একসংগে চালাব।

চৌধুরী ॥ আচ্ছা! এসব খেয়ালও মাথায় আসছে তাহলে। একশ'র ওপর জালের দরকার জানিস? প্রতি বছরে পাঁচহাজার টাকার মাছ ছাড়তে হয় জানিস? টানা জালের দিন কম করে এক হাজার টাকা হাতে নিয়ে নামতে হবে ভেবে দেখেছিস? আর মাল বিক্রী করতে হলে যে গদীর লোক দরকার তা জানিস নিশ্চয়?

মহাদেব ॥ তার মানে বাঁধ না কাটলে আপনি আমাদের ভাতে মারবেন।

চৌধুরী ॥ তোরা এটা বুঝতে চাস না বলেই তোদের ছোটলোক বলে গালি দিই। তোদের ভালর জন্যেই তো আমি ঝিল বাড়াতে চাইছি। আরও মাছের চাষ হবে। তোদের মজুরী বাড়াতে পারব। তোদের মধ্যে যারা কাজ পায়না তাদের কাজ দিতে পারবো। তাছাড়া—।

ঠাকুর ॥ আপনি বলুন কর্তামশাই, ওরা বুঝতে চাইছে।

চৌধুরী ॥ তোরা যে কজন আজ রাতে বাঁধ কাটবি তাদের সকলকে আমি তোলা মাছের একটা অংশ বিনা পয়সায় দিয়ে দেব জেনে রাখিস।

মহাদেব ॥ আমাদের সকলকে।

চৌধুরী ॥ তোদের সকলকে। প্রতিদিন মাছের ভাগের কেউ পাঁচ কেউ দশ খুঁচি করে বিনা পয়সায় মাছ পাবি॥

যুগল ॥ সর্দার এ সুযোগ আমি ছাড়তে পারব না।

বংশী ॥ লোভ আমারও হচ্ছে কর্তামশাই। কিন্তু সাধন, সদা, নিতাই সকলে চিরকাল আমাদেরও দেখে এসেছে। সেবার মড়কের সময় সব এয়োতিরা রক্ত দিয়েছিলো মায়ের মন্দিরে।

চৌধুরী ॥ মানলাম। ওরা শক্তিময়ীকে ভয় করে তাই রক্ত দিয়ে ভয় থেকে রেহাই পেতে চেয়েছে। কিন্তু সেবার জমি দখলের সময় আমার মেছো-ঘেরী দখল করবে ওরা বলেনি।

যুগল ॥ আমাদের বুঝাতে চেয়েছিল আমরা শুনিনি।

ঠাকুর ॥ দখল করে ওরা জল নষ্ট করতো। তারপর গাঁসুদ্ধ সকলে শুকিয়ে মরতো। আমি তিনদিন মা-র কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে রইলাম বলে মা দয়া করলেন!

চৌধুরী ॥ কিরে, কথা বলছিস না কেন, বংশী?

বংশী ॥ কথাটা ঠিক। ঠাকুর মশাই সেবার আমাদের জন্যে মরণপণ করেছিলেন।

ঠাকুর ॥ সেইজন্যেই তো আজ এসেই আগে আমার শক্তিময়ীকে অপমান করলি বংশী।

বংশী ॥ রাগের মাথায় কি বলেছি ক্ষমা করবেন ঠাকুর মশাই। অত বুঝে কথা বলতে পারি না বলেই তো নিজেদের ভাল নিজেরা করতে পারি না।

ঠাকুর ॥ তাহলে কর্তামাই যা বলে চোখ বুঁজে করে গেলেই পারিস।

বংশী ॥ মনে মনে তাই করব বলে ভেবেছিলাম। কিন্তু সদার মত ছেলে যদি বাধা দিতে আসে তাহলে—

চৌধুরী ॥ সদা আবার ভগবান হল কবে থেকে রে!

মহাদেব ॥ আমাদের চেয়ে মানী ছেলে কর্তামশাই।

বংশী ॥ গাঁয়ের জন্যে করেছে অনেক।

ঠাকুর ॥ আমার শক্তিময়ীর জন্যে কি করেছে বল?

যুগল ॥ ও বলে ঠাকুর মশাই শক্তিময়ীর নামে অন্যায় করে বেড়ায়। আসলে ওনার ভক্তিশ্রদ্ধা সব ন্যাকামি।

চৌধুরী ॥ এমন জাগ্রত দেবতা'র নামে যারা এইসব রটায় তাদের সংগে বাস করা মানেই পাপ, তা জানিস যুগল ?

ঠাকুর ॥ এই পাপেই গাঁ আজ ডুবতে বসেছে।

মহাদেব ॥ গাঁ ডোবাচ্ছি তো আমরা।

ঠাকুর ॥ মা-র ইচ্ছে না থাকলে তোদের সাধ্য কি যে গাঁয়ের জমিতে জল আনিস।

চৌধুরী ॥ সদা গাঁয়ের সব্বনাশ করতে চাইছে বংশী।

বংশী ॥ সেবার বি ডি. ও সাহেবের কাছ থেকে ডোল আদায় করেছিল সদা।

চৌধুরী ॥ আমি ভেতর থেকে আদায় না করে দিলে ঐ পুঁচকে ছোঁড়ার সাধ্য হত ভেবেছিস ?

মহাদেব ॥ ওর চেষ্টায় সেবার গাঁয়ের লোকেরা বিনি পয়সায় ক্যানেলের জল পেয়েছিল কর্তামশাই।

চৌধুরী ॥ রক্ত ছোটেনি তার জন্যে ! সুবলের ছোট ছেলেটা মারা যায়নি চোখের সামনে।

বংশী ॥ গিয়েছিল।

চৌধুরী ॥ আমি আগে জানলে এক কথায় ওদের জলের ব্যবস্থা করতাম।

বংশী ॥ তবু নিজেতো খেতে পায় না সদা

চৌধুরী ॥ বাজে কথা। তোরা জানিস না তাই বলছিস। দেখবি আর কটা দিন বাদে শহরে বাড়ী তুলে বসে থাকবে। তখন তোরা আংগুল কামড়াবি আর ধেই তা নাচন করাব। কত পয়সা করেছে জানিস ?

মহাদেব ॥ আমাদের সদা পয়সা জমিয়েছে !

চৌধুরী ॥ সদরে বাস গ্যারেজের পাশে জমি কিনেছে। বলেছে দোকান দেবে আর কোঠা তুলবে।

বংশী ॥ এত পয়সা ও পেল কোথায় ?

ঠাকুর ॥ তোদের উপকার করছে। পয়সার অভাব হবে মনে করছিস ?

চৌধুরী ॥ সেবার আমার মাছ আটকায়নি সদা ?

বংশী ॥ আপনি মাছের দর বাড়াচ্ছিলেন অথচ আমাদের মজুরী বাড়াচ্ছিলেন না, তাই বাধ্য হয়ে—

চৌধুরী ॥ তাহলে তিনদিন পর আবার ছাড়ল কেন ? আমি কি তোদের মজুরী বাড়িয়েছিলাম।

মহাদেব ॥ আমরা যে থাকতে পারলাম না। মরশুমের সময় বিনা মজুরীতে বসে থাকা মানে সারা বছরের খাওয়া বন্ধ। তাই সদা বাধ্য হয়ে—

চৌধুরী ॥ কাঁচকলা জানিস তোরা। আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চেয়ে বসল।

বংশী ॥ আপনার কাছে টাকা চাইল কেন সদা ?

ঠাকুর ॥ শোন না বাপ মন দিয়ে শোন—সব জানতে পারবি।

চৌধুরী ॥ বলল; পাঁচ হাজার টাকা দিন সব ব্যবস্থা করে দেব, কাল থেকে আবার মাছ উঠবে।

বংশী ॥ সদা ব্যাটা আপনার কাছ থেকে ঘুষ নিল কর্তামশাই ?

চৌধুরী ॥ আমি বললাম বংশীদের আমি ঠকাতে পারব না। সদা বলল এ টাকা আমি জেলে পাড়ায় একটা ইস্কুল খোলবার জন্যে চাইছি। তোদের এতখানি উপকার হবে শুনে আমি আর থাকতে পারলাম না। কিন্তু সেই পাঁচহাজার টাকা কোথায় গেল, বংশী ?

বংশী ॥ শালা এতবড় নেমকহারাম, মহাদেব ?

মহাদেব ॥ আমারও আজকাল ওর চাল-চলন ভাল লাগছিল না সর্দার।

বংশী ॥ আজই শালার জবান টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

চৌধুরী ॥ আর কৈবর্ত বাড়ীর বিধবা বৌ কোথায় উধাও হয়ে গেল রে যুগল।

যুগল ॥ সবাই বলে—

ঠাকুর ॥ কর্তামশাই নাকি—

চৌধুরী ॥ ওকে মেরে ফেলে ঝিলে পুঁতে রেখেছে।

মহাদেব ॥ গাঁয়ের লোকেরা তাইতো বলে কর্তামশাই!

চৌধুরী ॥ মল্লিকহাটের কাছে এখন বৌ সেজে বসে। বেশ ব্যবসা জমিয়ে তুলেছে। তোদের সদা তো হপ্তায় তিনদিন ওর কাছে থাকে রে বংশী।

বংশী ॥ আপনি সত্যি কথা বলছেন, কর্তামশাই?

চৌধুরী ॥ বেশতো, চাষে জল ঢুকুক, দেখব কুঞ্জ আর তার বেটা শুকিয়ে মরে কিনা!

ঠাকুর ॥ সবাই কাজ সেরে নেবে। মাঝ থেকে মরবি তোরা যত জেলের দল। বলে না, ব্যাঙ ডাকলে তবে জেলে খুশী, তা তোদের ব্যাঙ ডাকলেই বা কি, আর সাপের মাথায় মণি জ্বললেই বা কি। তোরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবি।

মহাদেব ॥ না। কাজ আজকে আমরাও গুছোব।

যুগল ॥ কেউ যখন নিজের কথা ভাবে না তখন আমরাই বা ভেবে মরতে যাই কেন? মরুক শালা চাষীর দল।

বংশী ॥ মেছোঘেরী বড হলে আমাদের বসে থাকা লোকগুলো কাজ পাবে। আমাদের মজুরী বাডবে। আমরা সোনাবাঁধ ভাঙবো।

মহাদেব ॥ চাষ করতে না পারলেও সদার অনেক টাকা আছে। খেতে দিক ওদের। আমরা নোনাজল ঢোকাব চাষের জমিতে।

ঠাকুর ॥ তাছাডা শক্তিময়ীর যখন তাই ইচ্ছে।

বংশী ॥ আমরা শক্তিময়ীর ইচ্ছামত কাজ করব। বাঁধ ভাঙব কর্তামশায়।

চৌধুরী ॥ কবরখানার পাশে যে বড় বাঁশঝাড আছে তার নীচু জায়গাটাতে বসে কোদাল চালাবি। কারও সাধ্য নেই ঐ জায়গায় আসে। তারপর জল একবার খোলা পেলে পাঁচশ হাত বাঁধ ভেঙে জমিতে ঢুকবে.

মহাদেব ॥ বাঁশঝাড়ের অন্ধকারে আমরা তিনজন শুধু থাকব সর্দার।

বংশী ॥ তিনটে কুড়ুল নে যুগল। ওখানটায় মাটি নেই শুধু বাঁশের গোড়া। তারপর দেখব সদানন্দকে

[বংশীর দল বেরোতে যায় এমন সময় বেগে প্রবেশ করে সদা ও সাধন। বংশীদের পথ আটকায়। বংশী লাঠি তুলে মারতে যায় আবার কি ভেবে নামিয়ে রাখে।]

সদা ॥ আমাকে মেরে ফেললেই কি তোমাদের শক্তিময়ী আমাদের চাষের জমিতে জল আনিয়ে দিতে পারবে বংশীদা।

বংশী ॥ চুপ কর নেমকহারাম।

সদা ॥ তুমি যে কাজ করতে চলেছ তাতে আমাকে না বলে তোমাকে ঐ কথা বললেই কি ভাল হত না।

মহাদেব ॥ মুখ থেঁতো করে দেব হারামজদা। সদারকে কিছু বলবার আগে মনে রাখিস জেলেপাড়া মরে যায়নি।

সদা ॥ আমাদের চাষীপাড়া আর জেলেপাড়া কি আলাদা, মহাদেব?

বংশী ॥ নয়ত এমনি কি আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে এসেছিস।

সদা ॥ আমি যদি অন্যায় করি তাহলে তার বিচার চাষীপাড়া জেলেপাড়া সবাই করুক বংশীদা। কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে বল, আমি কেন তোমার কাছে বিশ্বাসঘাতক হলাম?

যুগল ॥ ওর সংগে তর্ক করতে গেলে রাত কাবার হয়ে যাবে। ঠাকুরের স্বপ্ন মিথ্যে হবে।

ঠাকুর ॥ কর্তামশাই আমি যাচ্ছি গাঁয়ের ভেতর সবাইকে সতর্ক থাকতে।

সাধন ॥ সকলেই সতর্ক আছে কর্তামশাই। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

ঠাকুর ॥ তোদের কথায় ওরা যতই ভুল বুঝক না কেন। আমি শক্তিময়ীকে অপমান করে ওদের ভুল বুঝতে দিতে পারি না। [ঠাকুর চলে যায়]

সদা ॥ উনি তো পালিয়ে বাঁচলেন। এবার কর্তামশাই আপনিও কি—

চৌধুরী ॥ তোমার মত বেইমান নেতাদের মুখোস খোলবার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে বৈকি।

বংশী ॥ কর্তামশায়ের পাঁচহাজার টাকা ফেরৎ দিতে এসেছ নাকি সদা!

সদা ॥ পাঁচহাজার টাকা।

চৌধুরী। (হাঃ হাঃ করে হেসে) এর কোনদিন শোননি, সদানন্দ?

যুগল ॥ তুমি আমাদের মাছ ধরা বন্ধ করে কর্তামশাইএর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নাওনি বলতে চাও?

সদা ॥ আমাকে তোমরা এত নীচ ভাব বংশীদা

বংশী ॥ ভেবেছিলাম তোমার সংগে কোন বিবাদ করব না কিন্তু এখন জানিয়ে যাচ্ছি, সোনাবাঁধে তোমাকে পেলে কুড়ুলের ডগায় তোমার মুণ্ডুটা আলাদা করে দেব। চল যুগল।

সদা ॥ দাঁড়াও বংশীদা। পাঁচহাজার টাকা যদি নিয়ে থাকি তাহলে আজ আমি কর্তামশায়ের কাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছি কেন?

মহাদেব ॥ কৈবর্ত পাড়ার বিধবা বৌ কোথায়?

সদা ॥ কর্তামশাই তো বেশ ভাল করেই জানেন তা।

চৌধুরী ॥ তাদের দেখা যখন আমার উচিত তখন জানতে হয় বৈকি! কত রাত সেখানে থাকিস সেটাও জানাতে হয়েছে আমায়

বংশী ॥ কথা বলছ না কেন?

সদা ॥ আমার নামে বদনাম দিয়ে আপনি সাময়িকভাবে জয়লাভ করতে পারেন। কিন্তু তা দিয়ে আমাদের চিরদিন চুপ করিয়ে রাখতে পারবেন না।

চৌধুরী ॥ বংশী, আমার কথা সত্যি কিনা প্রমাণ হল তো।

বংশী ॥ আজ রাতের কাজ শেষ হলে তোমার পালা সদা। তোমার মত বেইমানকে আমাদের গাঁয়ে থাকতে দেব না।

সদা ॥ আমাকে তুমি শেষ করতে পার বংশীদা, তবু আজ রাতে তোমাকে আমি বাধা দেবই।

সাধন ॥ আমাদের সর্বনাশ করতে তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন আমরা বাধা দবই।

বংশী ॥ ঠিক আছে, বাঁধে চলে এস সাধন। দেখব চাষীপাড়ার ক্ষমতা বেশী না আমাদের জেলেপাড়ার। কর্তামশাই কাল সকাল থেকে গাঁয়ের সব জমিই হবে মেছোঘেরী।

[বংশী মহাদেব ও যুগল বাহির হইয়া যায়]

চৌধুরী ॥ ভয় পেয়ে গেলে সদা!

সদা ॥ আমাদের কাছে পাঁচহাজার টাকা আপনার কাছে কবে নিয়েছি কর্তামশাই?

চৌধুরী ॥ ওদের গল্পকথা শোন কেন? ছেলে ভোলাবার জন্যে অমন কত ছড়া আমাকে বলতে হয়

সাধন ॥ এতে বন্যার মত অবস্থা আপনার আর নাও থাকতে পারে তা জানেন?

চৌধুরী ॥ সাধনের ক্ষমতা কতটুকু তা আমার বেশ ভাল করেই জানা আছে।

সদা ॥ সাধন বা সদা নয়। আমরা সকলে সমস্ত গাঁয়ের লোক যখন আপনার এই প্রশ্নের উত্তর চাইবো।

চৌধুরী ॥ এখন তো জেলেপাড় আমাকে রক্ষা করতে ছুটে আসবে। তাই না সদানন্দ?

সদা ॥ না আসবে না। আমাদের সকলের পেটেই খিদে আছে। সামনে ভাত দেখতে পেলে সবাই এক সংগে ঝাঁপিয়ে পড়ব জানবেন।

সাধন ॥ আপনি সোনাবাঁধের লড়াই আজ বন্ধ করুন।

চৌধুরী ॥ তোমাদের ভায়ে ভায়ে বিবাদ হলে আমি তার মধ্যে নাক গলাতে যাই কেন?

সদা ॥ এ বিবাদ আপনি লাগিয়েছেন। সেই জন্যে আপনার কাছে এসেছি।

চৌধুরী ॥ জোর করে যখন জমি দখল করেছিলে তখন তো খুব শক্তি দেখিয়েছিলে। আজ আর একবার দেখ—বংশীর শক্তিটা বুঝে নাও।

সদা ॥ লড়াই আমরা করতে চাই না। আমার কাছে বংশীদা পর নয়। আমাদের বিপদে বংশীদা এসে দাঁড়িয়েছে। আজও আমরা পরস্পরের বন্ধু থাকতে চাই।

চৌধুরী ॥ তোমরা বন্ধু থাকবে কি শত্রু থাকবে তাতে আমার কি যায় আসে। যাও সোনাবাঁধে বংশীর সংগে মিতালী করোগে।

সদা ॥ তার আগে আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি চাষের জমিতে জল ঢোকাবেন না।

চৌধুরী ॥ এটা কি আমি করছি! মায়ের আদেশের অবহেলা আমি কেমন করে করব?

সদা ॥ (চীৎকার করে) এসব কথা শোনাবেন আপনার ঠাকুর মশাই-এর কাছে। আমাদের কাছে আপনি বলুন বংশীকে ফিরিয়ে আনবেন কিনা।

চৌধুরী ॥ তারা নিজেদের ভাল নিজেরা ভালই বোঝে।

সাধন ॥ এতে ওদের কতখানি ভাল হবে জানি না। কিন্তু আমরা যে শেষ হয়ে যাব।

চৌধুরী ॥ বংশীকে বোঝাওগে যাও।

[বাইরে থেকে চীৎকার করতে করতে প্রবেশ করে গোপাল]

গোপাল ॥ শিগ্‌গির চল সদা। তোর বাবা—

সদা ॥ বাবার কি হয়েছে গোপাল!

গোপাল ॥ তুই না গেলে বংশী হয়তো কাকার গায়ে হাত দেবে।

সদা ॥ বংশী একাজ করতে পারে না।

গোপাল ॥ বাঁধের ওপর লড়াই শুরু হয়েছে। কাকা ছাড়া সবাই দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

সাধন ॥ সর্বনাশ হয়ে যাবে সদা। আমাদের এখেনে থাকলে চলবে না।

সদা ॥ আপনি এখন বংশীকে ফিরিয়ে নেবেন চলুন কর্তামশায়।

চৌধুরী ॥ তোমরা যে জোর করে জমি দখল করেছ, তা আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে?

সদা ॥ ও জমি আপনার নয়। ওটা আমাদের জমি। আমরা তা ফিরিয়ে দেব কেন?

চৌধুরী ॥ বংশী লড়াই শুরু করতে প্রস্তুত।

সদা ॥ আপনি তাহলে শুনবেন না আমাদের কথা!

চৌধুরী ॥ শোনার মত কথা বললেই শুনতে পারি!

সাধন ॥ এর ফলভোগ করতে তৈরী থাকুন।

সদা ॥ সোনাবাঁধ আজ রক্তবাঁধ হয়ে যেতে পারে তবু আপনার অন্যায়কে আমরা মেনে নেব না।

চৌধুরী ॥ গর্দান নিয়ে ফিরে এসে উঁচু গলায় কথা বলিস বেইমান।

সদা ॥ বেইমান কে তা প্রমাণ করব তারপর মরব। তার আগে আমি দেখতে চাই ন্যায়ের লড়াইয়ে কতটা রক্তের প্রয়োজন হয়।

[সদা বেরিয়ে যায়। পেছনে গোপাল চলে যায়]

সাধন ॥ বহু অত্যাচার এতদিন সয়েছি। ভেবেছিলাম জমি হাতছাড়া হওয়ার পর আপনার শিক্ষা হয়েছে। কিন্তু বুঝলাম শয়তান মুখোস পাল্টায় কিন্তু মানুষের রূপ পায় না। [প্রস্থানোদ্যত]

চৌধুরী ॥ তোর বৌএর আত্মহত্যার কথাটা ভুলে গেলি বুঝি, সাধন?

সাধন ॥ সেটার কথা ভুলিনি জানবেন!

[সাধন চৌধুরীর গালে চড় মারে]

চৌধুরী ॥ এর শোধ নেব জানবি। তোকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলে কুকুর দিয়ে খাওয়াব সাধন। এ অপমানের—

সাধন ॥ আজ যেটার শুরু হল সেটার শেষ হবে আপনার যেদিন মৃত্যু হবে। কথাটা ভুলবেন না আশা করি।

[সাধন চলিয়া যায়। চৌধুরী চীৎকার করে "ভাস্কর ভাস্কর" বলিয়া ডাকে। নিজে পায়চারী করিতে থাকে। আস্তে আস্তে ঠাকুরমশাই প্রবেশ করে]

ঠাকুর ॥ একটু গা ঢাকা দিয়েছিলাম কর্তামশায়। সাধনটা বড্ড গোঁয়ার।

চৌধুরী ॥ আমার গায়ে হাত তোলার মত স্পর্দ্ধা ও পেল কোথা থেকে।

ঠাকুর ॥ আপনার গায়ে হাত তুলেছে, কর্তাবাবু?

চৌধুরী ॥ আজ তুলেছে। কাল ঐ হাত দুটো আলাদা হয়ে যাবে জেনে রাখ।

ঠাকুর ॥ ওদের বড্ড বাড বেড়েছে কর্তাবাবু। যা হয় একটা ব্যবস্থা আপনি করুন।

চৌধুরী ॥ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে ভাস্কর।

ঠাকুর ॥ তার আগে ঐ কাঁটা যে ভামরুলের হুল হয়ে গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে কর্তাবাবু।

চৌধুরী ॥ তার জন্যেই কেউটে সাপের বিষের কথা ভাবছি।

ঠাকুর ॥ ওকে কেউটে দিয়ে ছোবল দেয়াবেন বলছেন?

চৌধুরী ॥ তুমি চুপ কর ভাস্কর। এ সব কিছুর জন্যে তুমিই দায়ী!

ঠাকুর ॥ আমি—আমি তো আপনার ভালর জন্যে—

চৌধুরী ॥ ঠাকুর স্বপ্ন দিয়েছে বলে ঢাক ঢোল পিটিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দিলে। এখন এই দাংগার ঠেলা সামলাবে কে?

ঠাকুর ॥ ওদের ঠেলা ওরা সামলাবে। খুন খারাপি করে জেলে যাক। ফাঁসীতে লটকে যাক। আপনার তাতে কি যায় আসছে।

চৌধুরী ॥ বংশী যদি আমার নাম করে দেয়।

ঠাকুর ॥ (হি হি করে হাসে) কত হাতী গেল তল, এখন মশা বলে কত

জল। আপনি তাদের লিখে দিননি তো যে সোনাবাঁধের বাঁশঝাড় উড়িয়ে
দে।

চৌধুরী॥ গ্রাম ডোবানোর দায়িত্ব যদি আমার ঘাড়ে পড়ে।

ঠাকুর॥ প্রমাণ করতে হবে তো। তাছাড়া চাষের জমি যে আপনার ন
তা তো প্রমাণ করা যাবে।

চৌধুরী॥ তাতে জমিটাও তো একেবারে হাতছাড়া হয়ে যাবে।

ঠাকুর॥ ওটা হাতছাড়া হল বলে! তাহলেই বুঝেছেন যে জমি আপনার ন
সে জমিতে আপনার মাছ ছেড়ে লাভ নেই। সুতরাং জল আপ
ছাড়তে পারেন না।

চৌধুরী॥ রক্তারক্তি হবেই ভাস্কর।

ঠাকুর॥ আর এ বিবাদ বহুকাল ধরে চলবে। বংশীদের এবার ফাঁ
ফেলেছেন কর্তাবাবু।

চৌধুরী॥ বংশীটার খুব বাড় হয়েছিল। এবার উচিত শিক্ষা দিতে পেরেছি
হয় জেল আর না হয় চোরের মত আমার কাছে আত্মসমর্পন।
[হো হো করে হেসে উঠে হাতে লাঠি নিয়ে যমদূতের মত প্রবেশ ক
বংশী। হাতের কুড়ুলটায় রক্ত মাখান।]

বংশী॥ ফাঁসী যাব তবু আপনার কাছে মাথা নোয়াব না।

চৌধুরী॥ বংশী তুই—মানে -

বংশী॥ খুন করে এসেছি।

চৌধুরী॥ পালিয়ে যা।

বংশী॥ একবার ভুল করেছি। আমাদের বোকা পেয়ে যা বুঝিয়েছেন ত
বুঝেছি—এবার সত্যিটা জানতে এসেছি।

ঠাকুর॥ বংশী তুই ঠাণ্ডা হ। এটা মা-র মন্দির।

বংশী॥ বলেছিলেন না, যে ভুল করবে তাকে বলি দেওয়া হবে। এই ম
আদেশ।

ঠাকুর ॥ সত্যি বলছি। আমি স্বপ্ন পেয়েছি যে—।

[বংশী কুড়ুল তোলে]

বংশী ॥ আর একটা কথা বললে মাথাটা দুভাগ করে দেব।

ঠাকুর ॥ (প্রায় কেঁদে ফেলে) আমি কোন দোষ করিনি বংশী। আমাকে ছেড়ে দে।

বংশী ॥ কে স্বপ্ন পেয়েছিল ?

ঠাকুর ॥ মানে—কর্তাবাবু—

বংশী ॥ (চীৎকার করে ওঠে) বলুন শিগগির। (আবার কুড়ুল তোলে)

চৌধুরী ॥ বংশী !!!

ঠাকুর ॥ (ছুটে বংশীর পায়ে পড়ে) আমায় বাঁচিয়ে দে। আমি ভুল করেছি —অভাবে স্বভাব রাখতে পারিনি। বংশী তোর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইছি —আমাকে মাফ করে দে।

[ঠাকুর মশাই কাঁদতে থাকে, বংশী লাথি মেরে ঠাকুর মশাইকে সরিয়ে দেয়]

বংশী ॥ এখেন থেকে বেরিয়ে যান।

[ঠাকুর পড়ি মরি করে দৌড় দেয়। এই সময় কুঞ্জর মৃতদেহ নিয়ে প্রবেশ করে সাধন, গোপাল। পেছনে প্রবেশ করে সদা। কুঞ্জর মুখটা রক্তে ভেসে গেছে]

সদা ॥ আমার বাবা কোনো অপরাধ করে নি বংশীদা।

সাধন ॥ কুঞ্জদা বিশ্বাস করত শক্তিময়ী স্বপ্ন দিয়ে সব কাজ করাচ্ছে।

বংশী ॥ কুঞ্জদা বাঁচাতে গিয়েছিল ওর ছেলেকে।

চৌধুরী ॥ আমার এখেনে এসে বলে গিয়েছিল বংশীকে আমি খুন করব।

বংশী ॥ অনেক মিথ্যেকথা বিশ্বাস করেছি। আর নয়। কুঞ্জদা চীৎকার করে উঠেছিল—বংশী, কর্তামশাই মিথ্যে বলেছে। ঠাকুরমশাই স্বপ্ন দেখেনি, আমি শুনিনি।

চৌধুরী ॥ ভাস্কর যদি মিথ্যে বলে থাকে তাহলে আমি—

বংশী ॥ আপনার জন্যে মিথ্যে বলেছে।

চৌধুরী ॥ না।

বংশী ॥ আপনি মিথ্যে বলিয়েছেন।

চৌধুরী ॥ না—বিশ্বাস কর বংশী।

বংশী ॥ বিশ্বাস আগে করেছি! এখন আর করি না।

চৌধুরী ॥ সোনাবাঁধ ভাংগা হয়নি, বংশী?

বংশী ॥ কুঞ্জদা রক্ত দিয়ে সোনাবাঁধ রক্ষে করে গেছে। চাষীদের জমি রক্ষে করে গেছে। আমাদের বিবাদ মিটিয়ে গেছে। আমি তাকে এই কুড়ুলের ঘা দিয়েছি।

চৌধুরী ॥ আমি তোকে এ কথা বলিনি বংশী।

বংশী ॥ আমি কুঞ্জদাকে মারলাম কেন?

চৌধুরী ॥ জানি না।

বংশী ॥ সদার নামে মিথ্যে বলেছেন কেন?

চৌধুরী ॥ সব সত্যি কথা.

বংশী ॥ সত্যি কথা এবার বলুন।

[বংশী কুড়ুলের গুঁতো মারে। চৌধুরী পালাতে যায়। বংশী ধরে এনে আবার ফেলে দেয়]

সদা কত টাকা নিয়েছিল, বলুন?

চৌধুরী ॥ আমি—আমি মিথ্যে বলেছি বংশী।

বংশী ॥ ঠাকুরমশায়কে কে বলেছিল স্বপ্ন দেখতে।

চৌধুরী ॥ বিশ্বাস কর বংশী তোমাদের জন্যে—

বংশী ॥ বলুন।

চৌধুরী ॥ আমার জন্যে ও বলেছিল।

বংশী ॥ আমার কুঞ্জদার জন্তে নয়, দরকার হলে আপনার মত শয়তানকে শেষ করে আমি ফাঁসী যাব।

[বংশী কুড়ুল তোলে। চৌধুরী আর্তনাদ করে দাঁড়িয়ে ওঠে। সদা পেছন থেকে এসে কুড়ুলটা ধরে ফেলে। বংশী চৌধুরীকে ঠেলা দেয়। চৌধুরী ছিটকে পড়ে যেখানে হাড়িকাঠ আছে সেখানে, হাড়িকাঠটা ধরে তাতে মাথা রেখে চৌধুরী হাঁফাতে থাকে]

সদা ॥ ঐ দেখ বংশীদা। পশুগুলো যেমন বলির আগে প্রাণভিক্ষা চায়— কর্তাবাবু তেমনি পশুর মত ভিক্ষা চাইছে। ওকে তুমি ক্ষমা কর।

বংশী ॥ আমি কুঞ্জদাকে মেরে ফেলেছি সদা। আমার এ পাপের ক্ষমা নেই। আমাকে ছেলের মত ভালবাসত কুঞ্জদা। আমি তাকে—সদা তোরা আমাকে মেরে ফেল সদা—তোরা আমাকে—

[সদাকে ধরে সদার পায়ের কাছে বসে কাঁদতে থাকে]

সদা ॥ বাবা প্রাণ দিয়ে আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিয়ে গেছে। আমাদের চাষের জমি বাঁচিয়ে গেছে বংশীদা।

সাধন ॥ আর ঐ শয়তানটাকে (চৌধুরীকে দেখায়) চিনে নিতে বলেছে।

সদা ॥ আমরা ওদের ক্ষমা করব না।

সাধন ॥ আমরা কখনো আলাদা হব না বংশীদা।

[বাইরে গান আরম্ভ হয়]

আমরা চাষী, চষব জমি
আমরা জেলে, ফেলব জাল
আমাদের জাল, আমাদের হাল,
হাতিয়ার, হাতিয়ার, হাতিয়ার,
নতুন সূর্য পূব আকাশে
আঁধার কেটে যাবে ওরে,

এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল,
হাতিয়ার, হাতিয়ার,
হাতিয়ার ।

[গান আরম্ভ হলে সকলে মুখ তুলে সামনের দিকে তাকায়, নতুন দিনের আলোয় আলোকিত হয় সদা, সাধন ইত্যাদিরা। পেছনে হাড়িকাঠের ফাঁক দিয়ে মুখ দেখা যায় চৌধুরীর। চৌধুরীর মুখে ড্রাগনের আলো। গান চলতে থাকাকালীন পর্দা পড়ে]

।। একালের একাঙ্ক ।।

॥ প্রথম খণ্ডের সূচী ॥

সম্পাদনায় : সুনীল দত্ত ॥ দাম : ৬·০০

॥ দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী ॥

সম্পাদনায় : সুনীল দত্ত ॥ দাম : ৭·০০